পাক-প্রণালী।

ষষ্ঠ খণ্ড।

"প্রাণিনাং পুনর্মূলমাহারো বলবর্ণৌজসাঞ্চ।"

—সুশ্রুত।

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সূচীপত্র।

☞ **বিশেষ দ্রষ্টব্য**—২১৬ পৃষ্ঠার পর হইতে মুদ্রাকর-দোষে পত্রাঙ্কের গোল ঘটিয়াছে, অর্থাৎ ২১৭ ইত্যাদি স্থলে পুনর্ব্বার ১৯৩ ইত্যাদি পত্রাঙ্ক বসিয়াছে। পাঠকগণ উহা সংশোধন করিয়া লইবেন। সূচীপত্রে সংশোধিত পত্রাঙ্কই প্রদত্ত হইল। ২৭১ পৃষ্ঠা হইতে পত্রাঙ্ক ঠিক্ আছে।

পাক-প্রণালী।

হিন্দু-জাতির রন্ধন-প্রথা।

(১)

খাদ্যাদি-নিরূপণ এবং রন্ধন-গত উন্নতি-সাধন যে, সভ্যতার পরিচায়ক, এ কথা, সদা সর্ব্ববাদি-সম্মত। খাদ্যাদির উপর যে, ব্যক্তি-গত ও জাতি-গত অভ্যুদয় বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে, এ কথা, কে অস্বীকার করিবেন? অসভ্যাবস্থায় মানবের সর্ব্ববিধ উন্নতির দ্বার, অবরুদ্ধ-প্রায় থাকে। তখন, মানব-সন্তান নিজের কিংবা সমাজের কোন প্রকার কল্যাণ-সাধনে মনোনিবেশ করিতে অবসর পায় না। পশ্বাদি ইতর প্রাণীর ন্যায়, তাহারা, যথাকথঞ্চিদ্রূপে

জীবন যাপন করিয়া থাকে। এজন্য অসভ্য বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে, রন্ধন-গত কোন প্রকার পারিপাট্য-ই, পরিলক্ষিত হয় না।

রন্ধন করিয়া আহার করা-ই সভ্যতার চিহ্ন *। অসভ্যজাতিরা পশুবৎ আম দ্রব্য-ই আহার করিয়া থাকে। খাদ্য-দ্রব্য, রন্ধন দ্বারা সুসিদ্ধ হইলে, পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করে। সুসিদ্ধ হইলে, খাদ্য দ্রব্য, যত শীঘ্র পরিপাক হয়, অসিদ্ধ বা অর্দ্ধ-সিদ্ধ খাদ্য, কখন-ই তত শীঘ্র পরিপাক হয় না। যাহারা যত অল্প শ্রম করে, তাহাদের খাদ্য, তত অধিক সুসিদ্ধ হওয়া উচিত। দুর্ব্বল ও কৃশ ব্যক্তির খাদ্য, অধিকতর সুসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কারণ, পরিশ্রম দ্বারা-ই পরিপাক-শক্তি বর্দ্ধিত ও জঠরানল তীব্র হয়। জঠরানল, তীক্ষ্ণ থাকিলে, অসিদ্ধ খাদ্য-ও, সহজে পরিপাক করা যায়। জঠরানল, মন্দ থাকিলে, কাজে-ই সহজে পরিপাক করিবার জন্য, খাদ্যকে অধিক সুসিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। আমাদের দেশে পূর্ব্বে কাষ্ঠের জ্বালে রন্ধন হইত। তখন কাষ্ঠের অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু সভ্যতা ও লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কাষ্ঠের অসদ্ভাব হইয়া পড়িতেছে। অরণ্য কাটিয়া, শস্যক্ষেত্র ও জনপদ সৃষ্ট হইতেছে। এখন যাহা-ও মিলিতেছে, তাহা-ও ক্রমশঃ অধিকতর দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে! সুতরাং, প্রতিনিয়ত-ই কাষ্ঠের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। অন্য পক্ষে, কয়লার খনির আবিষ্কার ও কয়লার ব্যবসায়ের উন্নতি হওয়ায়, উহা অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে পাওযা যাইতেছে। ভারতবর্ষ, যেরূপ দিন দিন নিঃস্ব হইতেছে, ভারতবাসীর, বিশেষতঃ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা, যেরূপ ক্রমে ক্রমে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে সুলভ দ্রব্য ব্যবহার করা ভিন্ন তাহাদের আর গত্যন্তর নাই। কাজে-ই কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে কয়লা ব্যবহার করিতে, প্রায় সকলে-ই বাধ্য হইয়াছেন। কয়লার জ্বালের দোষ, কিন্তু অনেক। অনেকে বিশ্বাস করেন—কয়লার জ্বালে পক্ক খাদ্য আহার করিয়া, আমরা অম্ল ও অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছি। বাস্তবিক, কয়লার জ্বালের প্রধান দোষ, উহাতে খাদ্য দ্রব্য সুসিদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ, কয়লার জ্বালে মাংস সুসিদ্ধ করিবার বড়-ই অসুবিধা ঘটে। কয়লার জ্বাল, অতিশয় তীব্র। অল্প সময়ে জল শুষ্ক হইয়া যায়; অথচ খাদ্য সুসিদ্ধ হয় না। সেইজন্য মাংসাদি খাদ্য, মৃদু জ্বালে-ই রন্ধন করা উচিত। কেবলমাত্র মাংস নহে,—যে সকল

* "স্বাস্থ্য" পত্রিকা দেখ।

দ্রব্য সুসিদ্ধ হইতে সময় লাগে, তৎসমুদায়-ই, কাষ্ঠের জ্বালে রন্ধন-পূর্ব্বক আহার করা উচিত। কাষ্ঠের জ্বাল, যেরূপ সহজে ইচ্ছা-মত হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, কয়লার জ্বাল সেরূপ করিতে পারা যায় না। এই জন্য-ই কয়লার জ্বালে রন্ধনের অসুবিধা অত্যন্ত অধিক।

এদেশে পাকের জন্য সচরাচর মৃত্তিকার ও ধাতুর পাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৃত্তিকা-পাত্রে রন্ধন করিলে, কোন প্রকার পীড়া হইবার আশঙ্কা থাকে না। পিত্তল ও তামার পাত্রে পক্ব খাদ্য দ্রব্য, বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা। অর্শঃ ও চক্ষুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে লৌহ-পাত্রে পক্ব খাদ্য দ্রব্য বিলক্ষণ উপকারী।

ভোজন-পাত্র-সম্বন্ধে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্ব-প্রণীত "আচার-প্রবন্ধ-" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"ভাঙ্গা কাঁসার পাত্রে খাইতে নাই। শূদ্রাদির ভোজনের দ্বারা অপবিত্রীকৃত পাত্রে, তাম্র পাত্রে, সমল পাত্রে, পলাশ-পত্রে, পদ্ম-পত্রে, আকন্দ-পত্রে, কদলী-পত্রের পৃষ্ঠে, লৌহ পাত্রে, হস্তে বা বস্ত্রে রাখিয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ। স্বর্ণের, রৌপ্যের, প্রস্তরের এবং স্ফটিকের ভোজ্য-পাত্র-ই উৎকৃষ্ট। কাচ এবং পোর্সিলেন ও কড়িকোটা, এই তিনটিকে-ই বরং কৃত্রিম স্ফটিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে, এবং উহাদিগের নির্ম্মাণ, স্বদেশ-মধ্যে প্রচলিত হইলে, আমাদের সমাজে ক্রমশঃ উহাদিগের ব্যবহার-বৃদ্ধি, হিত-কর হইবে বলিয়া-ই, মনে করা যায়।"

অতীত-সাক্ষী ইতিহাস-পর্য্যালোচনা করিলে, পরিদৃষ্ট হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে-ই, ভারতে রন্ধন-বিদ্যার প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়া আসিতেছে। চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি অতি উপাদেয় রসনা-তৃপ্তি-কর নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্য-রন্ধনের প্রথা যে, অতি প্রাচীন কালে-ও, ভারতে প্রচলিত ছিল,—রামায়ণ, মহাভারত, নানাবিধ পুরাণ এবং বৈদ্যক গ্রন্থসমূহ, তাহার জাজ্জ্বল্যমান্ প্রমাণ-স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে দেশে স্বয়ং অন্নপূর্ণা, ভীম, মহারাজ নল প্রভৃতি, স্বহস্তে রন্ধন করিতে, কখন-ও পরাঙ্মুখ ছিলেন না, প্রত্যুত,তাহাতে অত্যন্ত গৌরব জ্ঞান করিতেন, সে দেশে যে, রন্ধন-বিদ্যার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর্য্য ঋষিগণ, রন্ধন-সম্বন্ধে গৃহস্থের প্রতি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ঃ—

"নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।"

অতিথি-পূজা বা অতিথি-সেবা-ই, নর-যজ্ঞের মধ্যে পরিগণিত। এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইলে, ভোজনাদি প্রদান দ্বারা অতিথি-সৎকার করিতে হয়। আহারাদি দ্বারা অতিথির তৃপ্তি-সাধন করিতে হইলে-ই যে, রন্ধন-গত পারিপাট্যের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা বলা-ই বাহুল্য। তৎপরে পূজ্য-পাদ ঋষিগণ, গৃহীকে উপদেশ দিয়াছেন :—

"ইন্দ্রিয়প্রীতিজননং বৃথাপাকং বিবর্জ্জয়েৎ।"

অর্থাৎ কেবল-ই ইন্দ্রিয়ের প্রীতি-কর বৃথা-পাক বর্জ্জন করিবে। বাস্তবিক, যে সকল দ্রব্য, রন্ধন-পূর্ব্বক আহার করিলে, পাশব ভাবের বৃদ্ধি হয়, সেরূপ দ্রব্যাদির রন্ধন করা অবিধেয়।

ভক্ষ্য দ্রব্য, সম্মুখে আনীত হইলে, মনের ভাব কিরূপ হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"পূজয়েদশনং নিত্যং চাদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ॥"

অর্থাৎ ভক্ষ্য দ্রব্যের নিত্য সমাদর করিবে। তাহার নিন্দা করিবে না। ভক্ষ্য দেখিয়া, হৃষ্ট হইবে এবং সর্ব্বতোভাবে আনন্দযুক্ত হইবে।

এই সকল অনুশীলন করিলে, স্পষ্ট-ই প্রতীয়মান হয় যে, আর্য্যজাতি, রন্ধন ও খাদ্যাদি-বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পাকের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, বিশেষরূপ যত্নসহকারে শিক্ষা না করিলে, তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায় না। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় রন্ধন-বিদ্যা-ও, শিক্ষা-সাপেক্ষ; ভোক্তার রুচি, দ্রব্যাদির পরিমাণ, রন্ধনোপযোগী দ্রব্যসমূহের একত্র সমাবেশ, জল, জ্বাল এবং আস্বাদের উৎকর্ষ-সাধন, এই সকল বিষয়ে বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে, পাচকের পারদর্শিতা প্রকাশ পায় না। কেবল লবণ ও মসলা দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারিলে-ই যে, পাকের কার্য্য শেষ হইল, তাহা মনে করা উচিত নহে। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে,—"বিধাতা, আমাদের রসনার তৃপ্তির জন্য, নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু, শয়তানরূপী পাচকে তাহা নষ্ট করিয়া থাকে!" বাস্তবিক, উত্তমরূপ রন্ধন করিতে না

পারিলে, এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবার-ই কথা। পাচকের কার্য্যকে সামান্যজ্ঞান করা উচিত নহে। যাহার হস্তে অমূল্য জীবন-রক্ষার ভার ন্যস্ত থাকে,—তাহার কার্য্য যে, অতি গুরুতর, তাহা মনে রাখা আবশ্যক। প্রাচীন আর্য্যজাতি, উহার মর্ম্ম বুঝিয়া-ই, স্বপাক, তদভাবে মাতা, ভগিনী এবং সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের হস্তে পাকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, ভোক্তার জীবনের প্রতি যাহাদিগের মমতা আছে, এরূপ পাচক কিংবা পাচিকার হস্তে-ই, রন্ধন-কার্য্য সমর্পণ করা উচিত।

অতি প্রাচীন কাল হইতে, আমাদের দেশে, পুরনারীগণের উপর রন্ধন-কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার অর্পিত আছে। তাঁহারা, অতি পবিত্র-ভাবে-ই রন্ধনকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্ব্বকালে রন্ধন-বিদ্যার প্রতি অস্মদ্দেশীয় রমণীগণের যেরূপ আস্থা ও যত্ন ছিল, এক্ষণে দিন দিন তাহা হ্রাস পাইয়া আসিতেছে! ইহা যে, সমাজের একটি ঘোরতর শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রমণীগণ-ই, গৃহের লক্ষ্মী! অন্নপূর্ণার ন্যায় তাঁহারা, স্বীয় হস্তে রন্ধন করিয়া, স্বামী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় স্বজনকে আহার প্রদান করিলে যে, কি পবিত্র সুখের ও পরিতোষের কারণ হয়, তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। মনে কর, যে ব্যক্তি, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণের জন্য সর্ব্বদা গুরুতর পরিশ্রম করিতেছেন, তিনি যদি গৃহে আসিয়া, তাহাদের প্রফুল্ল মুখ নিরীক্ষণ করেন, এবং স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি স্নেহের ও আদরের প্রতিমাগুলি, যদি স্বহস্ত-প্রস্তুত উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য-সমূহ লইয়া, তাঁহার সেবার জন্য উপবিষ্ট থাকেন, তদ্দর্শনে কোন্ শ্রান্ত জনের শ্রান্তি দূর না হয়,—কোন্ ব্যক্তির মুখে হাসি দেখা না যায়,—এবং কোন্ পাষাণ-হৃদয়ের অন্তঃকরণে করুণ ও পবিত্র ভাব উদ্দীপ্ত না হয়? সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তির ভবন, কি সুখের-ই আগার! তিনি যত-ই চিন্তা-পীড়িত হউন না কেন,—তাঁহার ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা ও উন্নতি-লাভের জন্য তিনি, যত-ই উৎকণ্ঠিত হউন না কেন, গৃহে আসিয়া পরিবারবর্গের যত্নাতি-শয্য ও সহাস্য আনন সন্দর্শন করিয়া, তিনি সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইবেন। তাঁহার সমস্ত উৎকণ্ঠা দূরীভূত হইবে। অধিক কি, তদীয় মুখমণ্ডলে পবিত্র হাস্য-চ্ছটা প্রকটিত হইবে! হিন্দুজাতির পবিত্র গৃহে রমণীগণের মধ্যে এই পরম পবিত্র ভাব, চিরন্তন অপার্থিব সম্পত্তির ন্যায় বর্ত্তমান ছিল। রন্ধন-বিদ্যার প্রতি অনুরাগ,

নারীজাতির রক্ত-মাংসে যেন মিশ্রিত ছিল। এজন্য দেখা যাইত, হিন্দুবালিকা, অতি শৈশবাবস্থায় ক্রীড়াস্থলে ধূলা মাটি লইয়া, রন্ধন-বিদ্যার অনুশীলন করিয়া, তৃপ্তি অনুভব করিতেন। যে রন্ধন-বিদ্যা, স্ত্রীজাতির চিরাভ্যস্ত ছিল, অধুনা তাহার প্রতি অনাস্থা দর্শন করিলে, কাহার না হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত হয়!

রন্ধন-বিদ্যায় জ্ঞান থাকিলে, রমণীগণ, একরূপ দ্রব্যে নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। নিত্য নব নব খাদ্য পাক করিয়া, আত্মীয় স্বজনের তৃপ্তি-সাধন করা, সামান্য আহ্লাদের বিষয় নয়। বিশেষতঃ, পুরনারী-গণ, যেরূপ আন্তরিক যত্ন-সহকারে রন্ধন করিয়া থাকেন,—বেতনভুক্ পাচক বা পাচিকা দ্বারা কখন-ও সেরূপ আশা করা যাইতে পারে না। আমাদের জীবন ও স্বাস্থ্য, যাঁহাদের মমতা ও প্রীতিরূপ প্রহরী কর্তৃক অনুক্ষণ সুরক্ষিত হইয়া থাকে, আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য যাঁহারা, স্বীয় জীবনকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন, আমাদিগের তৃপ্তিতে-ই যাঁহাদিগের একমাত্র সুখ, সেই কুলনারীগণের হস্তে রন্ধন-কার্য্যের ভার অর্পিত থাকিলে, তাহা যেরূপ সুচারু-রূপে পরিচালিত হয়, অন্য কোন উপায়ে সেরূপ হইবার আশা করা যায় না। এজন্য রন্ধন-বিদ্যার প্রতি স্ত্রীজাতির সম্পূর্ণ অনুরাগ থাকা-ই, নিতান্ত প্রার্থনীয়।

আর্য্যজাতি, যে সময়ে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষিতে বাস করিতেন, তখন তাঁহা-দিগের মধ্যে মাংসাদি-রন্ধনের প্রথা যে, বহুলরূপে প্রচলিত ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অনন্তর, আর্য্যাবর্ত্তে অবস্থান-কালে মাংসাদি খাদ্য, প্রচুর-রূপে ব্যবহৃত হইত। এমন কি, তৎকালে গোমাংস পর্য্যন্ত-ও হিন্দুজাতির গৃহে নিত্য রন্ধন হইত। মহাভারতে দেখা যায় যে, মহারাজ রন্তি-দেবের রন্ধন-শালায় অতিথি-অভ্যাগতের জন্য নিত্য সহস্র সহস্র গোবধ করিয়া রন্ধন হইত। পূর্ব্বতন আর্য্যগণ যে, অত্যন্ত মাংসাশী ছিলেন, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ-সমূহ, তাহার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই আর্য্যবংশের যখন দিন দিন শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, ভারতের নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, তখন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান-নিবন্ধন তত্তৎদেশের জল, বায়ু, মৃত্তিকা ও উত্তাপানুসারে খাদ্যাদির নির্দ্ধারণ ও রন্ধন-গত নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। খাদ্য ও রন্ধন-বিষয়ক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে,

পরিলক্ষিত হয় যে, দেশের প্রকৃতি-অনুসারে প্রত্যেক দেশে খাদ্য ও রন্ধনের প্রথা, অবধারিত হইয়া থাকে। এজন্য পৃথিবীতে জাতিবিশেষে বা দেশবিশেষে বিভিন্নরূপ খাদ্য ও রন্ধন-প্রথা পরিদৃষ্ট হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পূর্ব্ব-প্রচলিত গোমাংসাদির ব্যবহার, হিন্দুজাতির মধ্যে এককালে নিষিদ্ধ হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। সাত্ত্বিক আহার যে, অত্যন্ত পবিত্র, তাহা অনেকে-ই, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। মনুষ্য-সমাজ, যখন ধর্ম্মের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে, তখন জীব-হিংসা দ্বারা উদর-পূরণের বাসনা হ্রাস পাইয়া আইসে। বোধ হয়, এই কারণ-বশতঃ-ই আজ কাল সুসভ্য ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি অনেক দেশে মাংসাহার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, উদ্ভিজ্জ-ভোজনে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন সময়ে জনৈক ইংরাজ বলিয়াছিলেন, "হিন্দু ও ইংরাজ জাতির ভোজন-স্থান দর্শন করিলে, ইংরাজদিগের আহার-স্থান, মহাশ্মশান বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" বাস্তবিক, স্তূপাকার অস্থি-রাশি এবং সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট ঝল্‌সাইয়া লওয়া (রোষ্ট করা) জীব-দেহ দর্শন করিলে, অন্তঃকরণে ঐরূপ ভাবের উদয় হওয়া বিচিত্র নহে!

কয়েকটি কারণে পক্ব দ্রব্য, রসনার তৃপ্তি-জনক হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, ক্ষুধা থাকিলে, খাদ্য দ্রব্য, অত্যন্ত সুমিষ্ট বোধ হয়। এ সম্বন্ধে একটি রহস্য-জনক গল্প আছে। একদা কোন নরপতি, এক জন সুদক্ষ সূপকার প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার জনৈক সুরসিক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন,—"তোমার প্রয়োজন হইলে, আমার রন্ধন-বিদ্যা-বিশারদ পাচককে তোমার নিকট প্রেরণ করিতে পারি।" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার এমন সুপাচক আছে যে, তাহার প্রসাদে খাদ্য-মাত্রে-ই আমার অতি তৃপ্তি-জনক হইয়া থাকে। এই পাচকের নাম ক্ষুধা।" বাস্তবিক, জঠরানল প্রবল থাকিলে, খাদ্য-দ্রব্য অতি উপাদেয় বোধ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, রন্ধন-পারিপাট্য। রন্ধন-বিদ্যায় ভালরূপ জ্ঞান থাকিলে, খাদ্য দ্রব্য সুমিষ্ট করা যায়। এই জ্ঞান যে, এ দেশে পাচক ও পাচকাদিগের মধ্যে বিশেষরূপ বর্ত্তমান আছে, তাহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় দিতে হইবে না।

তৃতীয়তঃ, অভ্যাস। বুধগণ, অভ্যাসকে 'দ্বিতীয় স্বভাব' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই অভ্যাস হইতে-ই রুচির উৎপত্তি। অভ্যাস বা রুচি অনুসারে

পক্ক দ্রব্য, ভিন্ন ভিন্ন রসনায় বিভিন্নরূপে আদৃত হইয়া থাকে। এই কারণ-বশতঃ, ব্রহ্মবাসিগণ, পচা মাংস রন্ধন-পূর্ব্বক আহার করিতে, অত্যন্ত অভিরুচি প্রকাশ করিয়া থাকে। চীনজাতি, অতি প্রাচীন। তদ্দেশবাসীরা, তৈলপায়িকা, ইন্দুর, সর্প, কৃমি, কীট প্রভৃতি জীবের মাংস রন্ধন করিয়া, উপাদেয়-জ্ঞানে তাহা ভোজন করিয়া থাকে। পক্ষীর লালা-নির্ম্মিত নীড়, অতি সুখাদ্য ও পুষ্টি-কর বিবেচনা করিয়া, চীনবাসীরা, তাহা রন্ধন করিয়া থাকে! ঝোলে মাংস ডুবিয়া না থাকিলে, সে রন্ধন, চীনজাতির মুখ-প্রিয় হয় না। চীনদেশীয় সম্ভ্রান্ত জনগণ, যে সকল দ্রব্যকে রসনা-তৃপ্তিকর বলিয়া, রন্ধনে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কোন ইংরাজ-পরিব্রাজক, তৎসমুদায়ের তালিকা দিয়াছেন। সেই তালিকা এই,— লবণাক্ত কিঞ্চুলুক (কেঁচো), জাপান দ্বীপের পরিষ্কৃত চর্ম্ম, ডিম্ব, কুম্ভীরের মাংস, হরিণের মাংসপেশী, ভল্লুকের পদাগ্রভাগ এবং কুক্কুর-শাবকের ও বিড়ালের মাংস!

বাঁধা-কপি, দুই তিন মাস জলে রাখিলে, তাহা পচিয়া যে পদার্থ প্রস্তুত হয়, রুষজাতির মধ্যে অনেকে, অতি আদরের সহিত তাহা আহার করিয়া থাকে।

প্রশান্ত-মহাসাগরস্থ কোন কোন দ্বীপবাসিগণ, টিকৃটিকি ও কুম্ভীরের ডিম্ব, রন্ধন-পূর্ব্বক আহার করিয়া থাকে। ব্রাজীল-বাসীরা এবং শ্যামদেশীয় লোকেরা, পিপীলিকার ব্যঞ্জন, অত্যন্ত সুখাদ্য বিবেচনা করিয়া থাকে। সিংহল-দ্বীপবাসিগণ, যখন মধুচক্র হইতে মধু সংগ্রহ করে, তখন মধু-মক্ষিকাগুলির মধ্যে যতগুলি পারে, সংগ্রহ করিয়া থাকে। অনন্তর, তাহা স্বতন্ত্র রন্ধন না করিয়া, মধুর সহিত কিংবা মধুর সাহায্য বিনা আহার করে।

স্পেন দেশে একটি অভিনব ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহাকে স্পেনীয় ভাষায় "অলাপদ্রিদা" কহিয়া থাকে। উহা রন্ধন করিবার নিয়ম এইরূপ,— একটি প্রকাণ্ড পাত্রে জল দিয়া, তাহা উনানে বসাইতে হয়। জল উত্তপ্ত হইলে, উহার মধ্যে এক তোলা বা দুই তোলা পরিমাণে সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও সর্ব্বপ্রকার কীট, পতঙ্গ এবং জন্তুর মাংস নিক্ষেপ করা হয়। কিয়ৎ-কাল-পরে, ঐ সমস্ত সুসিদ্ধ হইলে, তাহা খাদ্যের উপযুক্ত হয়!

ইংরাজ জাতির রন্ধনে, যূষ বা ঝোল অপেক্ষা, সিদ্ধ বা শুষ্ক মাংসাদির-ই অধিক প্রচলন। এইরূপ, পৃথিবীর নানা দেশে নানা প্রকার রন্ধন হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান-কালে, হিন্দু-জাতির মধ্যে, মাংস অপেক্ষা উদ্ভিজ্জাদির রন্ধনে সমধিক পটুতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক, হিন্দুদিগের ন্যায়, নানাবিধ মিষ্ট দ্রব্য পাক ও নিরামিষ ব্যঞ্জনাদি-রন্ধনে, পৃথিবীর অপর কোন জাতি, পটুতা-প্রদর্শনে সমর্থ নহে, ইহা-ই অনেকের বিশ্বাস। এমন কি, অনেক ইংরাজ-ও, মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি একটি কু প্রথা, হিন্দু-সমাজে প্রবেশ করিতেছে। অনেক রমণী, লেখা-পড়া শিখিয়া, গৃহ-কার্য্যাদিতে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা, রন্ধন-কার্য্যে আদৌ মনোনিবেশ করেন না। তজ্জন্য প্রধান প্রধান নগর-সমূহে প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তে-ই পাচকাদি রাখিতে হয়। গৃহ-লক্ষ্মীরা, পুস্তকাদি পাঠ ও বিশুদ্ধ আমোদাদি দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ইহা, অবশ্যই নিন্দনীয় নহে; কিন্তু, তদনুরোধে গৃহ-কার্য্যে অবহেলা, এবং রন্ধনে অযত্ন প্রকাশ করা, সম্পূর্ণ অন্যায়। এক জন সামান্য অনাত্মীয় পাচকের প্রতি রন্ধন কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া, গৃহিণী, পুস্তকাদি লইয়া, পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকিবেন, এবং স্বামী যে, তাহাতে প্রীতি লাভ করিবেন, ইহা অতি শোচনীয় দৃশ্য! ফলতঃ, হিন্দু-সমাজের ইহা ব্যবস্থা নহে। পরন্তু তাহার পরিবর্ত্তে গৃহ-স্বামী, আহারের সময় যদি সম্মুখে পত্নী বা কন্যার সযত্ন-প্রস্তুত নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য, সুসজ্জিত দর্শন করেন, তবে রন্ধন-কার্য্যে পত্নীর মনোনিবেশ-দর্শনে, তিনি নিশ্চয়-ই অধিকতর পরিতোষ লাভ করিবেন। যাঁহারা, স্বামী ও সন্তানাদি আত্মীয়বর্গের স্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করেন, তাঁহারা যেন স্বহস্তে রন্ধন করেন। যাঁহারা, রন্ধন করিতে অশক্ত, তাঁহারা যেন স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতে মনোযোগিনী হন। এখন পর্য্যন্ত-ও এ দেশের কোন কোন ধনী পরিবারদিগের গৃহিণীরা, স্বয়ং রন্ধন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা, আজ কাল ইংরাজ-মহিলাদিগের দেখা-দেখি, রন্ধন-কার্য্য অত্যন্ত ঘৃণার্হ মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখুন, সেই ইংরাজ-জাতির এক জন খ্যাত-নামা গ্রন্থকর্ত্তা, এ সম্বন্ধে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার জনসন্ বলিয়া গিয়াছেন,—'স্ত্রী, দুই এক পৃষ্ঠা পুস্তক পাঠ করিলে, স্বামী, যে পরিমাণে সুখী হইয়া থাকেন, রন্ধন-কার্য্যে যদি তিনি পারদর্শিনী হইয়া, উপাদেয় খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া, স্বামী ও আত্মীয় স্বজনকে ভোজন করিতে দেন, তাহা হইলে, স্বামী, অধিকতর পরিতুষ্ট হইবেন।'

আজ কাল ইয়ুরোপ এবং আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য জনপদে বালিকা-বিদ্যালয়-সমূহে রন্ধন-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অতএব কি ধনবানের গৃহিণী, কি দরিদ্র-রমণী—কেহ-ই যেন, স্বহস্তে রন্ধন করিতে, অবহেলা প্রদর্শন না করেন। মহাভারত-পাঠে জানা যায়, পাণ্ডব-কুল-লক্ষ্মী দ্রৌপদী দেবী, বনবাস-কালে-ও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, স্বামী ও পরিজনবর্গকে ভোজন করাইয়া, যখন দেখিতেন, আর অতিথি-অভ্যাগতের আগমনের সম্ভাবনা নাই, তখন-ই স্বয়ং আহার করিতেন। পূর্ব্বকালে এইরূপ, সম্রাট্-মহিষী হইতে সামান্য গৃহস্থ-কন্যা পর্য্যন্ত সকলে-ই, স্বহস্তে রন্ধন করিতেন।

আমাদের দেশে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত। সুতরাং শরীর-পরিচালন জন্য কার্য্যাদিতে লিপ্ত থাকা, যোষিদ্বর্গের স্বাস্থ্য-রক্ষা-সম্বন্ধে, একটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার প্রতি উপেক্ষা করায়, বর্ত্তমান সময়ে অবলাগণ, অধিকতর রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছেন। সর্ব্বদা কার্য্যে লিপ্ত থাকা-ই, জীবনের একটি মহান্ উদ্দেশ্য। কার্য্য-হীন জীবন, জীবন-ই নহে। রন্ধন-কার্য্যের সহিত গৃহস্থালীর অন্যান্য কার্য্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং, সুপাচিকা হইতে হইলে, সাংসারিক অন্যান্য বিষয়ে-ও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই জ্ঞান, অধিক পরিমাণে উপার্জ্জন করিতে পারিলে, সুগৃহিণী হইতে পারা যায়। সুগৃহিণী, সংসার-ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী!

(ক্রমশঃ)

বিবিধ-রন্ধন।

মুগের দাইলের খোরাসানি।

যে নিয়মে দাইল রাঁধিতে হয়, সেই নিয়মে সোণামুগের দাইল, পাক করিতে আরম্ভ কর। দাইল সুসিদ্ধ হইয়া আসিলে, তাহাতে পরিমাণ মত আলুবুখারা ফেলিয়া দাও। যখন দেখিবে, উহা সিদ্ধ হইয়া, বেশ লপেট গোছের অর্থাৎ থক্‌-থকে হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহা নামাইয়া, ঘৃতে সম্বরা দাও। সম্বরা দেওয়ার পূর্ব্বে যে, হরিদ্রা ও লবণ এবং কিঞ্চিৎ মিষ্ট দিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, জ্বাল হইতে নামাও।

এখন দাইলের পরিমাণ বুঝিয়া, তাহাতে আম-আদার রস দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখ। পরিবেষণ-কালে পুনর্ব্বার নাড়িয়া লইবে। এই দাইল অত্যন্ত মুখ-প্রিয়।

দাইলের কারি।

পোলাও রন্ধনে যে আখ্‌নি ব্যবহার হইয়া থাকে, সেই জলে বুট, অড়হর, সোণামুগ কিংবা খাঁড়ি মসুরের দাইল পাক করিবে। কারির দাইলে, আদৌ ঝোল থাকিবে না, উহা বেশ থক্‌-থকে হইবে। দাইল পাক হইলে, উহা উনান হইতে নামাইয়া, তাহাতে গরম মসলার গুঁড়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। দাইলের কারিতে একটু অধিক ঘৃত দিতে হয়। সাধারণ দাইল

অপেক্ষা, কারি-পাকের দাইল, অত্যন্ত সুখাদ্য। রুচি অনুসারে সম্বরা দেওয়ার সময়, উহাতে পিঁয়াজের কুচি দিলে, অপেক্ষাকৃত সুমধুর হইয়া থাকে।

দাইল-কারিতে গল্‌দা চিংড়ি অথবা বড় মাছের মুড় দিয়া পাক করিলে, উহা যার-পর-নাই রসনা-প্রিয় হইয়া থাকে। সাধারণ দাইল অপেক্ষা, দাইল-কারি কিছু গুরু-পাক।

মাছ ভাঁজিবার নিয়ম।

যে কোন প্রকারের মৎস্য রন্ধন করিতে হইলে, মৃদু জ্বাল-ই যে প্রশস্ত, এ-কথা প্রত্যেক পাচক কিংবা পাচিকার মনে রাখা উচিত। মৃদু জ্বালে, মাছ ভাজিলে, তাহা যেমন, অল্পে অল্পে সুসিদ্ধ হয়, সেইরূপ উহা আবার স্বাস্থ্য-কর খাদ্য-মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। অধিক জ্বালে মাছ ভাজিলে, তাহার জলীয় অংশ অর্থাৎ রস্র মরিয়া যায়; মাছ-ও শক্ত হইয়া উঠে, আর খাইতে তত সুস্বাদু হয় না। মাছ ভাজিবার পূর্ব্বে, ছোট মাছ হইলে, তাহাতে মাখন, ঘৃত কিংবা তৈল মাখাইয়া লইলে, চলিতে পারে।

যেরূপ মৎস্য-ই হউক না কেন, ভাল মাখন, ঘৃত অথবা তৈল দ্বারা তাহা ভাজিয়া না লইলে, কখন-ও তাহা রুচি-কর হয় না। তৈলাদি যদি ভাল হয়, তবে তাহাতে একবার মাছ ভাজিয়া, পরে তাহা পরিষ্কৃত পাত্রে, আগুনের তাপ কিংবা ধোঁয়া না লাগে, এরূপ স্থানে রাখা যায়, তাহা হইলে, পর দিন-ও তাহাতে মাছ ভাজা যাইতে পারে; ইহাতে কোন অপকার হয় না।

অল্প তৈল মৎস্য ভাজিবার পক্ষে প্রশস্ত নহে। মাছ ভাজিবার সময় পাক-পাত্রে এরূপ তৈল দিবে, যেন তাহাতে মাছগুলি ডুবিয়া যায়। অল্প তৈলে ভাজিলে, সেই মাছ তত রুচি-কর হয় না। তৈল কিংবা ঘৃত না ফুটিয়া উঠিলে, অর্থাৎ গাঁজা মরিয়া না আসিলে, তাহাতে মৎস্য কিংবা মাংস ঢালিয়া দেওয়া উচিত নহে; কারণ, কাঁচা ঘৃত অথবা তৈলে মৎস্য কিংবা মাংস ভাজিতে গেলে, অধিক পরিমাণে ঘৃত বা তৈল মৎস্য বা মাংসে টানিয়া লয়; এইরূপ কাঁচা ঘৃত অথবা তৈল টানিয়া লইলে, মৎস্যাদি নরম হইয়া পড়ে; অথচ তেমন ঘোরাল রঙ্দার-ও হয় না।

সিদ্ধ-পক্ক মৎস্য।

অনেক প্রকার ভাল ভাল রন্ধনে মৎস্য সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ভাজিলে মাছ শক্ত হয়, সুতরাং তাহাতে মাছের চপ্, দম্-কোপ্তা প্রভৃতি ভাল হয় না। এজন্য কোন কোন রন্ধনে মাছ সিদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু সিদ্ধ করিবার-ও আবার নিয়ম আছে। যে কোন মাছ সিদ্ধ করিবার সময়, জলে পরিমাণ মত লবণের সহিত অল্প পরিমাণে সোরা মিশাইলে, মৎস্য সুসিদ্ধ হইবে, অথচ শক্ত থাকিবে। দম-কোপ্তার মাছ কিয়ৎক্ষণ তেঁতুল-গোলায় ডুবাইয়া রাখিয়া, পরে রন্ধন করিতে হয়।

মাছ প্রয়োজন মত সিদ্ধ হইয়াছে কি না জানিতে হইলে, দাঁড়ার কাছের মাছ, যখন সহজে ছাড়িয়া আসিতেছে দেখা যাইবে, তখন-ই বুঝিতে হইবে, মৎস্য বেশ সুসিদ্ধ হইয়াছে, আর জালে রাখিবার প্রয়োজন নাই। এই সময় উনান হইতে উহা নামাইতে হয়। মাছ অধিক সিদ্ধ হইলে, বিস্বাদ হইয়া থাকে; এরূপ মৎস্য অস্বাস্থ্য-কর।

রাঁধা মাছ গরম রাখিবার উপায়।

যদি মৎস্য পাকের পর আহারের অধিক বিলম্ব থাকে, তবে তাহা ঠাণ্ডা হইবার সম্ভাবনা; ঠাণ্ডা মৎস্য কেবল যে বিস্বাদ, তাহা নহে; উহা আবার সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্য-কর। এরূপ অবস্থায় রাঁধা মাছ গরম করিতে হইলে, তাহা পুনর্ব্বার জ্বালে চড়ান নিতান্ত অবিধি; কারণ, একবার রন্ধনের পর, তাহা যদি আবার জ্বালে বসান যায়, তবে তাহা-ও স্বাস্থ্যের উপযোগী হয় না। কিন্তু, নিম্ন-লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে, রাঁধা মাছ সহজে ইচ্ছানুরূপ গরম রাখিতে পারা যায়, অথচ আস্বাদনের-ও কোন ব্যতিক্রম হয় না।

যে পাত্রে মৎস্য রাখিতে হইবে, তাহা অত্যন্ত মোটা অর্থাৎ পুরু যেন না হয়, এরূপ পাত্রে মৎস্য ঢালিয়া, পাত্রের মুখ এমন করিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে, যেন তাহাতে ফাঁক না থাকে। ইতি-পূর্ব্বে-ই কিন্তু গরম জল প্রস্তুত রাখা প্রয়োজন। এখন এই ফুটন্ত গরম জলে মৎস্যের পাত্রটি বসাইয়া রাখিবে।

জলে বসাইবার সময় পাত্রটি আবার এক খণ্ড পরিষ্কৃত মোটা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিলে ভাল হয়। ভোজনের পূর্ব্বে অর্থাৎ তিন চারি মিনিট অগ্রে, জল হইতে পাত্রটি তুলিয়া, পরিবেষণ করিলে-ই, মনে হইবে যেন, এই-মাত্র উনান হইতে ব্যঞ্জন নামান হইল। এইরূপ অবস্থায় রাখিলে, আস্বাদের ব্যতিক্রম ঘটে না, অথচ স্বাস্থ্যের-ও বিরোধী হয় না। মৎস্য-পাত্রটি যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলের উপর স্থাপিত থাকিবে, ততক্ষণ যেন জল ফুটিতে থাকে।

মাছের ভর্ত্তা।

প্রথমে মাছ কুটিয়া বাছিয়া ধুইয়া লইবে। পরে একখানি পাত্রে তাহা সারি সারি করিয়া সাজাইয়া রাখিবে। এ দিকে জল-সহ পাক-পাত্র উনানে চড়াইবে। জ্বালে উহা ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে পরিমাণ মত লবণ ও দুই একখানি তেজপাত, এবং কিছু ধনে-শাক ফেলিয়া দিবে। অনন্তর, ফুটন্ত জলে, মৎস্য-পূর্ণ পাত্রখানি আস্তে আস্তে ছাড়িয়া দিবে। জ্বালে মাছ সুসিদ্ধ হইলে, তাহা নামাইয়া লইবে। এখন এই সিদ্ধ মাছে, পরিমাণ মত কাঁচা লঙ্কা-বাটা, সরিষার তৈল, সামান্য সরিষা-বাটা, এবং লবণ মাখাইয়া লইলে-ই খাদ্যের উপযোগী হইবে।

মৎস্যের মাখনামৃত।

কৈ-ভোলা, পার্শে, বাটা প্রভৃতি ক্ষুদ্রজাতীয় মৎস্য সমূহে মাখনামৃত পাক করিতে হয়। আস্ত মাছ এমন করিয়া কুটিবে, যেন তাহার ভিতরের যাবতীয় ময়লা পরিষ্কৃত ও ধৌত হইতে পারে। সম্ভবতঃ সামান্য মাত্র চিরিয়া, ভিতরের ময়লা প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে হয়। অনন্তর, তাহা ভাসা জলে উত্তমরূপ ধুইতে হয়। এখন পরিষ্কৃত নেকড়ায় মাছগুলি এমন ভাবে পুঁছিয়া লইতে হইবে, যেন তাহাতে আদৌ জল না থাকে।

এখন মাছের পেটের মধ্যে, পরিমাণ মত লবণ, মরীচের গুঁড়া, আদা-বাটা, এবং মাখন পূরিয়া, ময়দা দ্বারা চিরা-মুখ আঁটিয়া দিবে। মুখ আঁটা

হইলে, মাছের গায়ে সামান্যরূপ মরীচের গুঁড়া, লবণ, এবং মাখন মাখাইয়া, মৃদু জ্বালে চড়াইবে। জ্বালে লাল্‌ছে রঙের হইলে, তাহা নামাইয়া লইবে। ভাজিবার সময় যদি মাছের কোন অংশ ফাটিয়া যায়, তবে সেই ফাটা স্থানে ময়দা আঠা আঠা করিয়া গুলিয়া দিবে। এই ভর্জ্জিত মৎস্যে মাখন মাখাইয়া, গরম গরম আহার করিলে, বেশ সুখাদ্য বোধ হয়।

মৎস্য-বিলাস।

প্রথমে আধ পোয়া মাখন জ্বালে চড়াও; পরে তাহাতে এক ঝিনুক ময়দা, পরিমাণ মত গরম-মসলা, জায়ফলের গুঁড়া, তেজপত্র, সামান্য লেবুর রস, এবং জাফরান ও লবণ দিয়া নাড়িতে থাক। অনন্তর, তাহাতে মাছ ছাড়িয়া দাও। ভাজিবার পূর্ব্বে যে, মাছগুলি উত্তমরূপে কুটিয়া বাছিয়া ধুইয়া লইতে হয়, তাহা সকলে-ই অবগত আছেন। জ্বালে মাছের সুন্দররূপ রঙ্‌ হইলে, তাহা নামাইয়া লইবে। মৎস্য-বিলাস ঠাণ্ডা হইলে, খাইতে সুস্বাদ হয় না, এজন্য গরম গরম আহার করা-ই সুব্যবস্থা। আর ইহা-ও মনে রাখা আবশ্যক যে, মাখন, ঘৃত কিংবা খাঁটি সরিষার তৈলে-ও উহা পাক করা যাইতে পারে। তবে আস্বাদগত পার্থক্য হইয়া থাকে।

মাছের হরিশা।

উত্তম করিয়া, মাছটি কুটিয়া বাছিয়া লও; এবং ভাসা জলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেল। এখন যে পরিমাণ জলে মাছটি ডুবাইয়া রাখা যাইতে পারে, সেই পরিমিত জলে, ভিনিগার মিশাইয়া, তাহাতে মাছটি আধ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ।

অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, জল হইতে মাছ তুলিয়া, নেকড়ায় করিয়া, তাহার পেটের ভিতর ও উপরিভাগ বেশ করিয়া পুঁছিয়া ফেল। এখন কচি মাংসের কিমাতে লঙ্কা, আদা ও পিঁয়াজবাটা * এবং লবণ ও মাখন মাখাইয়া, মাছের পেটের ভিতর

---

* যে যে স্থলে পিঁয়াজের উল্লেখ আছে, রুচি অনুসারে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়; কিন্তু, তৎপরিবর্ত্তে আদার পরিমাণ কিছু বাড়াইয়া দিলে ভাল হয়।

পূরিয়া দাও। এখন মৎস্যটি গোলাকৃতি করিয়া, অর্থাৎ লেজার সহিত মুড় বাঁধিয়া, একখানি ডিসের উপর রাখিয়া দাও।

এ দিকে একখানি কড়াতে শীতল জল চড়াইয়া, তাহাতে ডিস-সহ মাছ ছাড়িয়া দাও। অনন্তর, আস্তে আস্তে জ্বাল দিতে থাক; কিন্তু জল যেন অধিক না ফুটে। মাছ সিদ্ধ করিবার সময় তাহাতে পরিমাণ মত লবণ দিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া লও। কেহ কেহ এই সিদ্ধ মাছে মাখন মাখাইয়া আহার করিয়া থাকেন। রুচি অনুসারে আবার তাহা ঘৃত কিংবা তৈলে ভাজিয়া আহারের উপযোগী হইতে পারে।

মোরল্লা মাছের কাবাব।

তাজা মোরল্লা কুটিয়া বাছিয়া, ভাসা জলে উত্তমরূপে ধুইয়া লও। পরে তাহা শুক্‌ন কাপড়ে এমন করিয়া পুঁছিয়া লও, যেন তাহাতে একটু-ও জল না থাকে। এখন প্রত্যেক মাছের পেটের ভিতর পরিমাণ মত লবণ ও মরীচের গুঁড়া পূরিয়া, মাছের উপর অল্প পরিমাণে ময়দা ছড়াইয়া দাও।

এদিকে পাক-পাত্রে মাখন, ঘৃত বা তৈল দিয়া মৃদু জ্বালে চড়াও; এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে মাছগুলি ছাড়িয়া দাও। এক পিঠ লাল্‌ছে ধরণে ভাজা হইলে, অপর পিট উল্টাইয়া দাও। দুই পিট উত্তমরূপ ভাজা হইলে, তাহার উপর পুনর্ব্বার মাখন, ঘৃত বা তৈল ছড়াইয়া দিয়া, দুই একবার চুড়চুড় করিয়া ফুটিয়া আসিলে, নামাইয়া লও।

রুচি অনুসারে ভাজিবার সময় পরিমাণ মত হরিদ্রা ও আদার রস দিতে পারা যায়। গরম গরম এই কাবাব উত্তম মুখ-প্রিয়।

মাছের ফ্রেন্সফ্রাই।

যে কোন মাছ যত টাট্‌কা হয়, তত-ই ভাল। রাঁধিবার পূর্ব্বে মাছ বেশ করিয়া কুটিয়া বাছিয়া, ভাল জলে ধুইয়া লও। উত্তমরূপ ধৌত হইলে, শুষ্ক বস্ত্র-খণ্ডে পুঁছিয়া, তাহা কাপড়ে কিছুক্ষণ জড়াইয়া রাখ। যখন দেখিবে, মাছ বেশ শুষ্ক হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার গায়ে একটু-ও জল নাই, তখন তাহা বাহির কর।

এ দিকে একটি পাত্রে ডিমের তরলাংশ অর্থাৎ হরিদ্রা ও শ্বেতাংশ একত্র মিশাইয়া লও। এই মিশ্রিত তরলাংশে পরিমাণ মত লঙ্কার গুঁড়া, আদা ও পিয়াজের রস, এবং লবণ মিশাইয়া রাখ। অপর একটি পাত্রে বিস্কুটের গুঁড়ার সহিত অল্প পরিমাণে ময়দা মিশ্রিত কর। এখন পূর্ব্ব-প্রস্তত মৎস্য, প্রথমে ডিমে ডুবাইয়া, পরে তাহার উপর বিস্কুটের গুঁড়া মাখাইয়া লও। এইরূপে সমুদয় মৎস্যে মাখান হইলে, মাছের গা হইতে গুঁড়াগুলি অল্প ঝাড়িয়া ফেল। এখন মাখন কিংবা ঘৃতে এই মৎস্য ভাজিয়া লইলে-ই, খাদ্যের উপযুক্ত হইল। এই ভাজা মাছ অত্যন্ত রসনা-প্রিয়। রুই, কাতলা, মৃগেল এবং বাটা, কৈ, পার্শে, ভেট্‌কি প্রভৃতি সকল প্রকার মৎস্য ফ্রেন্স-ফ্রাইয়ের উপযুক্ত।

মাছের ফিলিট।

রুই, মৃগেল প্রভৃতি বড়জাতীয় মৎস্য ফিলট রাঁধিবার পক্ষে উপযোগী। প্রথমে মাছটি এরূপ করিয়া ধুইয়া বাছিয়া লইবে, যেন তাহার ভিতর কোনরূপ ময়লা না থাকে। তৎপরে, মাছের দাঁড়ার দুই পাশের মাংসল স্থান, লেজার দিক্ হইতে মাথা পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ-ধার ছুরি দ্বারা কাটিয়া লও; এবং প্রত্যেক ধারের খণ্ডকে দুই দুই ভাগে বিভক্ত কর। এখন এই মৎস্য-খণ্ড ইচ্ছানুরূপ-আকৃতি কর।

অনন্তর, মৎস্যখণ্ডগুলিকে কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে রাখিয়া দাও। কিয়ৎক্ষ এইরূপ অবস্থায় কাপড়ের ভিতর রাখিলে, মাছের জলীয় অংশ শুকাইয়া যাইবে। এখন ডিমের তরলাংশে লঙ্কা, আদা, জাফ্‌রান্ বা হরিদ্রা এবং লবণ মিশাইয়া, তাহাতে এক একখানি করিয়া মাছগুলি ডুবাইয়া তোল; অনন্তর, তাহাতে অল্প ময়দার সহিত বিস্কুটের গুঁড়া মাখাইয়া লও।

এদিকে জালে ঘৃত চড়াইয়া, তাহাতে মৎস্য-খণ্ডগুলি বাদামী ধরণে ভাজিয়া, তুলিয়া রাখ। এখন গরম গরম আহার করিয়া দেখ, উহা তোমার রসনার সহিত কিরূপ আত্মীয়তা করিয়াছে।

রুচি অনুসারে ডিমের তরলাংশের সহিত লিমন-যূষ এবং সুগন্ধি মসলা মিশাইয়া লইলে, অত্যন্ত সুস্বাদু হইয়া থাকে।

মাছের হরিহর।

মাছের হরিহব অত্যন্ত মুখ-প্রিয় খাদ্য। উহার বিশেষত্ব এই যে, উহার এক পিঠ ঝালদার ও অপর পিঠ অম্ল-রস-বিশিষ্ট। রুই, কাতলা প্রভৃতি বৃহৎ-জাতীয় মৎস্য হরিহরের পক্ষে প্রশস্ত।

প্রথমে মাছ বাছিয়া, এক ছটাক হইতে আধ পোয়া পরিমাণে, এক একখানি খণ্ড প্রস্তুত কর। এখন উহাতে হরিদ্রা ও লবণ মাখাইয়া, ভাসা তৈলে ভাজিয়া রাখ। অনন্তর, একখানি চাটু অথবা তৈ উনানে বসাও। মাছের পরিমাণ বুঝিয়া, তাহাতে তৈল ঢালিয়া দাও। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে পরিমাণমত আদা-বাটা, হরিদ্রা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, সরিষা-বাটা, এবং লবণ ঢালিয়া দিযা নাড়িতে থাক। মসলাগুলি ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে পূর্ব্ব-রক্ষিত ভাজা মাছগুলি এক একখানি করিয়া বসাইয়া দাও। কিন্তু আদৌ উল্টাইয়া দিবে না। যখন দেখিবে, উহা মাখ-মাখ গোছের হইয়াছে, তখন তাহাতে অল্প পরিমাণে তৈল ঢালিয়া দিয়া, দুই একবার ফুটিয়া আসিলে-ই, নামাইয়া রাখ।

এখন অপর একখানি চাটু বা তৈ জ্বালে চড়াও। পরে তাহাতে সামান্য তৈল ঢালিয়া দাও। তৈল পাকিয়া আসিলে, সরিষা ফোড়ন দিয়া, তাহাতে পরিমাণমত তেঁতুল-গোলা, হরিদ্রা-বাটা এবং লবণ ঢালিয়া দাও। ঝোল ফুটিয়া, গাঢ় হইয়া আসিলে, তাহাতে ঝালের রাঁধা মাছগুলি এক একখানি করিয়া তুলিয়া, যে পিট রাঁধা হয় নাই, সেই পিট অম্বলের উপর সাজাইয়া রাখ। পূর্ব্বে একপিঠ ঝাল মসলায় রাঁধা হইয়াছে, এখন অপর পিঠ অম্ল-সংযোগে রাঁধা হইল। এই মাছ ভোক্তাদিগকে পরিবেষণ কর; আহারের সময় এক-ই মাছ হইতে অম্ল ও ঝাল দুই প্রকাব আস্বাদন পাইবে। হরিহর-রন্ধনে পাচক ও পাচিকাদিগের গুণপণা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মাছের পূরবাহার।

একটি দুই কিংবা তিন সের ওজনের রুই, কাতলা অথবা মৃগেল মাছ, একখানি মোটা নেকড়া অথবা ঝাড়ন অত্যন্ত গরম জলে ভিজাইয়া, তদ্দ্বারা উত্তমরূপে ঘসিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার কর। অনন্তর, মাছের গা হইতে আঁইস

ছাড়াইয়া, উহার ভিতরের ময়লা অর্থাৎ আঁৎ, পিত্ত ও ফুল্‌কা প্রভৃতি বাহির কর। এখন ঠাণ্ডা জলে মাছের পেটের ভিতর ও উপরি ভাগ ভাল করিয়া ধুইয়া ফেল।

এদিকে কচি পাটার কিমাতে * পরিমাণ মত লঙ্কা, হরিদ্রা, আদা ও পিঁয়াজ-বাটা, এবং লবণ ও মাখন মাখাও। অনন্তর, এই মসলা-মিশ্রিত পুর মাছের পেটের ভিতর পূরিয়া, পেটি সেলাই করিয়া দাও। সেলাই করা হইলে, মাছের মুখ বা মুড়, লেজার সহিত বাঁধিয়া দাও। বাঁধিয়া মাছের গায়ে অল্প পরিমাণে ময়দা ছড়াইয়া দাও। তদনন্তর, মাছের সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে মাখন মাখাইয়া, মৃদু জ্বালে রাখ। ভাজিবার সময় মধ্যে মধ্যে উহাতে আদা ও পিঁয়াজের রসের সহিত পরিমাণ মত মাখন দিতে থাক। মাছের দুই পিঠ উত্তমরূপ ভাজা হইলে নামাও। গরম গরম অবস্থায়, পুরবাঁহার বেশ সুখাদ্য। পরিবেষণকালে মৎস্য যে, ছুরি দ্বারা কাটিয়া ভোক্তাদিগের পাতে দিতে হয়, তাহা বোধ হয় সকলে-ই জানেন।

রুচি-অনুসারে আবার মাংসের পরিবর্ত্তে, মসলা-আদির সহিত সিদ্ধ আলুর-ও পুর দিতে পারা যায়।

সূপ পাকের নিয়ম।

যে পাত্রে সূপ রাঁধিবে, তাহা পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। ডেকচির ভিতর ও বহির্ভাগ এবং কলায়ে যেন, কিছুমাত্র ময়লা না থাকে। যে মাংস বা তরকারি, সূপের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইবে, তাহা-ও সুপরিষ্কৃত, এবং সুদৃশ্য হওয়া আবশ্যক। যখন উনানের উপর সূপ চড়ান হইবে, তখন যতক্ষণ না জ্বাল হইতে তাহা নামান হয়, ততক্ষণ পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক। রন্ধন শেষ হইলে, যে পাত্রে পাক করা হইয়াছে, সেই পাত্রে কখন-ও তাহা রাখিবে না; পরিষ্কৃত পৃথক্ পাত্রে ঢালিয়া রাখিবে।

প্রথমে যে সময় সূপ ফুটিয়া উঠিবে, সেই সময় হইতে-ই, তাহার গাদ কাটিতে আরম্ভ করিবে; নতুবা সূপের ভাল রঙ্ হইবে না। প্রথম ফুটিবা-মাত্রে-ই, তাহাতে লবণ দিবে, সহজে-ই গাদ কাটিতে আরম্ভ হইবে। সমস্ত গাদ

* নূতন সংস্করণ 'পাক-প্রণালী'তে কিমা প্রস্তুতের নিয়ম দেখ।

কাটা হইলে, অর্থাৎ আর যখন আদৌ গাদ উঠিতেছে না দেখিবে, তখন তাহাতে তরকারি ঢালিয়া দিবে। স্থপের পক্ষে টাট্‌কা মাংস-ই প্রশস্ত। খোবা খোবা মাংস, হাড়, গর্দ্দানা, গাঁইটের মাংস, এবং ভেড়ার (মটনের) বাং-ই রন্ধনে উপযুক্ত।

অতি মৃদু জ্বালে-ই স্থপ রাঁধিতে হয়। গাদ কাটার পর হইতে-ই, উনানের আঁচ এরূপ কমাইয়া দেওয়া উচিত, যেন সামান্য তাপে স্থপ অল্প অল্প চুড়্ চুড়্ করিতে থাকে। যতক্ষণ না রাঁধা শেষ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ মৃদু আঁচে পাক-পাত্রটি উনানে রাখা আবশ্যক। কারণ, এককালে আঁচ কমিয়া আসিলে, স্থপ শীতল হইয়া যাইবে, উহা ঠাণ্ডা হইলে-ই সমস্ত শ্রম-ই পণ্ড হইবে, অর্থাৎ স্থপ ভাল হইবে না। ফলতঃ, মৃদু আঁচে স্থপ রন্ধন, সুশিক্ষিত পাচক-মাত্রের-ই অনুমোদিত। স্থপের ন্যায় ব্রথ রন্ধনে-ও, এইরূপ এক-ই নিয়ম পালন করিতে হয়।

স্থপে যে মাংস ও তরকারি ব্যবহৃত হইবে, সেগুলি উত্তমরূপে ভাজা বা কসা হইলে, তাহাতে পরিমাণ মত ফুটন্ত জল ঢালিয়া দেওয়া-ই বিধি ; অন্যভাবে ঠাণ্ডা জল-ই প্রশস্ত।

আপত্তি না থাকিলে, রুচি অনুসারে, সিদ্ধ করিবার [illegible] কিংবা রস্থন, স্থপ বা ব্রথে ব্যবহার করিতে পারা যায়। কিন্তু, উহা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা-ই সুপরামর্শ। কারণ, পিয়াজ অথবা রস্থন সকলের পক্ষে [illegible] নহে, এবং অনেকে আবার ঐ সকলের তীব্র গন্ধ সহ্য করিতে অশক্ত।

ভাল স্থপ রন্ধনে অল্প পরিমাণে শর্করা বা চিনি ব্যবহার করা যাইতে পারে। চিনি দ্বারা স্থপের রং খুলিয়া থাকে। সাড়ে তিন সের পরিমিত জলে, আধ ছটাক চিনি ব্যবহৃত হইতে পারে। ফলতঃ, সর্ব্বত্র-ই এই অনুপাতে চিনি ব্যবহার করিতে পারা যায়।

লবণের ঠিক পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে না ; রন্ধন-কার্য্যে যাহার কিছুমাত্র দক্ষতা নাই, তাহার-ই জন্য পরিমাণ লিখিত হইয়া থাকে ; কিন্তু, সেরূপ অদক্ষ পাচকের হস্তে রন্ধন-ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না। সচরাচর সাড়ে তিন সের পরিমিত জলে, এক ছটাক লবণ দেওয়া-ই ব্যবস্থা। ঝোলের আধিক্যে লবণের-ও পরিমাণ বাড়াইতে হয়। ফলকথা, লবণ

একটু হাতে রাখিয়া দেওয়া-ই ভাল ; অধিক মাত্রায় লবণ ব্যবহার না করা-ই সুপরামর্শ।

আহারের সময় সূপের উপর আদৌ চর্ব্বি না ভাসে, সে দিকে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অতএব, যে মাংসে সূপ রাঁধিতে হয়, অতি যত্ন সহকারে তাহার গাত্র হইতে চর্ব্বি তুলিয়া ফেলা আবশ্যক।

যতদূর সম্ভব, সূপ গরম গরম পরিবেষণ করিবে।

সূপ কতক্ষণ জ্বালে রাখিলে, সুসিদ্ধ ও সুরঞ্জিত হইবে, ঘড়ী ধরিয়া তাহার হিসাব বলা অসম্ভব ; কারণ, মাংস কোমল কি কঠিন, তরকারি সহজে সিদ্ধ হইবার উপযোগী কিংবা ভিন্নরূপ, এই সকল ঠিক জানা থাকিলে-ও, জল ও জ্বালের পরিমাণ, এবং সময় নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। এজন্য অনভিজ্ঞ পাচক কিংবা পাচিকার হস্তে রন্ধন-কার্য্যের ভারার্পণ না করিয়া, রন্ধন সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম যাহারা অবগত আছে, তাহাদিগকে পাক-কার্য্যে নিযুক্ত করা [illegible] গন দ্রব্য রন্ধন করিবার সময়, মনে রাখা উচিত যে, অর্দ্ধ-সিদ্ধ [illegible] স্বাস্থ্য-কর, এবং অরুচি-জনক, অতিসিদ্ধ আহার্য্য-ও আবার, [illegible] অহিত-কর এবং অরুচি-জনক! অতএব অর্দ্ধ-সিদ্ধ [illegible] শরীরে-ই [illegible] বর্জ্জনীয়।

[illegible] পাতলা সূপ গাঢ় করিতে হইলে, সাদা সূপে আরারুট [illegible] পরিষ্কৃত চাউলের গুঁড়া, (খিচ-শূন্য) অল্প লবণের সহিত [illegible] গুলিয়া, সূপ নামাইবার একটু পূর্ব্বে তাহাতে ঢালিয়া দিবে। এরূপ [illegible] রিয়া গুলিবে, যেন তাহাতে আদৌ খিচ না থাকে, কিংবা তাহা আঠা [illegible] না হয়। বেশ পাতলা করিয়া গুলিয়া, তাহা সূপে ঢালিয়া দিবে ; এবং অন্ততঃ দশ মিনিট কাল উনানে রাখিবে। এই সময় আঁচ একটু বাড়াইয়া দিবে, যেন ঝোল বেশ ফুটিতে পারে।

সূপে ব্যবহার্য্য মসলাগুলি যথা-সম্ভব পরিষ্কৃত হইবে। অধিক পুরাতন মসলা দ্বারা সূপ রাঁধিলে, তাহা বিস্বাদ হইয়া থাকে। এজন্য উৎকৃষ্ট মসলা-ই ব্যবহার করিবে।

পিয়াজ ব্যবহারকালে, অগ্রে তাহার খোসা ভাল করিয়া ছাড়াইবে ; এবং চাটু বা অন্য কোন প্রকার পাক-পাত্রে অল্প আঁচে তাহা ভাজিয়া লইবে।

ঘৃত অথবা তৈলে না ভাজিয়া, গরম চাটুতে নাড়িয়া চাড়িয়া লইলে-ই চলিবে। এইরূপ ভাজা পিয়াজ ব্যবহার করিলে, সূপের রং খুলিবে, এবং উহার দুর্গন্ধ অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিবে।

কচি মাংসের আখ্‌নি সূপ।

এই সূপ কেবল মাত্র যে, রোগীর পক্ষে সুপথ্য তাহা নহে; ফলতঃ, সুস্থ ব্যক্তির আহারে-ও ইহা যার-পর-নাই উপকারী। রোগীর বলবিধানের জন্য আখ্‌নি সূপ অপেক্ষা বল-কর পথ্য আর দ্বিতীয় নাই, ইহা-ই অনেক চিকিৎসকের অভিমত। অতএব, এরূপ বল-কর পথ্য রাঁধিবার নিয়ম প্রত্যেক গৃহস্থের জানিয়া রাখা ভাল। সুস্থ শরীরে চর্ব্ব্য-চূষ্য আহার-সুখ, সকল সময় এবং সকল অবস্থায় ঘটিয়া উঠে না; শরীর মাত্রে-ই রোগের অধিকার প্রবল; এজন্য রসনা-তৃপ্তি-কর নানাবিধ রন্ধন-প্রণালী জানি[illegible] থা যেমন প্রয়োজন, সেইরূপ সুপক্ক খাদ্য-ও আবার সুস্থ শরীরে তৃপ্তি-[illegible]ভাবে [illegible]গীকে এই পথ্য অল্প অল্প পরিমাণে আহারে অভ্যাস করাইতে[illegible] হইতে-ই অধিক পরিমাণে খাইতে দিলে, অপকার হইবার

সূপের পক্ষে নরম টাট্‌কা মাংস বাছিয়া লইবে। আধ[illegible] ব্যবহার মাংসের উপরিভাগের ছাল ও চর্ব্বি এমন করিয়া বাছিয়া [illegible] মাংসের গায়ে এক কুচি ছাল কিংবা বিন্দুমাত্র-ও-চর্ব্বি না থাকে। এই মাংস খণ্ডাকারে খুড়িয়া লও। অনন্তর, দেড় পোয়া ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দাও। এখন জল-সহ মাংসের পাত্রটি মৃদু আঁচে বসাও। যতদূর সম্ভব, মৃদু হওয়া আবশ্যক। আর মধ্যে মধ্যে পাক-পাত্রটি না চাড়িয়া দিবে। দুই হইতে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত এইরূপ মৃদু আঁচে রাখিবে, অথচ যেন আদৌ ফুটিয়া না উঠে, বা সোঁ সোঁ না করে। মধ্যে একবার এরূপ আঁচ দিবে, যেন পনর মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উত্তমরূপ ফুটিতে পায়। কোন কোন দূরদর্শী চিকিৎসক বলেন, এরূপ দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত ফুটিতে দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু তাহাতে মাংসের দুর্গন্ধ আদৌ যায় না, এবং তাহা অরুচি-কর হইয়া থাকে। জ্বালে প্রথম ফুটিয়া উঠিলে-ই সূপে

লবণ দিবে। রোগীদিগের পক্ষে এইরূপ রন্ধন-ই উপকারী। জ্বাল হইতে নামাইয়া, মাংস হইতে ঝোল পৃথক্ পাত্রে ঢালিয়া রাখিবে। এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিলে, ঝোলের উপর চর্ব্বি ভাসিয়া উঠিবে; তখন তাহা ফেলিয়া দিবে। এইরূপে ঝোল পরিষ্কৃত করা হইলে, আহারের পূর্ব্বে, তাহা অল্প গরম করিয়া লইবে। এই সূপ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

অনেক প্রকার রন্ধনে মাংসের আখ্‌নির প্রয়োজন হইয়া থাকে। এজন্য কেহ কেহ রুচি-অনুসারে উহার সহিত অল্প পরিমাণে পিয়াজ, শাল-গম ও গাজর প্রভৃতি-ও ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর এই সূপ আহারে ব্যবহার করিতে হইলে, পরিমাণ মত লবণ, এবং দুই চারি বিন্দু লেবুর রস মিশাইতে পারা যায়।

বাদামের সূপ।

করণ ও পরিমাণ।—বাদাম দেড় পোয়া, সূপ বা আখ্‌নি [illegible] মসলার গুঁড়া পরিমাণ মত।

[illegible] খোলা ছাড়াও; [illegible] হাতে সয় এরূপ গরম জলে, ছাড়ান [illegible]। এখন একটু আঁচ বাড়াইয়া দিবে; জলে হাত শরীরে-ই বায় [illegible] ত্ররূপ গরম হইলে, পাক-পাত্র উনান হইতে নামাইয়া শরীরে [illegible] পরে পাক-পাত্র হইতে যত শীঘ্র পার, বাদামগুলি তুলিয়া, তাহার নি[illegible] ছাড়াও; এবং শাঁসগুলি ঠাণ্ডা জলে রাখ। অনন্তর, জল হইতে [illegible]লিয়া, উত্তমরূপে মুছিয়া ওজন কর। তিন পোয়া সূপ রাঁধিতে হইলে, দেড় [illegible]পায়া বাদাম লইবে। এই বাদামগুলি আখ্‌নিতে প্রায় এক ঘণ্টা মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিবে; যখন দেখিবে, হাতার একটু সামান্য ঘা দিলে-ই, উহা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তখন-ই জানিবে যে, উত্তমরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। তৎপরে জল হইতে তুলিয়া, সেগুলিকে যতদূর পার চট্‌কাইয়া লও। খিচ-শূন্য করিয়া চটকাইয়া, পরিষ্কৃত ছাঁকনিতে ছাঁকিয়া লও। এখন পরিমাণ মত আখ্‌নি সূপের সহিত মিশাইয়া জ্বালে চড়াও; এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহা ফুটিয়া না উঠে, ততক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দাও। ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বে পরিমাণ

মত লবণ, এবং সামান্য মসলা দিবে। অল্পক্ষণ জ্বালে রাখিয়া, নামাইয়া লও। সুপ মাত্রে-ই কুসুম কুসুম গরম অবস্থায় সুখাদ্য।

কারি।

সর্ব্বত্রই কারির আদর দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কারির প্রচলন। আমরা সচরাচর যে, মাছ ও মাংসের ঝোল, এবং ডালনা প্রভৃতি আহার করিয়া থাকি, তৎসমুদয় কারির মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু, দেশ-ভেদে কারি-পাকের প্রকার-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা যে কারি রাঁধিয়া থাকি, শিলে পিষিয়া বা বাটিয়া, তাহার মসলা প্রস্তুত করিয়া লই; কিন্তু বিলাতী কারি রাঁধিতে হইলে, কারি-পাউডার অর্থাৎ মসলার গুঁড়া ব্যবহার করিতে হয়। এস্থলে [illegible] আবশ্যক যে, কারির পক্ষে গুঁড়া মসলা-ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইয়ুরোপে [illegible] যেমন নানাপ্রকার কারি-পাউডার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে [illegible]ভাবে পাউডার প্রস্তুত করিবার নিয়ম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

আরনটস্ কারি-পাউডার। [illegible] ব্যবহা[illegible]

[illegible]পকরণ ও পরিমাণ।—হরিদ্রা এক পোয়া, ধনে [illegible] জীরা এক ছটাক, ফনোগ্রিক সিড্ এক ছটাক, * লঙ্কা এক কাঁচ্চা।

মসলাগুলি যতদূর সম্ভব টাট্‌কা এবং পরিষ্কৃত দেখিয়া বাছিয়[illegible] অনন্তর, ঐ সকল মসলা রৌদ্রে উত্তমরূপ শুকাইয়া, পৃথক্ পৃথ[illegible] গুঁড়া করিয়া রাখিবে। এখন এই গুঁড়া মসলা, চালনী কিংবা পাত[illegible] নেকড়ায় ছাঁকিয়া লইবে। ছাঁকা হইলে, প্রত্যেক চূর্ণ উপরি-লি[illegible] পরিমাণে ওজন করিয়া, এক সঙ্গে মিশাইলে-ই, আরনটস্ কারি-[illegible] প্রস্তুত হইল।

---

* বিলাতি দোকানে পাওয়া যায়। অভাবে ছোট এলাচের দানা।

...ক-প্রণালী।

হিন্দু-জাতির রন্ধন-প্রথা।

(২)

আর্য্য-ঋষিগণ, রন্ধন ও ভোজনসম্বন্ধে যে সকল বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয়, সম্পূর্ণ বিজ্ঞানানুমোদিত। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, রন্ধন করিয়া আহার করা-ই, স্বাস্থ্য-লাভ ও আয়ুর্বৃদ্ধির মুখ্য উপায়। এই উপায়-সংসাধন-মানসে অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ, রন্ধনশালা ও চুল্লী-সম্বন্ধে প্রথমে-ই ...পদেশ দিয়াছেন ঃ—

আপ্তান্বিতমসংকীর্ণং শুচি কার্য্যং মহানসম্।

অর্থাৎ, মহানস (রন্ধনশালা)—বিশ্বস্ত-জন-পূর্ণ, প্রশস্ত ও পূত হওয়া উচিত। বাস্তবিক, যে স্থানে পাক-কার্য্য সম্পন্ন হয়, সে স্থান যে, সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়া আবশ্যক, ইহা কাহাকে-ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয় না। কদর্য্য স্থানে পাক করিলে, তত্রত্য দূষিত-বায়ু-সংযোগে যে, খাদ্যাদি অস্বাস্থ্য-কর ও অরুচি-কর হইয়া থাকে, ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রে-ই, সহজে-ই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। রন্ধনশালার পবিত্রতা-সংরক্ষণে হিন্দুজাতি, যেরূপ চিরাভ্যস্ত ও যত্নশীল, পৃথিবীর মধ্যে অপর কোন জাতিকে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুমহিলা, অতি পবিত্রভাবে-ই রন্ধন-গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা খাদ্য-দ্রব্য-সমূহ রসনা-তৃপ্তি-কর করিতে, যে পরিমাণে আয়াস স্বীকা[illegible] থাকেন, রন্ধনশালার পবিত্রতারক্ষাবিষয়ে, তাঁহাদিগকে [illegible]কারি- দেখিতে পাওয়া যায়। এই পবিত্রতা, স্বাস্থ্য ও তৃপ্তি-লা[illegible] সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ, বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি রন্ধন-শালার [illegible] ন্যস্ত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বে-ই উল্লেখ জীবন ও স্বাস্থ্য, যাঁহাদিগের উপর [illegible]ম্পূর্ণ নির্ভ[illegible] আত্মীয় পরিজনবর্গ-ই, রন্ধন-কার্য্যের একমাত্র উ[illegible] জননী, ভগিনী এবং পরম-প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীর ন্যা[illegible] আর কে আছে? রুগ্ন-শয্যায় যাঁহারা, আহার-নিদ্রা করুণাময়ী দেবীর ন্যায় অকৃত্রিমভাবে রোগীর শুশ্রূষা রুণ শোকের সময়ে যাঁহারা, সুমধুর সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা সুশীতল করিয়া থাকেন,—বিপদ্‌কালে যাঁহারা, ছায়ার ন্যায় সঙ্গিনী হইয়া, নিয়ত প্রবোধ-বাক্য দ্বারা বিপন্নের অন্তঃকরণের সন্তাপ করিয়া থাকেন,—তাঁহারা, আমাদের জীবন-সংরক্ষণে আনন্দসহক আন্তরিক যত্ন করিবেন, অন্যের নিকট কখন-ই সেরূপ আশা করা যায়[illegible]

নীচকুলজাত নীচকর্ম্মচারী অথবা রুগ্ন অর্থাৎ চর্ম্ম ও শ্বাসাদি-[illegible] পাচক বা পাচিকার হস্তে কখন-ই রন্ধন-কার্য্যের ভারার্পণ করা উচিত নহে, কারণ, তাহাদিগের সংস্পর্শ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের বিদূষিত বায়ুস্পর্শ দ্বারা পক-দ্রব্য অপ্রীতি-কর ও অস্বাস্থ্য-জনক হইয়া থাকে। ফলতঃ, স্বাস্থ্যরূপ অমূল্য রত্নলাভ

করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে রন্ধনসম্বন্ধে পবিত্রতা-রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত বিধেয়।

চুল্লী (উনান)-সম্বন্ধে ঋষিরা, ব্যবস্থা দিয়াছেন :—

চুল্লী তত্র প্রকর্ত্তব্যা পূর্ব্বপশ্চিম আয়তা।

অর্থাৎ, রন্ধন-শালার পূর্ব্ব কিংবা পশ্চিম দিকে লম্বালম্বি-ভাবে উনান করিলে, পাচক বা, পাচিকার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। কারণ, দক্ষিণ দিক্ উন্মুক্ত থাকিলে, দুঃসহ গ্রীষ্মের সময় দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইয়া, শ্রান্তি-পরিহার করিয়া থাকে। আর, শীতকালে গৃহে রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে।

ভোজন ও পানার্থে কাংস্যপাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু, পাক-কার্য্যে কাঁসার পাত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যথা,—

ংস্যজে পাচিতং যদ্ধি তদ্ধিতং মদিতং শুচি।

পক্ব-দ্রব্য হিতকর, স্নিগ্ধ এবং পূত। আজ-কাল পোলাও, ন্ধনে তাম্রপাত্রের (ডেকচির) সমধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া

রন্ধনসম্বন্ধে ঋষিরা, নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

য়ে সিদ্ধং ন রুচ্যং ত্বম্লপিত্তকৃৎ।

রুচি-কর হয় না। পরন্তু, তাহাতে অম্লপিত্ত ক। এজন্য ডেকচি প্রভৃতি প্রতি মাসে দুই বার

রীরে যেটির বাহুল্য আবশ্যক।
র্নির্দ্দিষ্ট এই ধাতু

প্রথা যে, এক সময়ে যার-পর-নাই উন্নতিলাভ করিয়া- আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসমূহে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পরিলক্ষিত , দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর এবং নবনীত প্রভৃতি দেব-ভোগ্য মধ্যে-ই প্রথমে আদৃত হইয়াছিল। দুগ্ধজাত হবিঃ, যজ্ঞার্থে প্রথমে-ই বিষ্কার করিয়াছিলেন। গোভিল-গৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে :—

হবিরুচ্ছিষ্টশেষং প্রাশয়েদ্ যাবন্ত উপেতাঃ স্যুঃ। *

দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ঘৃতের অবশিষ্ট লইয়া, তত্রত্য দর্শক, পরিজন সকলকে-ই আহার করাইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, ঘৃতের বিষ্কার দ্বারা রন্ধন-বিদ্যার, অর্থাৎ কি আমিষ, কি নিরামিষ রন্ধনে এবং ঘৃত-পক্ব

* যাবন্তঃ উপেতাঃ স্যুস্তান্ সর্ব্বান্ প্রাশয়েৎ ইত্যর্থঃ।

দ্রব্যসমূহ প্রস্তুতকরণে যেরূপ উন্নতি সংসাধন করিয়াছেন, আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি, পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন সভ্যজাতি, সেরূপ উন্নতি, কল্পনা-পথে-ও আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই। বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিগণ, ঘৃতের স্থানে বসা (অর্থাৎ চর্ব্বি) ব্যবহার করিয়া, দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতেছেন! আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ঘৃতের গুণ, এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—

"ঘৃতেন উপচিতং বলম্।" "আয়ুর্ঘৃতম্।"

আর্য্যজাতি, যেমন দর্শন, বিজ্ঞান এবং গণিত প্রভৃতি নানাবিদ্যায় জগতে শিক্ষাগুরু ছিলেন, সেইরূপ রন্ধন-বিদ্যাতে-ও তাঁহারা, তদ্রূপ গুরুস্থানীয়! তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত বহুবিধ রন্ধন-প্রথা, রূপান্তরিত হইয়া, ইউরোপে প্রচলিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত, প্রদর্শিত হইতেছে :— ...য়।

ভৃজিপাকে ভবেদ্ধাতুর্যস্মাৎ পাচয়তে হ্যসৌ।—

* ভ্রস্জ [ভৃজ্জতি] ধাতুর অর্থ পাক করা। আমা...
ইংরাজী 'ফ্রাই' শব্দ, এই পাকার্থ ভ্রস্জ্ ধাতু হইতে উৎপ...
ও ইংরাজী 'ফ্রাই' শব্দের মধ্যবর্ত্তী আর...
'ফেরিজি'। 'ফেরিজি' একবিধ খা...র নাম...
প্রভৃতিকে 'ফেরিজি' বলে। 'ভৃজ্জতির' 'ভ' 'ফ'...
রূপ ধরিয়াছে মাত্র। 'ফেরিজি' অপেক্ষাকৃত আর...
হইয়াছে। একটি ভাষা হইতে ভাষান্তরে ব্য...
'ভ' যে অনেক সময়ে 'ফ' রূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা...
প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। ইংরাজী 'ফণ্ড' শব্দে...
ভারতের ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞীয় ঘৃতাদি পুঁজি করিবার আধার ভা...
হইতে আসিয়াছে। যখন পুঁজি বাড়িল, তখন তার 'ভাণ্ডে' কুলাই...
ক্রমে এই 'ভাণ্ড' শব্দ হইতে 'ভাণ্ডার' শব্দের সৃষ্টি হইল। এইরূপ...
চনা করিলে, অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূপবিদ্যাতে-ও ...
হিন্দুজাতির নিকট সম্পূর্ণ ঋণী।

যে পলান্ন ও খেচরান্ন, অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া, পৃথিবীর মধ্যে সকল সভ্যজাতির রসনায় আদর-লাভ করিয়াছে, সেই রসনা-তৃপ্তি-কর খাদ্যাদির

* আমিষ ও নিরামিষ আহার দেখ।

রন্ধনপ্রথা, হিন্দুজাতি-ই, প্রথমে উদ্ভাবন করেন। একদা ধন্বন্তরি, সুশ্রুত ঋষিকে বলিতেছেন :—

মাংসশাকবসাতৈলঘৃতমজ্জফলৌদনাঃ।
বল্যাঃ সন্তর্পণা হৃদ্যা গুরবো বৃংহয়ন্তি চ॥—চরক।

অর্থাৎ মাংস, শাক, বসা, তৈল, ঘৃত, মজ্জা এবং নানাবিধ ফলের সহিত অন্ন পাক করিলে, উহা—বল-কর, তৃপ্তি-কর, হৃদ্য, গুরুপাক এবং মাংসাদির পুষ্টিসাধক হয়। "মাংসেন উপচিতং মাংসম্"। মাংস দ্বারা মাংস অর্থাৎ পেশী-আদি পু[illegible] ও দৃঢ় হয়। ধন্বন্তরি, সুশ্রুত ঋষিকে পলান্ন বা অন্নমাংসের গুণ বা উপকারি[illegible] উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু পলান্ন-রন্ধনপ্রথা, ধন্বন্তরির যে [illegible] গর মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্দেশ করা বড়-ই [illegible] রন্ধনে আকৃনি বা আপ্যুষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্থি সিদ্ধ করিয়া, মজ্জা বাহির করিতে হয়। আর— কমলালেবু, আনারস, বাদাম, পেস্তা ও দ্রাক্ষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পলান্নের ন্যায় খেচরান্নের [illegible]। :—

[illegible]সংমিশ্রা লবণার্দ্রক-হিঙ্গুভিঃ।
সলিলে সিদ্ধাঃ কৃসরা কথিতা বুধৈঃ॥
[illegible]হৃদ্যা বল্যা গুরুপিত্তকফপ্রদা।
[illegible]দ্ধিবিষ্টম্ভমলমূত্রকরী স্মৃতা॥—ভাবপ্রকাশ।

[illegible] একত্র মিশ্রিত করিয়া, লবণ, আদা ও হিঙ্গের জলে সিদ্ধ [illegible]কে পণ্ডিতেরা, কৃসরা বা খেচরান্ন অভিহিত করিয়া থাকেন। [illegible]-পুষ্টি-কর, বল-কর, গুরু, পিত্ত ও কফ-জনক, দুর্জ্জর (সহজে যাহা পরি-[illegible]), মল-মূত্র-কর, এবং বুদ্ধিবিষ্টম্ভজনক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

[illegible]ষিগণ, ধ্যাননিমীলিতনেত্রে কেবলমাত্র যে, আধ্যাত্মিক বিষয়ের [illegible] করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা মানব-জীবন-সংরক্ষার জন্য [illegible]বিধ পুষ্টি-কর উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কার দ্বারা মর্ত্ত্যলোকের প্রভূত শ্রেয়ঃসাধন করিয়া গিয়াছেন। নানাবিধ দ্রব্য পরীক্ষা দ্বারা, মানবদেহ-রক্ষার জন্য, যে সকল পদার্থ আহার করিলে, শারীরিক বল, বর্ণ

ও তেজের বৃদ্ধি হয়, তাঁহারা, তৎসমুদয়-রন্ধনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। প্রাচীন অগ্নিকুল হইতে আয়ুর্ব্বেদ ও সূপশাস্ত্রের প্রথম প্রচার হয়। এই অগ্নিকুলে ভৃগুমুনির ঔরসে খ্যাতনামা চ্যবন মুনি আবির্ভূত হন। এই চ্যবন মুনি-ই, 'চ্যবনপ্রাশ' ঔষধ বা পথ্য আবিষ্কার করিয়া, অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই অগ্নিকুল-ই, সর্ব্বপ্রথমে মানবজাতির খাদ্যার্থে মৎস্য-ব্যবহারের আদেশ প্রদান করেন। মহাভারতীয় বনপর্ব্বের বিংশত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

মৎস্যাস্তস্য সমাচখ্যুঃ ক্রুদ্ধস্তানগ্নিরব্রবীৎ।
ভক্ষ্যা বৈ বিবিধৈর্ভাবৈর্ভবিষ্যথ শরীরিণাম্॥

অর্থাৎ, অগ্নি ক্রোধপরবশ হইয়া বলিলেন, মৎস্য... মানবগণের ভক্ষ্য হইবে। অনন্তর, নানা উপায়ে... জাতির মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।*

পাক-বিজ্ঞানের আলোচনা করিলে, পরিদৃষ্ট... করিয়ে, শারীরিক ও মানসিক প্রভূত উপকা... তৎসমুদয়ের-ই রন্ধনে ব্যবস্থা দিয়াছেন... অরিষ্ট সংঘটিত হয়, সেগুলির রন্ধন নিষিদ্ধ হই... পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকমণ্ডলী, ঋষি-প্রদত্ত এই... প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, ইউরোপীয়দিগের... উঠিতেছেন। শাস্ত্রের শাসন, একটু যত্ন করিয়া বু... নির্ব্বোধ লোকে মনে করে, খাবার সামগ্রী খাইল... রোগ হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে আবার কি দোষ... সর্ব্বভুক্ ইউরোপীয়দিগের মধ্যে একটি কিংবদন্তী আছে যে, 'যাহা মুখে... যায়, তাহাতে পাপ হয় না, যাহা মুখ হইতে বাহির হই... (গালি... বাক্যাদি), তাহাতে-ই পাপ হইতে পারে।' এটি প্রকৃত কথা নয়... ন্যায় স্বল্পদর্শীর কথা। অন্নদোষ হইতে রোগ ছাড়া অতি গুরু... ঘটিতে পারে। আহারের দোষ-গুণে মনুষ্যের স্বভাবের পরিবর্ত্ত ঘটিয়া থাকে

* মৎপ্রণীত পাক-প্রণালী ও মিষ্টান্ন-পাক নামক গ্রন্থদ্বয়ে হিন্দুজাতির রন্ধনপ্রথা, বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে।

প্রত্যুত, শরীরযন্ত্রে পাক-ক্রিয়া দ্বারা মথিত হইয়া-ই, যখন অন্তঃকরণাদি, সংগঠিত হয়, তখন আহার্য্যের গুণ যে, অন্তঃকরণবৃত্তিতে সংক্রামিত হইবে, ইহা, স্বতঃ-সিদ্ধ। আহারের দোষ-গুণ, এক পুরুষ হইতে তৎপরবর্ত্তী পুরুষে-ও সংক্রামিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদর্শি শাস্ত্র, এই দোষ সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া, সত্ত্বগুণ-বিরোধি কতকগুলি দ্রব্যের পান-ভোজন, দ্বিজাতির পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন,—

লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনাম্ অমেধ্যপ্রভবানি চ॥

, গাজর, পিয়াজ এবং ছত্রাক আর অমেধ্য (যথা বিষ্ঠাদি)-দ্বিজাতির অভক্ষ্য। এইগুলি, হিন্দুর রন্ধনে অব্যবহার্য্য। এত-
ট দ্রব্যের নিষেধ আছে। প্রসবের পর দশদিনের মধ্যে
মেষীর, মহিষীর, ছাগীর এবং বৃষস্যন্তী (বৃষের জন্য
মৃতবৎসা অথবা দূরস্থবৎসা গাভীর দুগ্ধ খাইতে নাই।
পথ্যের বিচার আছে। আর, আহারের সাত্ত্বিকতা-
রণ, তাদৃশ গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ পান করা, সাক্ষাৎ-
মপকর্ষ-সাধক। সেই প্রকার দুগ্ধ গ্রহণ করা,
র প্রতি নৃশংসতা-ব্যঞ্জক।
াবতীয় বস্তুর ভক্ষণ নিষিদ্ধ। বিকৃতিপ্রাপ্ত দ্রব্য
বাধক এবং তমোগুণের বর্দ্ধক হয়। এইজন্য, দধি
, সর্ব্বপ্রকার শুক্ত-ই অভক্ষ্য। যে মধুর-রস দ্রব্য
াহাকে শুক্ত বলে। যথা—সির্কা, ভিনিগার, কাঞ্জিকা
ফল, কন্দ প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত শুক্ত, যদি মত্ততাজনক
-হ ভক্ষ

উল্লিখিত হইয়াছে যে, হিন্দুজাতির রন্ধনে পবিত্রতা-সংরক্ষণার্থ নুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু পক্ক-দ্রব্য আহার করিবার হইবার পক্ষে সর্ব্বদর্শী ঋষিগণ, কিরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা, একবার ... উচিত। তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

ভুক্ত্বাচামেদ্ যথোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ।
শোধয়েৎ মুখহস্তৌ চ মৃদদ্ভির্ঘর্ষণৈরপি॥

অর্থাৎ, ভোজনাবসানে বিধিপূর্ব্বক আচমন করিবে *। প্রয়োজনবোধ হইলে, মুখ এবং হস্ত, মৃত্তিকা ও জল দ্বারা ঘর্ষণপূর্ব্বক শোধন করিবে। সাক্ষাৎসম্বন্ধে মুখের ও হস্তের এবং পরম্পরাসম্বন্ধে মনের পবিত্রতা-রক্ষার নিমিত্ত এইরূপ বিধান হইয়াছে। আজ-কাল পোলাও ও কালিয়াদি-ভোজনান্তে মৃত্তিকার স্থানে সাবান ও বেসম্ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু, আচমন দ্বারা শুচি হইলে-ই যে, শুচিতা সম্পাদিত হয়, তাহা নহে গৃহের মধ্যে যে উচ্ছিষ্ট পাত্র পড়িয়া থাকিবে, শাস্ত্র, তাহা নিষেধ ক[illegible]ছেন,—

আচান্তোঽপ্যশুচিস্তাবৎ যাবৎ পাত্রমনুদ্ধৃতম্।
উদ্ধৃত্যাপ্যশুচিস্তাবৎ যাবন্নোচ্ছিষ্টমার্জ্জনম্॥

অর্থাৎ, আচমন-সমাপন হইলে-ও, ভোজন-পা[illegible] ততক্ষণ সম্যক্ শুচিতা জন্মে না। আর, ভোজনপাত্রে উচ্ছিষ্টের মার্জ্জনা না হয়, ততক্ষণ শুচিতা জন্মে না। নিবন্ধন, গৃহস্থের ঘরে সগড়ী ব্যাড় ব্যাড় করিতে[illegible] যায়, অমন-ই লোকে, পাত্র উঠাইয়া ফেলে এব[illegible] তজ্জন্য দুর্গন্ধ হয় না। কাকে, কুকুরে, বিড়ালে,[illegible] পায় না। আজ-কাল অনেক বাড়ীতে রা[illegible] মার্জ্জিত হয়। উহা অহিন্দুর ব্যবহার। ফলতঃ, কি রন্ধন-প্রথা, কি পবিত্রতা-সংরক্ষণ—এই সকল[illegible] উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের[illegible] মুখী ছিল। তাঁহারা স্বদেশের এবং অধিবাসিবর্গের [illegible] খাদ্যাখাদ্য ও পাকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এ[illegible] ব্যবস্থা[illegible] মহোপকারিণী, তাহা, সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক[illegible]তে হইবে।

* আচারপ্রবন্ধ দেখ।

বিবিধ-রন্ধন।

মাছের দেলখোস।

...মাছটি উত্তমরূপে কুটিয়া বাছিয়া লও; অনন্তর, শুক্‌না নেকড়ায় ভাল করিয়া পুঁছিয়া ফেল। এরূপ করিয়া পুঁছিবে, যেন মাছের গায়ে আদৌ জল না ...এখন মুড়র সহিত লেজাটি বাঁধিয়া দাও। ...ডিমের তরলাংশে পরিমাণ-মত লবণ, ...বাটা মিশাইয়া, উহা মাছের সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া ...তার সহিত অল্প পরিমাণে ময়দা মিশাইয়া, তাহা ...মাখাইয়া... ...তৈল জ্বালে চড়াও। উহা পাকিয়া ...ভাজিয়া লও। দেলখোস গরম গরম অত্যন্ত মুখ- ...প্রকার মৎস্য দ্বারা দেলখোস পাক করা যাইতে ...নার চাট্‌নি মাখাইয়া-ও এই ভাজা মাছ আহার

মাছের সব্‌জী পাক।

মাছের আঁইস ছাড়াইয়া উত্তমরূপে বাছিয়া লইবে। আর, এরূপ-ভাবে পেট চিরিবে, যেন ভিতরের সমস্ত ময়লা বাহির হইতে পারে। ফলতঃ, প্রয়োজনের অধিক পেট চিরিবে না। এখন কাপড় দিয়া মাছটি এমন করিয়া

পুঁছিবে, যেন তাহাতে এক বিন্দু জল না থাকে। অনন্তর, এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত মাছটি কোন স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিবে। এরূপ করিয়া রাখিবার কারণ এই যে, বাতাস লাগিয়া, উহা বেশ শুকাইয়া যাইবে।

এখন পরিমাণ মত বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্ এবং আলু-সিদ্ধ এক সঙ্গে মিশাইবে। এই মিশ্রিত পদার্থে লবণ ও গরম মসলার গুঁড়া মিশাইয়া, মাছের পেটের ভিতর পূরিয়া সেলাই করিয়া দিবে।

এদিকে মাছের পরিমাণ অনুসারে ডিমের তরলাংশে লবণ ও [illegible]লার মিশাইয়া, তাহা মাছের গায়ে মাখাইবে। অনন্তর, বিস্কুটের গুঁড়[illegible] ছড়াইয়া দিবে। বিস্কুটের গুঁড়া অত্যন্ত পরিষ্কৃত ও খিচ[illegible]শূন্য গুঁড়া মাখান হইলে, পুনর্ব্বার উহা ডিমের [illegible] গুঁড়া মাখাইবে। এখন উত্তম ঘৃত আস্তে আস্তে মাখাইয়া, প্রশস্ত পাক-পাত্রে চড়াইয়া, তাহা মৃদু ভাজিবার সময়, প্রয়োজন বুঝিয়া, মধ্যে মধ্যে [illegible] উত্তমরূপ ভাজা হইলে, তাহা নামাইয়া লই[illegible] যে, যেন মাছের গায়ে ঘৃত না গড়াই[illegible] অভাবে পালংশাকের রস মাখাইয়া লইলে, মাছটা[illegible] মাছের সব্‌জী পাক, গরম গরম অ[illegible] সুখাদ্য। [illegible] ন্যায় বড় বড় মাছে বিলাতে সব্‌জী পাক [illegible] ক্ষুদ্র আকারের মাছে-ও উহা পাক ক[illegible]

চাটনিদার কাঁ[illegible]

ফুটন্ত জলে লবণ মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে [illegible] করিলে, উহা উত্তমরূপ সুসিদ্ধ হয়। মাঝা[illegible] আব হইলে, পনর হইতে কুড়ি মিনিট এবং বড় হইলে, ত্রিশ হইতে পর্য্যন্ত জ্বালে রাখিলে-ই যথেষ্ট। সাড়ে তিন সের জলে আড়াই [illegible]ক লবণ মিশাইতে হয়।

* একপ্রকার বিলাতি শাক। কলিকাতার মিউনিসিপাল বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে।

এইরূপ সুসিদ্ধ কাঁকড়ার দাঁড়াগুলি, উপর দিকে উঁচু করিয়া, একত্রিত কর এবং হাতার একটি ঘা দিয়া, দাঁড়া না ভাঙ্গে, এরূপে কাঁকড়াটি ফাটাইয়া লও। উহা আবার এরূপ নিয়মে ফাটাইবে যেন, খোলা খুলিয়া না পড়ে। অনন্তর, একখানি ধারাল ছুরী দ্বারা, কাঁকড়ার তলার দিক্‌টা দিয়া, সাবধানে ভিতরের শাঁস বাহির করিয়া লও। এখন এই শাঁসে হয় পুদিনার অথবা অন্য কোন ...কার চাট্‌নি মিশাইয়া, তাহা আবার খোলার মধ্যে পূরিয়া দাও। এইরূপে ... পূরা ...লে, ময়দা দ্বারা চেরা-মুখ আঁটিয়া দিয়া, আস্ত কাঁকড়াটি ঘৃত ... লও। পরিবেষণ-কালে ভোক্তাদিগের পাত্রে এক একটি

—

...ানসিয়ান ফ্রিটার্স।

...রিমাণ।—চাউল দেড় ছটাক, দুগ্ধ দেড় পোয়া, ... কিস্‌মিস্‌ দেড় ছটাক, চারিটি আপেল-...কুরণ, ডিম চারিটি, ভাজিতে পাঁচ সাত

...প... বাছিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লও। শুষ্ক ...। মৃদু জ্বালে যে, পাক করিতে হয়, ...ঘন ঘন নাড়িয়া দাও। যখন দেখিবে, সিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহাতে মাখন ও চিনি ঢালিয়া ...য় উহাতে সামান্য পরিমাণ লবণ মিশাইতে-ও না দি... বিশেষ ক্ষতি হয় না। যখন দেখিবে, জ্বালে উহা ...হইয়াছে, তখন উনান হইতে পাক-পাত্রটি নামাইবে; এবং ঠাণ্ডা হইলে, তাহাতে কিস্‌মিস্‌, আপেল-কুরা, ময়দা এবং ...ন (উত্তমরূপ ফেনাইয়া) মিশাইবে। এখন এই মিশ্রিত পদার্থ ...ওমরূপে ...কাইয়া, ছোট ছোট আকারে এক একটি বড়া ভাজিয়া লইবে। খাঁটি মাখন কিংবা ঘৃতে যে ভাজিতে হয়, আর ভাজিবার সময় যে, দুই পিঠ উল্টাইয়া দিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। বড়াগুলি ভাজা হইলে, এক-

থানি পাত্রে সাজাইয়া, তাহার উপর অল্প পরিমাণে চিনি ছড়াইয়া দিতে হয়। ইচ্ছা হইলে, দুগ্ধে পাক করিবার সময়, তাহাতে গন্ধ-মসলার গুঁড়া দিতে পার। ভিনিসিয়ান ফ্রিটার্স উত্তম সুখাদ্য। ইয়ুরোপে এই খাদ্যের বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

আপেল, পিচ অথবা কমলালেবুর ফ্রিটার্স

পূর্ব্বে যেরূপ ডিমের গোলা প্রস্তুত করি ার নি সেইরূপ গোলা প্রস্তুত কর; আপেল বা ের খোসা য়। চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রাখ, এবং এক মাখন বা ঘৃতে ভাজিয়া লও। ভাজা হইলে, এবং ঠাণ্ডা হইলে, তুলিয়া আহার কর।

লেবুর ফ্রিটার্স প্রস্তুত করিতে হ কোয়ার গায়ে সাদা সাদা সূতার মত যা এই সঙ্গে বিচিগুলি-ও যত্নের সহিত বাছিয়া এক একটি কোয়া গোলায় ডুবাইয়া ভাজিয়া ডুবাইয়া রাখ। ঠাণ্ডা হইলে আহার করিয়া

ফ্রিটার্স, অন্যান্য ফলে-ও প্রস্তুত বিভিন্ন-প্রকার হইয়া থাকে। চিনির র হইতে বিন্দু গোলাপী আতর মিশাইলে, আহারের সময় ে

ডিমের প্যান্ কেক্স্।

ফ্রিটার্স প্রস্তুত করিতে হইলে, যেরূপ গোলার প্র রূপ গোলা গুলিয়া, তাহাতে দুই একটি (পরিমাণ বুঝিয়া) েউর্মের ভ লাংশ কিংবা অল্প পরিমাণে দুগ্ধ মিশাইয়া, গোলা একটু পাতলা করিয়া লইতে হয়। গোলা প্রস্তুত হইলে, একখানি চাটু উনানে বসাইয়া, গরম করিতে

দাও। অনন্তর, সমুদায় চাটুখানিতে মাখন কিংবা ঘৃত মাখাইয়া লও। এখন পূর্ব্ব-প্রস্তুত গোলা, উহাতে এরূপ করিয়া ঢালিয়া দিবে, যেন ঠিক চাটুর আকারে হয়। এই খাদ্য দ্রব্য যত পাতলা হয়, তত-ই ভাল। জ্বালের অবস্থায় উহা প্রায়-ই উল্টাইয়া দিতে হয় না; কিন্তু যদি উল্টাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন য়, তবে এরূপ নিপুণতার সহিত উল্টাইয়া দিবে, যেন উহা ছিঁড়িয়া না এইরূপে যতগুলি ইচ্ছা, ভাজিয়া লইতে পার। একখানির পর র এক[illegible] সাজাইয়া রাখিবার সময়, প্রত্যেকটির উপর চিনি ছড়াইয়া ব[illegible] [illegible]সমিস, পেস্তা ও চিনি ইত্যাদির পুর দিয়া, পাটিসাপ্টার াইয়া রাখ*। দুগ্ধ ও ডিমের পরিমাণ অধিক করিয়া, া দিলে [illegible] পিষ্টক উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার, [illegible] এলাচ ও দারুচিনির গুঁড়া অথবা গোলাপী [illegible]স আর-ও উপাদেয় হয়। জল-খাবারে উহা ব্যবহার ইহা অত্যন্ত পুষ্টি-কর খাদ্য। যাঁহাদের ডিম ব্যবহারে [illegible]সে-ই এই পুষ্টি-কর সুমধুর খাদ্য আহার

ইংলিশ অম্‌লেট্।

[illegible] —ডিম পাঁচটি, মাখন বা ঘৃত এক ছটাক, [illegible]জিবার সময় পাঁচ ছয় মিনিট।

[illegible]লেট্ প্রস্তুত করিতে হইলে, পাঁচটি ডিমের তরলাংশ [illegible] পক্ষে টাট্‌কা ডিম-ই প্রশস্ত। এক একটি পাত্রে, [illegible]খিবে। যে পাত্রের ডিম খারাপ বোধ হইবে, অর্থাৎ ফেলিয়া দিবে। এখন, সমুদয় ডিমের তরলাংশ এক সঙ্গে [illegible]ত ডিমে, পরিমাণ মত লবণ ও মরীচের গুঁড়া দিয়া, একবার

একখানি তৈ কিংবা চাটু উনানে চড়াও; এবং তাহাতে মাখন কিংবা ঘৃত পাকাইয়া লও। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে ডিমের সমুদয়

* মৎপ্রণীত "মিষ্টান্ন-পাক" নামক পুস্তকে পাটিসাপ্টা প্রস্তুতের নিয়ম দেখ।

গোলা একবারে ঢালিয়া দাও। যখন দেখিবে, উহা বেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে, অথচ শক্ত হইয়াছে, তখন তাহা খুন্তি করিয়া তুলিয়া, একখানি গরম পাত্রে, ইচ্ছামত ভাঁজ করিয়া তুলিয়া রাখিবে। অম্‌লেট গরম গরম অত্যন্ত সুখাদ্য। এজন্য ভোক্তা আহার করিতে বসিলে, উহা ভাজিতে আরম্ভ করিবে। এই খাদ্য অত্যন্ত পুষ্টি-কর ও বল-বর্দ্ধক।

রসনা-বল্লভ

উপকরণ ও পরিমাণ।- ডিম তিনটি, ময়দা বড় দেড় ছটাক হইতে তিন ছটাক পর্য্যন্ত।

ডিম কয়েকটি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভা[illegible] তাহাতে দুধ মিশাও। এখন, ডিম-ছাঁকা সরু চ[illegible] অনন্তর, তাহাতে ক্রমে ক্রমে ময়দা মিশাইতে থাক। মিশাইলে, যদি ময়দা তরলাংশের [illegible] পাকের উপযোগী হইবে না। অতএব, তাহা যেন গাঢ় গোছের হয়। এখন উহা উত্তম তাহা, বড়া-ভাজার ন্যায়, ঘৃত কিংবা তৈলে ভাজি[illegible] কেহ উহা আবার চিনির সহিত আহার ক[illegible] করা-ই সুব্যবস্থা।

—— হইতে

ডিমের কারি

আটটি ডিম সিদ্ধ করিয়া, পৃথক্ পাত্রে খোলা ছাড়াইয়া, ডিমগুলি কাটিয়া, টুকরা টুকরা কর পাত্রে দেড় ছটাক ঘৃত, মাঝারি চামচের চারি চামচ কারি-পাউডার মত লবণ, এক সঙ্গে মিশাইয়া জ্বালে চড়াও। ঘৃত পাকিয়া আসিলে, [illegible] জের কুঁচি ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে থাক। পিঁয়াজগুলি আধ-ভাজা হইলে, তাহাতে আধ পোয়া আখ্‌নি সূপ ঢালিয়া দাও; বলক না উঠা পর্য্যন্ত মৃদু জ্বাল দিতে আরম্ভ কর। জ্বালে ঝোল ঘন হইয়া আসিলে, তাহাতে ডিমের টুকরা বা খণ্ডগুলি

ঢালিয়া দাও। দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, পাক-পাত্র উনান হইতে নামাইয়া রাখ। ডিম দেওয়ার পর অধিকক্ষণ ফুটাইবে না।

অসমর্থের পক্ষে, ঘৃতের পরিবর্ত্তে তৈল দ্বারা পাক করিলে চলিতে পারে। আর, কারি-পাউডার সংগ্রহ না হইলে, জিরামরীচ, ধনে, হরিদ্রা, লঙ্কা, তেজপত্র এবং গরম মসলা-সংযোগে রন্ধন হইতে পারে।

অম্‌লেট্‌ স্থফলে।

রিমাণ।—ডিম ছয়টি, চিনি (মাঝারি) চারি চামচ, গুঁড়া, মাখন আধ পোয়া, ভাজিতে পাঁচ হইতে ছয়

পাত্রে ভাঙ্গিয়া রাখ; আবার প্রত্যেক ডিমের পৃথক্ পাত্রে রাখিয়া দাও। ডিম ভাঙ্গিয়া, পৃথক্ এই ভাল ডিমের সহিত কোন প্রকারে যায়, তবে সমুদয় ডিম নষ্ট হইয়া যাইবে। স্তত করিলে, তাহা নিশ্চয়-ই অরুচি- এখন, হরিদ্রাংশগুলি এক সঙ্গে মিশাও। অনন্তর, সকল মিশাইয়া, উত্তমরূপে ফেটাইয়া লও। বহার করিলে, তাহা আহারে উপাদেয় এক সঙ্গে মিশ্রিত কর।

ধ পোয়া খাঁটি মাখন জ্বালে চড়াও; যখন দেখিবে, তাহাতে ডিমের তরলাংশ ঢালিয়া দাও। এরূপ দিবে যেন, পাক-পাত্রের মাপে সমান গোলাকৃতি হয়। যখন দিক্ ভাজা হইয়াছে, তখন অপর একখানি পাক-পাত্রে অল্প মাখন উনানের আঁচে বসাইবে, এবং তাহাতে ভাজা ডিম উল্টাইয়া ভাজিতে এক মিনিটের মধ্যে ভাজা শেষ হইবে। পাক-পাত্রে প্রথমে ডিম ঢালিয়া ফাঁপিয়া অর্থাৎ উপচিয়া পড়িবার মত হয়, তবে তাহাতে অল্প পরিমাণে চিনি ফেলিয়া দিবে, আর উথলিয়া উঠিবে না।

অম্‌লেট স্থফলে, উত্তম সুখাদ্য এবং অত্যন্ত পুষ্টি-কর। এজন্য বিলাত অঞ্চলে

এই খাদ্যের বিশেষ আদর। ডিম যে, যার-পর-নাই বল-কর খাদ্য, ইহা সকলে-ই স্বীকার করিয়া থাকেন; অতএব, এরূপ সহজ-প্রাপ্য খাদ্য দেশ-মধ্যে প্রচলিত হইলে, বিশেষরূপ উপকার হইবার কথা। মাখন, ঘৃত কিংবা তৈল দ্বারা-ও অম্‌লেট্ সুফলে পাক করা যাইতে পারে। তৈ বা তাওয়া, অম্‌লেট্ পাকের পক্ষে প্রশস্ত।

অন্নের ক্রুকেট্।

উপকরণ ও পরিমাণ।—আতপ চাউল [illegible]া ছটাক, দুগ্ধ তিন পোয়া, ছয়টি বাদামের [illegible]ড়া, ডিম [illegible]নটি লেবুর খোলা, মাখন বা ঘৃত এক [illegible] এক ঘণ্টা।

প্রথমে চাউলগুলি কাপড়ে উত্তমরূপ ঘসিয়া ঝাড়িয়া, দুগ্ধ-সহ একটি পাক-পাত্র জ্বালে চড়াই[illegible] লেবুর খোলা ফেলিয়া দিবে। মৃদু আঁচে [illegible] মনে থাকে। কারণ, জ্বাল অধিক [illegible], [illegible] জ্বালের অবস্থায়, মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে সিদ্ধ হইয়াছে, সেই সময় তাহাতে [illegible] সুসিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত মৃদু জ্বাল দিতে থাকি[illegible]

অনন্তর, চাউলগুলি সুসিদ্ধ ও গাঢ় [illegible] ইয়া, সিদ্ধ চাউল পৃথক্ পাত্রে ঢালিয়া রাখিবে; এবং চট্‌কাইয়া, ছোট ছোট এক একটি গোলাকৃতি [illegible] প্রস্তুত হইলে, ডিমের তরলাংশে ডুবাইয়া, তাহার [illegible] পর বি[illegible] ইবে। এখন, এই গোলকগুলি, খাঁটি মাখন কিংবা ঘৃতে ভা[illegible]িয়া লই[illegible] রূপ ভাজা হইলে, ঝাঝরি-হাতা করিয়া তুলিয়া, ঘৃত ঝাড়িয়া লইবে। আবার, ভাজার পর, ব্লটিং কাগজের উপর রাখিয়া, ধীরে ধীরে চা[illegible] লইয়া থাকেন। ক্রুকেট্ মাত্রে-ই গরম গরম উত্তম সুখাদ্য। লিখিত নিয়মে চিড় দ্বারা-ও উত্তম ক্রুকেট্ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভাগ গুরু, স্ত্রী জাতীয় প্রাণীর অধোভাগ গুরু। পক্ষি-জাতির বক্ষ ও গ্রীবা অতিশয় গুরু। পক্ষীরা উর্দ্ধে পক্ষ বিক্ষেপ করে বলিয়া, ইহাদিগের মধ্য ভাগ সমান। ফল-ভোজী বিহঙ্গদিগের মাংস অতিশয় রুক্ষ। মাংসাশী পক্ষীদিগের মাংস অতিশয় বর্দ্ধন-কর। মৎস্য-ভোজী পক্ষিদিগের মাংস পিত্ত-বৃদ্ধি-কর; এবং ধান্য-ভোজী পক্ষিদিগের মাংস বাত-নাশক।

আরনট-কারি।

বাঁধা কপি কুচি কুচি করিয়া কুটিয়া রাখ। বড় আলু, পাতলা পাতলা আকারে কুটিয়া, কপির সহিত মিশাও

এদিকে, একটি লেবুর রস, ছোট চ[illegible] আধ [illegible] বড় এক চামচ কারি-পাউডার * এক সঙ্গে মিশা[illegible] মাপ জায়ফলের গুঁড়া, এক ছটাক ঘৃত, দুই পোয়া আপ্যূষ বা আখ্নি একটি পা[illegible] উত্তমরূপ ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে পূর্ব্ব-র[illegible] গুলি ঢালিয়া দাও। এই সঙ্গে ভাজা মাছ [illegible] ফুটিবার সময় যে, পরিমাণ-মত লবণ দিতে হয়। [illegible] তরকারি বেশ সুসিদ্ধ হইলে, নামাইয়া রাখ[illegible] মাখনে লবঙ্গ ও তেজপাত ফোড়ন দিয়া[illegible]

বেঙ্গল কারি

প্রথমে, বড় পিঁয়াজ তিনটি ও এ[illegible] রাখিবে। অনন্তর, এক চামচ হরিদ্রা-গুঁড়া, এক চামচ আদা[illegible] লবণ এবং এক চামচ লঙ্কার গুঁড়া, পিঁয়াজ-বাটার সহিত এক[illegible]

এ দিকে, তিনটি পিঁয়াজ, সরু সরু করিয়া, এক ছটাক [illegible] মাখন কিংবা ঘৃতে ভাজিয়া, পাত্রান্তরে তুলিয়া রাখিবে। এখন [illegible] মিশ্রিত পিঁয়াজ-বাটা ভাজিতে থাক; একটু লাল্‌ছে ধরণের হইলে, তাহাতে

* অন্যান্য প্রকার কারি-পাউডার প্রস্তুত করিবার নিয়ম নূতন সংস্করণ "পাক-প্রণালীতে" লিখিত হইয়াছে।

কিয়ৎপরিমাণে মাংসের আখনি ঢালিয়া দিবে। অন্ততঃ দশ মিনিট জ্বালে থাকার পর, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। এইরূপ নাড়া চাড়ার পর, ভাজা পিয়াজগুলি তাহাতে ঢালিয়া দিবে। অনন্তর, তাহাতে তিন পোয়া মাংস ঢালিয়া দিয়া, একবার উত্তমরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। এই কারিতে যে মাংস পাক করিবে, তাহাতে যেন হাড় কিংবা চর্ব্বি ...কে। ফলতঃ, বেঙ্গল কারির পক্ষে মেষ-মাংস (মটন্) হইলে-ই ভাল ... পাক-পাত্রে মাংস ঢালিয়া দেওয়ার পর, পুনর্ব্বার তিন পোয়া আখ্‌নির জল ... এখন মৃদু জ্বালে মাংস সিদ্ধ হইতে থাকিবে। এক ঘণ্টার ... না হইলে জ্বাল হইতে নামাইবে না। যখন দেখিবে, মাংস ... হইতে নামাইবে।

ড্রাই-কারি।

...সের ভাল মটন কুটিয়া লও *। মাংস ... পুরু হয়। মাংস কুটা হইলে, ... এক ছোট চামচ ময়দা, এক ছোট চামচ লবণ ... সকল ... দিলে, মাংসের রং বেশ ঘোরাল ... চামচ মসলার গুঁড়া দিলে-ই চলিবে।

... ঘৃত ঢালিয়া দিয়া, জ্বালে চড়াইবে। ...রে, মাখন বা ঘৃতের পরিমাণ স্থির করিবে। ঘৃত ... ঢালিয়া দিবে; এবং ঘন ঘন নাড়িতে চাড়িতে ... দেখিবে, মাংস উত্তমরূপ ভাজা হইয়াছে, তখন তাহা অন্য পাত্রে ... রাখিবে। এখন, উনান-স্থিত পাক-পাত্রে সামান্য পরিমাণে ঘৃত দিয়া ... তিনটি পিয়াজ-বাটা ভাজিতে থাকিবে; উহা ভাজা হইলে, তাহাতে এক পোয়া আখ্‌নি সূপ অথবা গরম জল ঢালিয়া দিয়া, পূর্ব্ব-রক্ষিত ভাজা-মাংস ঢালিয়া দিবে। এখন, একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। এক ঘণ্টা জ্বালে থাকিলে, মাংস বেশ

* মটনের অভাবে কচি ছাগ-মাংস লইতে পার।

সুসিদ্ধ হইবে। যদি সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে-ই জল মরিয়া যায়, তবে প্রয়োজন-মত আখ্‌নি কিংবা গরম জল মিশাইবে। এই রন্ধনে আদৌ ঝোল থাকিবে না, চচ্চড়ি গোছের হইবে। ড্রাই-কারি বহুমূত্র-গ্রস্ত রোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী ; কিন্তু রোগীর জন্য ঘৃতের পরিমাণ অল্প করিয়া রাঁধিতে হয়।

মাংসের ফ্রিটার্স।

মাংসের ফ্রিটার্স, অত্যন্ত মুখ-রোচক খা[illegible]। অতি সহজ। আধ সের পরিমিত মাংসের কিমার সহি[illegible], গুঁড়া মিশাও ; এখন, দুইটি ডিমের তরল[illegible] বেশ সহিত চট্‌কাও। এই সময়, পরিমাণ-মত ল[illegible] এবং পাতি কিংবা কাগজি লেবুর রস উহাতে মাখাইয়া, ঘৃতে ভাজিয়া লও। ফ্রিটার্স গরম গ[illegible] অত্যন্ত সুখাদ্য [illegible]বার সময় উহা ভাজিয়া, পরিবেষণ করি[illegible]

আলুর ফ্রিটা[illegible]

[illegible]পকরণ ও পরিমাণ।[illegible] ছটাক, চিনি তিন ছটাক, পাঁচটি ডিমের [illegible] অল্প গন্ধ-দ্রব্য।

প্রথমে আস্ত আলু সিদ্ধ কর। সুসিদ্ধ [illegible] উত্তমরূপে চট্‌কাও। এখন, তাহাতে সমুদয় [illegible]

এদিকে, একখানি কলাই-করা ডিসে, অল্প মাখন [illegible]খাইয়া [illegible] ঢালিয়া দিয়া, আগুনের মৃদু আঁচে বসাও। তিন কোয়াটার [illegible] জমিয়া আসিবে। এখন, আঁচ হইতে নামাইয়া, তাহার উপর [illegible] চিনি ছড়াইয়া দাও। অনন্তর, তাহা বরফির আকারে কাটিয়া আহার কর।

প্রকারান্তর।—ডাল মাখন জ্বালে চড়াইয়া দাও ; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে পূর্ব্ব-প্রস্তুত খণ্ডগুলি দুই পিঠ ভাজিয়া লও, আলুর ফ্রিটার্স

* আলু বলিলে, গোল আলু-বুঝিতে হইবে।

প্রস্তত হইল। গন্ধযুক্ত ফ্রিটার্স প্রস্তত করিতে হইলে, উহাতে কমলা লেবুর খোসার গুঁড়া কিংবা দুই এক ফোটা লেবুর আরক অথবা গোলাপী আতর দিলে চলিতে পারে। এই ফ্রিটার্স উত্তম সুখাদ্য।

কাবাব আকবরী।

এই কাবাব অত্যন্ত মুখ-প্রিয়। আকবর বাদসাহ সর্ব্বদা ইহা খাইতেন। কাবাব আকবরী অম্ল, মিষ্ট এবং ঝাল আস্বাদন-বিশিষ্ট এক-ই খাদ্যে তিন প্রকার আস্বাদ পাওয়া যায়, এজন্য এই রূপ আদর।

ছাগ এবং পক্ষীর মাংসে প্রস্তুত হইতে পারে। করিতে হয়। কিমার মাংস এরূপ করিয়া থুরিতে হয়। কিমা প্রস্তুত হইলে, উহার পরিমাণ বুঝিয়া, ঘৃত পাকিয়া আসিলে, তাহাতে দিয়া নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে, তাহাতে কিমা ঢালিয়া দিয়া, আবার নাড়িতে কিমার পরিমাণ বুঝিয়া, তাহাতে লবণ ও জল দিবে। সকল জল মরিয়া আসিবে। জল মরিয়া, মাইয়া রাখিবে।

এবং ধনে, মেতি, সুল্‌ফা ও পুদিনা বাটিয়া রাখিবে। এখন, রাঁধা কিমার মাংস হইতে, লইয়া, পৃথক্ পৃথক্ বাটা শাকাদিতে চটকাইয়া রাখিবে। এইরূপ আবার, কিছু কিমাতে চিনি, আলুবুখারা কিংবা তেঁতুল-গোলা মাখিয়া রাখিবে।

এখন অবশিষ্ট কিমা উত্তমরূপ চটকাইতে থাকিবে। উত্তমরূপ মোলায়েম হইলে, তদ্দ্বারা এক একটি লেচি কাটিবে। এবং প্রত্যেক লেচির ভিতর পূর্ব্ব-প্রস্তত পুর দিয়া, গোল করিয়া পাকাইয়া রাখিবে। এইরূপে সমুদয় প্রস্তত হইলে, ডিমের তরলাংশে এক একটি ডুবাইয়া তুলিয়া, বিস্কুটের গুঁড়া মাখাইয়া, ভাল ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, কাবাব আকবরী প্রস্তত হইল। এই কাবাব সমধিক

সুস্বাদু করিতে হইলে, কিমা ভাজিবার সময় তাহাতে আদা, পিয়াজ, ধনে-বাটা দিয়া ভাজিতে হয়। কাবাব মাত্রে-ই যে, গরম গরম রসনায় অত্যন্ত উপাদেয়, তাহা যেন মনে থাকে। পিয়াজ খাইতে আপত্তি থাকিলে, উহা পরিত্যাগ-ও করিতে পারা যায়।

মাংসের ন্যায়, পাকা মাছের কিমাতে-ও কাবাব আকবরী প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে প্রস্তুত করিলে, যে, আস্বাদ ভিন্নরূপ হইয়া থাকে, তাহা সকলে-ই বুঝিতে পারেন।

মাটা-তোলা দুধ।

দুগ্ধ খাদ্য, পথ্য এবং ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে [illegible] কাল হইতে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে দুগ্ধের গুণাগুণ [illegible] হইয়া [illegible] নাই উপকার সাধিত হইয়াছে। শোথ, যকৃৎ, প্রভৃ[illegible] কোন্ রোগ হইতে শোথ হইলে, দুগ্ধ-ই একমাত্র পথ্য থাকে। রুষিয়ার সুবিখ্যাত ডাক্তার ক[illegible] দুগ্ধ পথ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে উপ[illegible] কিন সাহেব, প্রস্রাবের পীড়ায় অর্থাৎ বহুমূত্র-রো[illegible] বিলাতের ডাক্তারেরা বহুমূত্র রোগে মাটা-তোলা [illegible] মাটা বা নবনীত তুলিয়া লইলে, যে দুধ অবশিষ্ট থাকে [illegible] দুগ্ধ বলিয়া থাকে। এই দুগ্ধ অত্যন্ত উপকা[illegible]

পৃথিবীর সকল দেশে, একরূপ নিয়মে [illegible] তোলা [illegible] প্রধান দেশে যে নিয়মে মাটা তোলা হয়, শীত-প্রধান [illegible] লম্বিত হইয়া থাকে। আমাদের গরম দেশ, এখানে কাঁচা [illegible] তাহা বিকৃত হইয়া থাকে। বিলাতে দশ বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিলে-ও, কাঁচা দুধ নষ্ট হয় না। এজন্য, তথায় কোন প্রশস্ত পাত্রে দুগ্ধ দোহন করিয়া, খোলা স্থানে রাখিতে হয়। শীতল বাতাস লাগিয়া, দুধের উপরে মাটা বা ননী জমিয়া থাকে। অনন্তর, তাহা তুলিয়া লইলে, অবশিষ্ট দুধকে 'স্কিম' দুধ কহিয়া থাকে। মাটার ইংরাজী নাম ক্রিম্ অর্থাৎ সর। খাদ্য বা পথ্যের জন্য টাট্‌কা দুগ্ধ-ই উপকারী। রোগীর পরিপাক শক্তি, বল এবং বয়স অনুসারে দুগ্ধের পরিমাণ স্থির করা আবশ্যক।

রাবড়ি প্রস্তুত করিবার সময়, যেমন বাতাস দিতে দিতে সর তুলিতে হয়, পাঁউরুটির রাবড়িতে সেরূপ করিতে হয় না *। দুধ জ্বালে চড়াইয়া, অনবরত নাড়িতে হয়। যখন দেখা যাইবে, অর্দ্ধেক দুধ জ্বালে মরিয়া আসিয়াছে, তখন ভাল পাঁউরুটির ছাল ফেলিয়া, ভিতরের শাঁস তাহাতে দিয়া, নাড়িতে হইবে। রুটি দেওয়া হইলে, পরিস্কৃত চিনি কিংবা সাদা বাতাসা দিতে হইবে। কিছুক্ষণ জ্বালে থাকিলে, রুটি গলিয়া, রাবড়ির ন্যায় থক-থকে হইয়া আসিবে। তখন, তাহা উনান হইতে নামাইয়া রাখিবে। অনন্তর, শীতল হইলে, পরিমাণ বুঝিয়া, দুই এক বিন্দু গোলাপী আতর চিনিতে মিশাইয়া, সেই উহাতে দিয়া, উত্তমরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া লইলে-ই, পাঁউরুটির রাব[illegible]

রুচি-অনুসারে আবার, উহাতে পেস্তার [illegible] দিতে পা[illegible] অভাবে, কর্পূর দিলে-ও চলিতে পারে। আমরা [illegible] লেবুর খোসার গুঁড়া দিলে, রাবড়ি খাইবার সময়, উহা [illegible] বিভোর হইয়া উঠে। ফল-কথা, ভো[illegible] রুচি-অনুসারে, যে মিশাইতে পারেন।

পাঁউরুটি-আহারে আপাত্ত থা[illegible]ল, রুা[illegible] টুকরা দ্বারা পাক করিতে পারেন, তাহা-ও উত্তম [illegible]

কাঁচা আমের [illegible]

প্রথমে, আম খোসা-সমেত [illegible]। তাহা ঠাণ্ডা হইলে, খোসা ছাড়াইয়া, তাহার মাড়ি মাড়ি পরিমাণ-মত জলে গুলিয়া, তাহাতে চিনি [illegible] এই মিশ্রিত জল, সরু নেকড়ায় ছাকিয়া লইবে। সরবতের পরিমাণ বুঝিয়া, [illegible]হাতে সামান্য গোলাপ-জল ও বরফ মিশাইয়া, পান করিবে। গোলাপ-জল ও বরফের অভাবে, পাতি কিংবা কাগজি লেবুর দুই এক ফোটা রস এবং শীতল জল ব্যবহার করিলে চলিতে পারে। গরমের সময়, এই সরবত ব্যবহার করিলে, অত্যন্ত তৃপ্তি ও স্নিগ্ধ বোধ হয়। গ্রীষ্মকালে, ঠাণ্ডা সরবত মাত্রে-ই যার-পর-নাই স্বাস্থ্য-কর এবং উপকারী।

* মৎপ্রণীত "মিষ্টান্ন-পাক" দেখ, তাহাতে রাবড়ি প্রস্তুত করিবার নিয়ম লিখিত আছে।

পাক-প্রণালী।

হিন্দুজাতির রন্ধন-প্রথা।

(৩)

হিন্দু-জাতির রন্ধন-প্রথা আলোচনা করিলে, পরিলক্ষিত হয় যে, যে সকল খাদ্য রন্ধন-পূর্ব্বক আহার করিলে, আমাদের বল, বর্ণ ও তেজের বৃদ্ধি হয়, সেই সকল দ্রব্য পাকে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। দূরদর্শী আর্য্য-ঋষিগণ বহু গবেষণা দ্বারা খাদ্য দ্রব্য-সমূহের গুণাগুণ, অগ্রে পরীক্ষা করিয়া, যে সকল দ্রব্য আমাদের দেহ-রক্ষার উপযোগী বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় হিন্দু-গৃহে রন্ধনের বিধি প্রণয়ন করিয়া-

ছেন। আহার্য্য দ্রব্য-নিচয়, ষড়-রসের আধারভূত। এই রস সকল, আবার দ্রব্যের আশ্রিত। দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য এবং বিপাক দ্বারা-ই দোষ ও ধাতুর ক্ষয়, বৃদ্ধি ও সমতা সম্পাদিত করিয়া থাকে। মানবের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ—আহার। আহার দ্বারা-ই শারীরিক বল, মাংস এবং স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হইয়া, বর্ণ ও ইন্দ্রিয়-সকল প্রসন্নভাবে থাকে। আহারের ব্যাঘাত বা বৈষম্য হইলে-ই, দেহ ভগ্ন হইতে আরম্ভ হয়। চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য এবং পেয় এই চতুর্ব্বিধ আহার দ্বারা বিভিন্ন-গুণবিশিষ্ট বহুবিধ দ্রব্য আহাররূপে গৃহীত হইয়া থাকে। অতএব আহার্য্য দ্রব্য-সমূহের গুণাবলী অবগত না হইলে, মানব-দেহ রক্ষা ও রোগের শান্তি-সাধনে সমর্থ হওয়া যায় না।

যে আহারের জন্য জগৎ বিব্রত, এবং সভ্যসমাজ, যে আহারের পাট্য-সাধনে সর্ব্বদা-ই ব্যতিব্যস্ত, সেই আহার-শব্দটি, পৃথিবীর মধ্যে প্রথমে কোন্ জাতির ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার আলোচনা করা, এ গ্রন্থে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আর্য্য-জা[illegible] মধ্যে বৈদিক সময় হইতে যজ্ঞাদির আয়োজন, অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়। [illegible] হইতেই, আহার [illegible]ব্দের উদ্ভব হইয়াছে।

প্রাচীন কালে যজ্ঞ ও আহার যে, একসূত্রে গ্রথি[illegible]

তাহার প্রমাণ। আহরণ-শব্দটি, যজ্ঞ-সম্পর্কী[illegible]

ব্যবহৃত হইত। পুরাকালে বনে বনে যজ্ঞের জন্য এব[illegible]

জন্য ফল, মূল প্রভৃতি ও সমিধ্-ভার আহরণ করিয়া অ[illegible]

যদি-ও বনে বনে আহরণ করিয়া বেড়াইতে হয় না; বি[illegible]

আহার্য্য লাভ করা সুকঠিন। ঋষিদিগের আহৃত [illegible]

কাংশ, সবুজ রঙের হইত বলিয়া, সবুজ রঙ-ও হরিত আখ্যা [illegible]

আহরণ বা হরণ হইতে-ই হরিত শব্দের উৎপত্তি। আহরণ শব্দের সম-গোষ্ঠীয় শব্দ, আমরা য়ুরোপীয় ভাষাতে-ও দেখিতে পাই। ইংরাজী 'আরণ' শব্দটি সংস্কৃত আহরণ শব্দের-ই বংশধর। ইংরাজী 'আরণ' শব্দটি স্যাক্সন 'আরনিয়ান্' বা জর্ম্মণ 'অরন্‌টেন' শব্দ হইতে আসিয়াছে। ইহার অর্থ—শস্যাদি সংগ্রহ করা। আহরণ শব্দের-ও ঐ এক-ই অর্থ। শুদ্ধ আহার শব্দ নয়, আহারার্থে অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দের-ই অনুরূপ শব্দ, আমরা য়ুরোপীয় ভাষায় প্রাপ্ত

হই। অনেকে-ই জানিতে পারেন, ভোজনার্থ অদ্ ধাতুর অনুরূপ শব্দ লাটিনে 'ইডো'—ইংরাজীতে 'ইট'—স্যাক্সন্ 'ইটান্' ইত্যাদি। সংস্কৃত অশন শব্দের-ও তুল্য শব্দ আমরা জর্ম্মণ ভাষায় 'এস্‌সেন' শব্দ পাই। এমন কি, যে 'ডিনার্' শব্দের আমরা অনুবাদ করি—'মধ্যাহ্ন ভোজন', সেই ডিনারকে জর্ম্মণেরা-ও 'মধ্যাহ্ন-ভোজন' বলেন। ডিনারকে জর্ম্মণ ভাষায় 'মিট্টাগস্' এস্‌সেন বলে; মিট্টাগস্ অর্থে মধ্যাহ্ন এবং এস্‌সেন অর্থে অশন। অশন, অদন এবং আহরণ—এই শব্দগুলি, বৈদিক কাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। বেদ-মন্ত্র এবং বৈদিক গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বহুস্থলে ইহাদিগের উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বে-ই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রন্ধন করিয়া, আহার করা জীবন-রক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তাই বলিয়া, যাহা তাহা রন্ধন করিয়া, আহার করিলে, কখন-ই মানব-দেহ রক্ষা হয় না। এই জন্য-ই শরীরতত্ত্ববিদ্ ঋষিগণ, অগ্রে পথ্যাপথ্য বা খাদ্যাখাদ্য বিচার দ্বারা [illegible]ন ও ভোজন-বিষয়ক বিধির সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ [illegible]বিধিগুলির [illegible] ধাতুভেদে, ঋতুভেদে এবং শরীরের অবস্থা-[illegible]পথ্যাপথ্যের ভেদ হয়, তাহা সুপ্রণালী-পূর্ব্বক বিচারিত হইয়াছে। [illegible] বলা হইয়াছে, মনুষ্যের ধাতু, অবিমিশ্র হয় না। সকল শরীরে-ই বায়ু, পিত্ত, কফ এই দোষত্রয়ের মিশ্রণ আছে। তন্মধ্যে, যাহার শরীরে যেটির বাহুল্য, তাহাকে সেই ধাতুর লোক বলা যায়। কিন্তু, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট এই ধাতু[illegible]-সকল বিবৃত করিবার পূর্ব্বে, য়ুরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের সহিত এই বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয়। নব্য দল—বায়ু, পিত্ত ও কফের নাম শুনিলেই, হাসিয়া উড়াইয়া দেন। বস্তুতঃ, ঐ শব্দগুলি দ্বারা শরীরের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বুঝায় মাত্র। ঐগুলি পারিভাষিক শব্দ। উহাদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের কোন হেতু-ই নাই। মোটামুটি বলিতে গেলে, ইংরাজীতে যাহা 'নার্ভস্'—সংস্কৃতে তাহা-ই বায়ু, ইংরাজীতে যাহা 'বিলিয়স্'—সংস্কৃতে তাহা-ই পিত্ত, আর ইংরাজীতে যাহা 'লিম্ফাটিক্' সংস্কৃতে তাহা-ই 'কফ' নামে অভিহিত। বায়ু-প্রকৃতির লোকের লক্ষণ এই :—

কৃশো রুক্ষোঽল্পকেশশ্চ চলচ্চিত্তোঽনবস্থিতঃ।
বহুবাক্যরতঃ স্বপ্নে বাতপ্রকৃতিকো নরঃ॥

অর্থাৎ কৃশ, রুক্ষ, স্বল্পকেশ, অস্থিরচিত্ত, নিদ্রাকালে বহু-কথন-শীল—এমন লোকের বায়ু-প্রধান ধাতু।

অকালপলিতো গৌরঃ প্রস্বেদী কোপনো বুধঃ।
স্বপ্নদীপ্তিমতপ্রেক্ষী পিত্তপ্রকৃতিরুচ্যতে॥

অর্থাৎ অকাল-পলিত, গৌরবর্ণ, ঘর্ম্মালু, ক্রোধী, বুদ্ধিমান্, স্বপ্নে দীপ্তি-দর্শন-শীল, এমন লোকের ধাতু—পিত্ত-প্রধান।

স্থিরচিত্তঃ সুবদ্ধাঙ্গঃ স্বপ্নলঃ স্নিগ্ধমূর্দ্ধজঃ।
স্বপ্নে জলাশয়ালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ॥

অর্থাৎ স্থিরচিত্ত, দৃঢ়কায়, নিদ্রালু, প্রশস্তকেশ, স্বপ্নে জলাশয়-দর্শনশীল, এমন লোকের ধাতু—কফ-প্রধান।

এই সকল লক্ষণের মিশ্রণে দ্বিদোষাত্মজ, ত্রিদোষাত্মজ ধাতু জন্মে। আহার এবং পানীয়, এরূপে ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে যে ব্যক্তির যে প্রাকৃতিক দোষ, সে দোষের বৃদ্ধি না হইয়া, ধাতুর সমতা জন্মে।

পানাহারাদয়ো যস্য বিরুদ্ধাঃ প্রকৃতেরপি।
সুখিত্বায়োপকল্পন্তে তস্য সাম্যমিতি কথ্যতে॥

অর্থাৎ যাহার পান এবং আহার, প্রকৃতির ও ধাতুগত দোষের বিরুদ্ধ, তাহার-ই সুখিত্ব এবং ধাতু-সাম্য জন্মে।

বিভিন্ন ধাতুর লোকের ক্ষুধার প্রকৃতির ইতরবিশেষ আছে।

মন্দস্তীক্ষ্ণোঽতিবিষমঃ সমশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ।
কফপিত্তানিলাধিক্যাত্তৎসাম্যাৎ জাঠরোঽনলঃ॥

অর্থাৎ জঠরানল, চারি প্রকার—মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম এবং সম। কফ, পিত্ত এবং বায়ুর আধিক্যে যথাক্রমে ঐ তিন প্রকার হয়, এবং কাহার-ও বিশেষ আধিক্য না থাকিলে সম হয়।

ধাতু-বিচারের পর মনুষ্য-শরীরে বিভিন্ন ধাতুর সহিত ষড়্ ঋতুর বা বার মাসের সম্বন্ধ বিচারিত হইয়া, এতদ্দেশীয়দিগের সূক্ষ্মদর্শিনী প্রত্যভিজ্ঞার প্রমাণ-স্বরূপ পথ্য বা খাদ্যাদি, নির্ণীত হইয়াছে। হেমন্তে এবং শিশিরে—বায়ু কুপিত, বসন্তে—শ্লেষ্মা কুপিত ; গ্রীষ্মে—পিত্ত কুপিত ; বর্ষাতে বায়ু, পিত্ত, কফ তিন-ই কুপিত এবং শরৎকালে—পিত্ত কুপিত হয়।

ধাতু এবং ধাতুর প্রকৃতি বুঝাইয়া, লোক সকলকে আপন আপন ভক্ষ্য-বিচার-কার্য্যে অধিকতর সাহায্য করিবার জন্য শাস্ত্রে রসাদির স্থূল স্থূল গুণ এবং কোন্ ধাতুর সহিত কোন্ রসের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপ বহু দর্শন ও বহু বিচারে সিদ্ধ ভক্ষ্য-দ্রব্য, হিন্দুর রন্ধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ, খাদ্য বা খাদ্য-দ্রব্য-রন্ধনে হিন্দু-শাস্ত্রের যেরূপ শাসন, সেরূপ শাসন, পৃথিবীর মধ্যে কোন জাতিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ন্যায়সঙ্গত শাসন, সমাজের শ্বাস বায়ু। যে সমাজে এই শাসনের অভাব, সে সমাজ যার-পর-নাই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে। উচ্ছৃঙ্খল সমাজ পাশববৃত্তিসমূহ-পরিচালনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। বিবিধ পদার্থরাজিপরিপূর্ণ এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এক অত্যদ্ভুত মহাকর্ষণশক্তিপ্রভাবে আকৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডলসমন্বিত সৌরজগৎ হইতে, আমাদের পদদলিত বালুকাকণা পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ-ই এই বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়া, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজন সম্পাদন করিতেছে। এই মহাকর্ষণসূত্রে গ্রথিত না থাকিলে, সকল পদার্থ-ই শৃঙ্খলাবিহীন ও বিপর্য্যস্তভাবে বিক্ষিপ্ত থাকিত। এই মহাশক্তিপ্রভাবে নিয়ন্ত্রিত [illegible] লীলাময়ী প্রকৃতি কীদৃশী [illegible] প্রাপ্ত হইতেন, তাহা কল্পনা-পটে [illegible] মানবের চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে! বিশ্বের এই বিস্ময়কর ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা প্রভূত শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। মহা-কর্ষণশক্তির অভাবে প্রাকৃতিক জগতে যে বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা, একমাত্র সংযমের অভাবে মানব-সমাজের ঠিক সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। এই উপপ্লবকরী বিশৃঙ্খলার সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য সংযমের প্রয়োজন। ফলতঃ, সংযম-ই মানব-সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতির একমাত্র নিদান। আহার দ্বারা এই সামঞ্জস্য যেরূপ সুরক্ষিত হয়, অন্য কোন উপায়ে সেরূপ হয় না। আর্য্য-ঋষিগণ হিন্দু-জাতির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া-ই, খাদ্য বা রন্ধনের সুব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন।

ঋগ্বেদ আলোচনা করিলে, সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্য ঋষি-গণ সর্ব্বপ্রথমে তিল, যব এবং তদনন্তর উড়িধান্যজাত তণ্ডুল রন্ধনে ব্যবহার করিতেন। এখন পর্য্যন্ত-ও হিন্দুদিগের যে কোন দৈবকার্য্যে তিলাদির ব্যব-হার প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক সময়ে ঋষিগণ শস্যের মধ্যে তিল,

যবাদি ও নানাবিধ ফল, মূল এবং দুগ্ধ-জাত ক্ষীর, সর, নবনীত ও ঘৃতাদি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে অসুরেরা মাংসাদি জৈব আহারে প্রবৃত্ত হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ৮৭ সূক্তে দেখা যায় যে, বৈদিক ঋষি বলিতেছেন,—"আম-মাংস-ভোজী রাক্ষসদিগের সমূলে নিধন-সাধন কর।" তৎকালে ঋষিগণ সাত্বিক আহার-ই একমাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনন্তর, ঋষিসমিতি মৎস্য ও মাংসাদির গুণ বা উপকারিতা অবগত হইয়া, দেব-ভোগ্য ঘৃত ও অসুর-ভোগ্য মাংসাদি একসঙ্গে রন্ধনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মাংসবর্গের মধ্যে জলচর, সজল-দেশবাসী, গ্রামবাসী, মাংস-ভোজী এবং জাঙ্গল, ইহাদিগের মাংস অত্যন্ত উপকারী। এজন্য এই সকল মাংসরন্ধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আর্য্য-ঋষিগণ এইরূপে খাদ্যদ্রব্যাদির গুণ বিচার করিয়া, পশ্চাৎ তাহা রন্ধনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ফলতঃ, পৃথিবীর মধ্যে আহার্য্য দ্রব্যের এরূপ গুণবিচার অপর কোন দেশে, কোন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য-ই, হিন্দুজাতির রন্ধন-গৃহে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কোন দ্রব্য-ই প্রবেশ করিতে পায় না। হিন্দুর রন্ধন-শালায় সাত্বিক-ভাবাপন্ন খাদ্যাদির-ই [illegible] প্রচলন। হিন্দু-শাস্ত্রে অনুষ্ঠিত যে পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে রন্ধন-গৃহ—যজ্ঞ-শালা, উনান বা চুল্লী—যজ্ঞ-কুণ্ড বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা মানব-দেহ সুরক্ষিত হয়, তাহা সামান্য যজ্ঞ নহে। এই যজ্ঞ-সম্পাদনে হিন্দু-রমণীকে যার-পর-নাই যত্নশীলা দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি বহুলোকের নিমন্ত্রণ-সংঘটিত ভোজনকে "যজ্ঞ" বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে দেখা যাইত, যজ্ঞাদি-উপলক্ষে হিন্দু-মহিলা রন্ধন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, নিমন্ত্রিতগণের ভোজন সমাপন না হইলে, তাঁহারা পানাহার করিতেন না; অদ্যাপি পল্লীগ্রামের হিন্দুপরিবার-মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। ফলতঃ, রন্ধন-কার্য্যে হিন্দু-রমণীর ন্যায় নিষ্ঠা, পৃথিবীর আর কোন দেশে পরিলক্ষিত হয় না। হিন্দু-শাস্ত্রে রমণী—গৃহের দেবী। এজন্য-ই ভারতবাসী—কি শাস্ত্র-প্রণেতা, কি মানব-হৃদয়জ্ঞ কবি, সকলে-ই মুক্ত-কণ্ঠে নারীগণের গুণগান করিয়া গিয়াছেন। রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র আদর্শ-নারী সীতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু রামা রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ! সা প্রিয়া মে॥
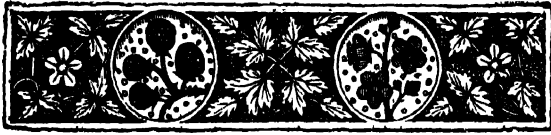
বিবিধ রন্ধন।

সাইবেরিয়ান পোলাও।

ভাল সরু ও পুরাতন চাউল উত্তমরূপে ঝাড়িয়া বাছিয়া লও। এই ঝাড়া চাউল ভাসা জলে ভাল করিয়া ধুইয়া রাখ। এখন, যত চাউল তাহার তিন গুণ জলে, উহা সিদ্ধ করিতে দাও; জ্বালে চাউল সুসিদ্ধ হইলে, এবং জল মরিয়া আসিলে, তখন পাক-পাত্রটি জ্বাল হইতে নামাও। যদি সমুদয় জল, অর্থাৎ ফেন শুকাইয়া না যায়, তবে হাঁড়ির মুখে পরিষ্কার কাপড় বাঁধিয়া ভাল করিয়া ছাঁকিয়া লও। এই সময় অন্য একটি পাত্রে ঘৃত খুব গরম করিয়া, ভাতের উপর ঢালিয়া দাও; ঘৃত দেওয়া হইলে, তাহাতে পরিমাণ মত লবণ, সাদা মরিচ ও গরম মসলার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া, পাক-পাত্রটি উত্তমরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। এরূপ নিয়মে ঝাঁকাইয়া ঝাঁকাইয়া নাড়িবে, যেন মসলা ও লবণ, সমুদয় অন্নের সহিত মিশিতে পারে।

রুচি-অনুসারে ভাতের জলে পিয়াজ কুটিয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু জলে চাউল ঢালিয়া দেওয়ার পূর্ব্বে, তাহা তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। পূর্ব্বে চাউল ধুইয়া রাখিতে হয়, ফুটন্ত জলে তাহা ঢালিয়া দিয়া, সিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই পোলাওয়ে দেড় পোয়া চাউলে, দেড় ছটাক ঘৃত দিতে হয়। সাইবেরিয়া দেশের লোক, অধিক পরিমাণে ঘৃত মসলা ব্যবহার করিয়া, পোলাও গুরুপাক করেন না। অত্যন্ত গরমের সময় এই পোলাও আহার করিলে, কোন প্রকার অসুখ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যত প্রকার পলান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে, তৎসমুদয় প্রায়-ই গুরুপাক হইয়া থাকে

মুগ-মনোহর।

ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অনুসারে রন্ধন করিলে, মুগের দাইলের বিভিন্ন প্রকার আস্বাদ হইয়া থাকে। নিত্য এক প্রকার পক্ব দ্রব্য আহার রুচি-জনক হয় না, এবং তাহা স্বাস্থ্যের-ও অনুকূল নহে; এজন্য খাদ্য-দ্রব্য-মাত্রে-ই রন্ধনগত পার্থক্য হওয়া আবশ্যক। মুগ-মনোহর ভাল করিয়া রাঁধিতে পারিলে রসনার যার-পর-নাই প্রীতিকর হইয়া থাকে।

পোলাও রন্ধনে যে আখনির জল ব্যবহৃত হয়, সেই জলে ইহা পাক করিলে, অত্যন্ত উপাদেয় হইয়া থাকে। মুগের মধ্যে সোণামুগ-ই উৎকৃষ্ট। এজন্য এই রন্ধনে সোণামুগ-ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আখনি জ্বালে ফুটিতে আরম্ভ করিলে, তাহাতে দাইল ঢালিয়া দিবে। সাধারণতঃ, যে নিয়মে দাইল পাক করিতে হয়, সেই নিয়মে দাইল পাক করিবে। জ্বালে উহা সুসিদ্ধ হইলে, তাহাতে পরিমাণ মত লবণ ও হরিদ্রা দিবে। কিন্তু হরিদ্রার পরিবর্ত্তে জাফরান্ দিলে, অপেক্ষাকৃত উপাদেয় হইয়া থাকে। যখন দেখিবে, দাইল সুসিদ্ধ হইয়াছে, তখন দুই একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। অনন্তর, উহা জ্বাল হইতে নামাইয়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া, তাহার মণ্ড বা মাড় গালিয়া লইবে। এই মাড়, ঘৃত সম্বরা দিয়া নামাইয়া লইলে-ই, মুগ-মনোহর পাক হইল।

মোচার মোহন চপ।

মোচা দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন কোন মোচা আতিক্ত; এজন্য ভাল অথচ টাট্‌কা মোচা-ই রন্ধনে ব্যবহার করিতে হয়।

প্রথমে মোচা কুটিয়া, তাহা জলে ফেলিতে হয়। সমুদয় মোচাগুলি কুটা হইলে, তাহা জল হইতে তুলিয়া, তাহাতে পরিমাণ মত লবণ ও হরিদ্রা মাখাইয়া, আধ ঘণ্টা রাখিয়া দিবে। পরে তাহা ভাল করিয়া ধুইয়া, জলে সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে তাহা উনান হইতে নামাইয়া, জল গালিয়া ফেলিবে। অনন্তর, উহা ঠাণ্ডা হইলে, ভাল করিয়া বাটিয়া লইবে। এখন একটি পাক-পাত্রে

ঘৃত জ্বালে চড়াইবে। মোচা রাঁধিতে হইলে, মাটির পাত্র-ই প্রশস্ত। কারণ, লৌহ-পাত্রে উহা কাল হইবার সম্ভাবনা। জ্বালে ঘৃত পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপত্র ফোড়ন দিয়া, মোচা-বাটা ঢালিয়া দিয়া, দুই একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। একবার ফুটিয়া আসিলে, তাহাতে পরিমাণ মত লবণ, ধনে-বাটা, আদা-বাটা দিয়া, কসিয়া নামাইয়া লইবে।

এদিকে, খোয়া-ক্ষীর ঘৃতে ভাজিয়া, মোচাতে মিশাইবে। এই সময় বাদাম ও পেস্তা-বাটা মোচার সহিত উত্তমরূপে চটকাইবে। অনন্তর, মোচার পরিমাণ বুঝিয়া, লবণ, লঙ্কা-বাটা মিলাইয়া রাখিবে।

এদিকে খোসা-সহ আলু সিদ্ধ করিয়া, তাহার খোসা ছাড়াইবে। খোসা ছাড়ান হইলে, আলুগুলি উত্তমরূপ বাটিয়া লইবে। এখন এই আলু-বাটাতে পরিমিত লবণ, লঙ্কা-বাটা মাখিয়া, ঘৃতে কসিয়া লইবে। অনন্তর, কসা-আলুর এক একটি লেচি কাটিবে। লেচির ভিতর পূর্ব্ব-প্রস্তুত মোচার পূর পুরিয়া পাকাইয়া, গোল কিংবা বাদামী যে কোন আকারে গড়াইবে। সমুদয় গুলি গড়ান হইলে, উহার এক একটি ডিমে ডুবাইয়া, বিস্কুটের গুঁড়া মাখাইয়া রাখিবে *। অনন্তর, ঘৃতে ভাজিয়া লইলে-ই, মোচার মোহন চপ প্রস্তুত হইল। গরম গরম এই চপ উত্তম সুখাদ্য। আহারের সময় চপের উপর গরম মসলার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া পরিবেষণ করিলে, উহা আর-ও উপাদেয় হইয়া থাকে।

গলদা চিংড়ির গুলেল কাবাব।

বড় বড় গল্‌দা চিংড়ি কুটিয়া বাছিয়া লও। কুটিবার সময় যে, তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। এখন মাছগুলি জলে সিদ্ধ কর। সুসিদ্ধ হইলে নামাইয়া জল গালিয়া ফেল। অনন্তর, উহা ঠাণ্ডা হইলে, বাটিয়া লও। এই মাছ-বাটা, ঘৃতে তেজপাত ও লবঙ্গ ফোড়ন

* ডিম ও বিস্কুট আহারে আপত্তি থাকিলে, ডিমের পরিবর্ত্তে চন্দনী ক্ষীর, অথবা জলে পাতলা করিয়া, বেসম গুলিয়া, তাহাতে ডুবাইয়া লইলে-ই, চলিতে পারে; আর বিস্কুটের পরিবর্ত্তে টাট্‌কা মুড়ির গুঁড়া, অথবা আরারুট কিংবা ময়দা লাগাইয়া লইলে, চপ প্রস্তুত হইতে পারে।

দিয়া, কসিতে থাক। কসার অবস্থায় পরিমাণ মত লবণ, ধনে-বাটা, লঙ্কা-বাটা মিশ্রিত কর। উত্তমরূপ কসা হইলে, নামাইয়া রাখ। এখন এই মাছের কিমাতে কাবাব আকবরীর ন্যায় লঙ্কা, অম্ল এবং ধনে প্রভৃতি শাকের পূর দিয়া, ডিমে ডুবাইয়া, বিস্কুটের গুঁড়া মাখাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া লও। গল্‌দা চিংড়ির গুলেল কাবাব আহারের সময় মাংস বলিয়া ভ্রম হয়। ডিম ও বিস্কুট ব্যবহারে আপত্তি থাকিলে, মোচার চপে যেরূপ ক্ষীর ও বেসম আদির কথা লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মে পাক করিবে, উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইবে।

বটের ভাজা।

বটের প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় পক্ষী ভাজিয়া আহার করিলে, উহা বেশ সুখাদ্য হইয়া থাকে। যে কোন পক্ষী ভাজিবার পূর্ব্বে, উহা উত্তমরূপে ছাড়াইতে হয়। গরম জলে দুই তিন মিনিট ডুবাইয়া রাখিয়া, পরে তাহা পরিষ্কার করিলে, পক্ষীর গাত্রের উপরিভাগ সহজে-ই পরিষ্কৃত হইবে। অনন্তর, পাখীর পেট চিরিয়া, ভিতরের ময়লা বাহির করিয়া ফেলিবে। এখন পাখীর গায়ের জল মুছিয়া, উহা বাতাসে শুকাইয়া লইবে।

পূর্ব্বে যে কারি-পাউডারের কথা বলা হইয়াছে, পরিমাণ মত সেই মসলার গুঁড়া ও লবণ পাখীর গায়ে বেশ করিয়া মাখাইয়া লইবে। অনন্তর, ভাল মাখন বা ঘৃতে পাখীটি ভাজিতে থাক; এবং উত্তমরূপে ভাজা হইলে, পাত্রান্তরে তুলিয়া রাখ।

রুচি অনুসারে অপর একটি পাত্রে দুই তিনটি পিয়াজ কুচি কুচি করিয়া ভাজিয়া লইবে। এরূপ সতর্কতার সহিত উহা ভাজিবে, যেন তাহা আঁকিয়া বা পুড়িয়া না যায়; অর্থাৎ বাদামী রঙে ভাজা হইলে, আর বেশ ঝর্‌ঝরে হইলে, তাহাতে সামান্য-পরিমাণ লবণ দিয়া নাড়িয়া লইয়া, ভর্জ্জিত পক্ষীর উপর ছড়াইয়া দিবে। আহারের সময় লেবুর রস মাখাইয়া আহার করিলে, বেশ মুখ-রোচক হইয়া থাকে।

খোরমুজের প্রলেহ।

উপকরণ ও পরিমাণ।—খোরমুজ এক সের, মাংস এক সের, ঘৃত দেড় পোয়া, ছোট এলাচ দুই মাসা, লবঙ্গ দুই মাসা, দারুচিনি দুই মাসা, মরীচ সাড়ে চারি মাসা, দধি আধ পোয়া, জাফরাণ এক মাসা, আদা তিন তোলা, ধনে দুই তোলা, লবণ এক ছটাক।

প্রথমে মাংসের কিমা করিয়া লইবে; এখন অর্দ্ধেক ঘৃতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া উহা কসিতে থাক। আধ-কসা হইলে, তাহাতে লবণ, ধনে ও লবঙ্গ-বাটা দিয়া, উত্তমরূপ নাড়িয়া চাড়িয়া দাও।

এদিকে খোরমুজ (কাঁচা) খণ্ড খণ্ড করিয়া কুটিয়া লও; এবং উহাতে আদার রস, লবণ, অবশিষ্ট ঘৃত ও দধি মিশ্রিত করিয়া, চারি দণ্ড ঢাকিয়া রাখ।

চারি দণ্ডের পর খোরমুজগুলি তুলিয়া, পাক-পাত্রস্থ মাংসে ঢালিয়া দাও। অনন্তর, জাফরাণ দধিতে গুলিয়া, উহাতে ঢালিয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দাও। জালে সুসিদ্ধ ও রস শুষ্ক হইলে, গন্ধ-দ্রব্য-চূর্ণ উহার উপরে ছড়াইয়া দিয়া, নামাইয়া লও। এই প্রলেহ অত্যন্ত সুখাদ্য। খোরমুজের অভাবে লাউ দ্বারা এই প্রলেহ পাক হইয়া থাকে। সূপ-শাস্ত্রে নানাবিধ প্রলেহ পাকের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

মাংসের সূপ্তা।

সূপ্তা যেরূপ মুখ-প্রিয়, আবার সেইরূপ স্বাস্থ্য-কর খাদ্য। পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন স্থানে এই খাদ্যের সমধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়। অড়হর, বুট এবং সোণামুগের দাইল-ই সূপ্তা পাকে প্রশস্ত।

কচি মাংসের কিমা সূপ্তা রন্ধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক সের পরিমিত দাইলে দেড় পোয়া হইতে আধ সের পর্য্যন্ত কিমা ব্যবহার করিতে পারা যায়। প্রথমে ঘৃতে লবঙ্গ, তেজপাত এবং লঙ্কা ফোড়ন দিয়া, কিমা উত্তমরূপে কসিয়া লইবে। কসিতে কসিতে উহা কাদার ন্যায় নরম হইয়া আসিবে, এবং তাহা হইতে সুগন্ধ বাহির হইতে থাকিবে। রুচি অনুসারে কসিবার সময় কিমাতে আদা ও পিয়াজ-বাটা এবং পরিমাণ মত লবণ দিতে পারা যায়। কিমা কসা হইলে, তাহা নামাইয়া রাখিবে।

এদিকে উপরি লিখিত যে কোন দাইল রাঁধিতে আরম্ভ করিবে। জ্বালে উহা অর্দ্ধ-সিদ্ধ হইলে, তাহাতে পূর্ব্ব-প্রস্তুত কিমা ও হরিদ্রা দিয়া, পাক করিতে থাকিবে। উত্তমরূপ সুসিদ্ধ হইলে, তাহাতে লবণ, জিরামরীচ-বাটা, আদা-বাটা, ধনে-বাটা দিয়া নামাইবে। এখন, অপর একটি পাক-পাত্রে ঘৃত চড়াইবে; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত, লবঙ্গ এবং ছোট এলাচের দানা সম্বরা দিয়া, দাইল সাঁতলাইয়া লইবে। সাঁতলান হইলে, জ্বালে দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, উনান হইতে পাক-পাত্র নামাইয়া রাখিবে। এখন, ভাজা গরম-মসলার গুঁড়া দাইলে দিয়া, একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। পরিবেষণের সময় আর একবার নাড়িয়া চাড়িয়া পরিবেষণ করিবে। সুপ্‌তা পাতলা হইলে, তত সুখাদ্য হয় না, এজন্য উহা থক্‌থকে করিয়া রাঁধিতে হয়।

মাংসের শিরাজী।

উপকরণ ও পরিমাণ।—মাংস এক সের, ডিম পাঁচটি, ঘৃত এক পোয়া, জাফরাণ এক মাসা, দারচিনি দুই মাসা, ছোট এলাচ দুই মাসা, মরীচ দুই মাসা, লঙ্কা দুই মাসা, ধনে দুই তোলা, আদা এক ছটাক, খোবানি দুই তোলা, কিস্‌মিস্ দুই তোলা, বাদাম দুই তোলা, পেস্তা দুই তোলা, লবণ চারি তোলা।

প্রথমে জ্বালে ঘৃত চড়াইবে, উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে লবঙ্গ ও লঙ্কা ফোড়ন দিয়া মাংস ঢালিয়া দিবে। এবং মধ্যে মধ্যে নাড়িতে থাকিবে। জ্বালের অবস্থায় মাংস হইতে জল বাহির হইতে থাকিবে। যখন দেখিবে, জল প্রায় মরিয়া বা শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে ধনে, লঙ্কা ও আদা-বাটা এবং লবণ দিয়া নাড়িতে থাকিবে; অল্পক্ষণ নাড়াচাড়ার পর, তাহাতে সিদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত জল ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। জ্বালে মাংস বার আনা পরিমাণে সিদ্ধ হইলে, উনান হইতে পাক-পাত্র নামা-ইয়া, দমে বসাইবে। এই সময় আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। অর্থাৎ মাংসে যেন অধিক পরিমাণে ঝোল না থাকে। অনন্তর, ডিমের কুসুম ও কিস্‌মিস্ প্রভৃতি যাবতীয় ফল মাংসে ঢালিয়া দিবে। দমের অবস্থায় যে,

পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। যখন দেখিবে, মাংস উত্তমরূপ সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে জাফরাণ-বাটা এবং অবশিষ্ট মসলা (গরম) গুঁড়া মাংসের উপর ছড়াইয়া দিয়া, একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে-ই, মাংসের শিরাজী পাক হইল।

রুচি অনুসারে উহা আবার মধুর-অম্ল আস্বাদনের করিতে হইলে, দমের অবস্থায় চিনির রসে লেবুর রস মিশাইয়া, উহাতে ঢালিয়া দিতে পারা যায়। এই মাংস-পাকে প্রায়-ই ঝোল থাকে না, গা-মাখা অর্থাৎ থক্‌-থকে গোছের হইবে। ভাল করিয়া রাঁধিতে পারিলে, শিরাজী অত্যন্ত সুখাদ্য হইয়া থাকে। সাজাহান বাদসাহের প্রধান পাচক নিয়ামৎ খাঁ এই রন্ধন-প্রথা আবিষ্কার করেন। রুচি অনুসারে পিয়াজ ব্যবহার করিতে পারা যায়।

বাদসাহী রুটি।

উপকরণ ও পরিমাণ।—মিষ্ট ডালিমের রস তিন ছটাক, বাদাম-বাটা আধ পোয়া, মিছরী আধ পোয়া, নবনীত এক ছটাক, ডিম দুইটি, মৃগ-নাভি এক রোয়া, গোলাপ-জল এক ছটাক, আটা এক সের।

টাট্‌কা আটা বা ময়দা, প্রথমে কাটখোলায় অল্প পরিমাণে ভাজিয়া লইবে। এখন এই ভাজা আটাতে সমুদয় উপকরণগুলি মিশাইয়া দলিতে থাক। আটা যে পরিমাণে দলিবে, রুটি-ও সেই পরিমাণে সুখাদ্য হইবে। সাধারণ রুটির ময়দা যেরূপ জল দিয়া মাখিতে হয়, ইহা-ও সেইরূপ নিয়মে মাখিবে।

অনেক সময় দেখা যায়, বেলার দোষে রুটি ভাল হয় না। রুটি বেলিবার নিয়ম এই যে, উহা সম্পূর্ণ গোল হইবে, অথচ কোন স্থান পুরু বা পাতলা হইবে না। এরূপ নিয়মে রুটি বেলিলে, উহা বেশ ফুলিয়া উঠিবে; রুটি বা লুচি ভাল করিয়া না ফুলিলে উহা তত সুখাদ্য হয় না। রুটি বেলা হইলে, তাহা সাধারণ রুটি সেকিবার নিয়মে মৃদু আঁচে সেঁকিয়া লইলে-ই, বাদসাহী রুটি প্রস্তুত হইল। এই রুটি অত্যন্ত মোলায়েম হইয়া থাকে। কেহ কেহ উহাকে মিষ্ট-রুটি-ও কহিয়া থাকে।

আলুর চন্দ্রকলা।

প্রথমে খোসা-সহ আলু সুসিদ্ধ করিয়া লও। ঠাণ্ডা হইলে, তাহার খোসা ছাড়াইয়া, উত্তমরূপে বাটিয়া রাখ। এখন, জ্বালে ঘৃত চড়াও; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে লবঙ্গ ও তেজপাত ফোড়ন দিয়া, আলু-বাটা কসিতে থাক; কসিতে কসিতে আলু কিছু রঙ্দার গোছের হইলে, তাহা নামাইয়া রাখ। এই সময় ভাজা মসলার গুঁড়া, অর্থাৎ লঙ্কা, তেজপাত, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, মৌরী এবং কালজীরার গুঁড়া উহাতে মাখাইয়া লও। এই সময় যে, আলুর পরিমাণ বুঝিয়া, তাহাতে লবণ মাখিয়া লইতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে।

এদিকে ভাল টাট্‌কা ময়দায় এরূপ ময়ান দিবে, উহা যেন খাস্তা হয়, অর্থাৎ আহারের সময় যেন মুখে দিলে চিবাইতে চিবাইতে মিলাইয়া যায়। এইরূপ ময়ান দিয়া, সিঙ্গেড়ার ময়দার ন্যায় ময়দা মাখিয়া লও। এখন, পেরাকি গড়িবার মত এক একটি লেচি বেলিয়া, তাহার মধ্যে পূর্ব্ব-প্রস্তুত আলুর পূর দেও; পূর দেওয়া হইলে, যোড়-মুখ পেরাকির ন্যায় বিনাইয়া দাও। এইরূপে সমুদয়গুলি প্রস্তুত করিয়া, ঘৃতে ভাজিয়া লইলে-ই, আলুর চন্দ্রকলা প্রস্তুত হইল। চন্দ্রকলা গরম গরম উত্তম মুখ-রোচক।

অধিক দিন ফল রাখিবার উপায়।

সকল সময় সকল প্রকারের ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু যত্ন করিয়া রাখিলে, গ্রীষ্মকালের ফল শীতকালে এবং শীত ঋতুর ফল গ্রীষ্ম-কালে ব্যবহার করিতে পারা যায়। এইরূপ ফল রাখিতে যে, অধিক অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন, তাহা নহে; ফলতঃ, এক ঋতুর ফল অন্য ঋতুতে ব্যবহার-সুখ-ভোগ করিতে হইলে, সামান্য চেষ্টা ও আয়াস স্বীকার করিলে-ই, সহজে ও অল্প ব্যয়ে তাহা সম্পাদিত হইতে পারে। যে নিয়মে ফল বহুদিন পর্য্যন্ত ব্যবহারোপ-যোগী রাখা যাইতে পারে, নিম্নে তাহা লিখিত হইতেছে।

যে ফল রাখিতে হইবে, তাহা গাছ হইতে সদ্য পাড়া-ই বিধি। পরিপুষ্ট, সুপক্ক এবং টাট্‌কা গাছ-পাড়া ফল যেরূপ অধিক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে, অন্য ফল সেরূপ থাকে না। প্রাতঃকালে কিংবা সন্ধ্যার সময় (অর্থাৎ ঠাণ্ডার

সময়), রাখিবার ফল, গাছ হইতে পাড়া নিষিদ্ধ। কারণ, সে ফল থস্‌থসে হইয়া পড়ে, অধিক দিন পর্য্যন্ত ভাল অবস্থায় থাকে না ; এজন্য অত্যন্ত প্রখর রৌদ্রের সময় গাছ হইতে ফল পাড়া ভাল এবং রৌদ্র থাকিতে থাকিতে তাহা বড় বোতল কিংবা জারের মধ্যে পূরিয়া রাখিতে হয়। অধিক দিনের জন্য সঞ্চয় করিবার পক্ষে আম, জাম, পেয়ারা, কুল এবং আপেল প্রভৃতি ফল-সমূহ-ই উত্তম।

দিবসে; বেলা দুই প্রহরের সময় ফল সংগ্রহ করিবে; শুক্‌ন খট-খটে দিনে-ই ফল সঞ্চয় করিয়া, তাহার বোঁটা কাটিয়া ফেলিবে। ফল রাখিবার জন্য, পূর্ব্ব হইতে, গলা-বড় কাচের পাত্র (জার) পরিষ্কৃত করিয়া, উত্তমরূপ শুকাইয়া রাখিবে। এদিকে, ফলগুলি যতদূর পার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইবে। পাত্রে ফল পূরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাহা উপুড় করিয়া, অর্থাৎ বোতল বা জারের মুখ নীচের দিকে করিয়া, দশ বারটি দেশলায়ের কাটি এক সঙ্গে জ্বালিয়া, উহার মুখের ভিতর ধরিবে; এরূপ তৎপরতার সহিত উক্ত পাত্রের মুখে দুই তিনবার দেশলাইয়ের কাটি জ্বালিয়া ধরিলে, তন্মধ্যস্থ বাতাস বাহির হইয়া যাইবে। বাতাস বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বে-ই, পাত্রে যে পরিমাণে ফল ধরিতে পারে, তৎপরিমাণ ফল দ্বারা পাত্রটি পূর্ণ কর ; পাত্রস্থ বাতাস বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বে-ই, অত্যন্ত ক্ষিপ্র-হস্তে ফল পূরিবার কাজ শেষ করা আবশ্যক ; নতুবা ভিতরের বাতাস বাহির হইয়া গেলে, ফল পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এইরূপে ফলগুলি পূর্ণ করিয়া, নূতন এয়ার-টাইট, (বাতাস ঢুকিতে না পারে) ছিপি দ্বারা পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। অনন্তর, ধূনার আঠা প্রস্তুত করিয়া, তাহা ছিপির চারি পাশে উত্তমরূপ লাগাইয়া দিবে ; এইরূপ আঁটিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাহিরের বাতাস আদৌ পাত্র-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

অনন্তর, রাত্রিকালে রন্ধনের পর, উনান হইতে আগুন বাহির করিয়া, বোতলে তাপ সহ্য হয়, এইরূপ উত্তাপে উনানের মধ্যে ফল-পূর্ণ কাচ-পাত্র রাখিয়া দিবে। উনানে উত্তাপ অধিক থাকিলে, পাত্র ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। লিখিত নিয়মে রাখিতে পারিলে, এক বৎসর পর্য্যন্ত ফল টাট্‌কা রাখা যাইতে পারে।

অধিক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত ভাবে ফল রাখিবার যে যে নিয়ম আছে, তন্মধ্যে লিখিত নিয়ম-ই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ফলের বোতল বা জার এরূপ স্থানে রাখা আবশ্যক, যে স্থানে যেন আদৌ ঠাণ্ডা লাগিতে না পায়।

মণ্ড, পেয়া ও বিলোপী।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে রোগ-বিশেষে মণ্ড, পেয়া বা বিলোপী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে দেশ-মধ্যে কবিরাজী চিকিৎসা-ই প্রবল ছিল, তখন প্রত্যেক গৃহস্থ-ই মণ্ডাদি পাক করিতে জানিতেন, এখন ডাক্তারি চিকিৎসার আদর বৃদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং মণ্ডের পরিবর্ত্তে ব্রথ প্রভৃতি বিলাতি পথ্যের চলন বাড়িতেছে; এজন্য পাক-প্রণালীতে কবিরাজী ও ডাক্তারি উভয়বিধ পথ্য রন্ধনের নিয়ম লিখিত হইতেছে। *

পাকের লক্ষণ।—যাহা একবারে সিটা বা কণা-শূন্য ও তরল, তাহাকে মণ্ড কহিয়া থাকে।

যাহাতে সিটের অল্পতা ও তরলতা অধিক, তাহা পেয়া এবং যাহাতে সিটে ও তরলতা অল্প, তাহা বিলোপীর পাক জানিবে।

উপকরণ ও পরিমাণ।—শুঁঠ এক তোলা, পিপুল এক তোলা, জল চারি সের। অবশিষ্ট দুই সের।

যদি কোন রোগীকে শুঁঠ ও পিপুল দিয়া, খৈ কিংবা চাউলের মণ্ড পাক করিয়া দিতে হয়, তবে ঔষধ-দ্রব্য সমস্ত মিলিয়া দুই তোলা হইবে; এবং তাহাতে চারি সের জল দিয়া, মৃৎপাত্রে জ্বাল দিবে। অর্দ্ধেক অর্থাৎ দুই সের থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া, তাহাতে চাউল কিংবা খৈ দিয়া, মণ্ডাদি প্রস্তুত করিবে। পুরাতন মিহি চাউল সামান্যরূপ ভাঙ্গিয়া, অথবা খৈ-চূর্ণ যত, তাহার উনিশ গুণ জল দ্বারা মণ্ড এবং এগার গুণ জল দিয়া বিলোপী পাক করিবে। এইরূপ নিয়মে শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, গোক্ষুর, কণ্টকারী, ধনে এবং পিপুলাদি ঔষধ দ্বারা মণ্ড পাক করিবে।

* নূতন সংস্করণ "পাক-প্রণালী'তে পথ্য-রন্ধন প্রকরণ দেখ।

মুগ ও আমলকীর যূষ।

উপকরণ ও পরিমাণ।—সোণামুগের দাইল আধ পোয়া, আমলকী দুই তোলা, জল চারি সের; অবশিষ্ট এক সের।

পূর্ব্বে যেরূপ মৃৎপাত্রে পাক করিয়া, এক সের থাকিতে নামাইয়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবার কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিলে-ই, যূষ পাক হইল।

বাত-পিত্ত-জ্বরাক্রান্ত রোগীর পক্ষে এই যূষ অত্যন্ত উপকারী।

পাঁউরুটি সেকিবার নিয়ম।

আজকাল সহর অঞ্চলে পাঁউরুটির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। অনেক সময় রোগীর খাদ্যে-ও উহা ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু, ব্রাহ্মণের দোকানে যে রুটি প্রস্তুত হইয়া, রোগীর পথ্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, তাহা অতীব জঘন্য। তদ্দ্বারা অম্ল প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের বৃদ্ধি বা স্ফুরণা হইয়া থাকে। কারণ, তাহা প্রায় কদর্য্য ভূসি দ্বারা প্রস্তুত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। রোগীর খাদ্য, যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধ এবং স্বাস্থ্যের উপযোগী হওয়া আবশ্যক। আমাদের বিবেচনায় বাজারের অস্বাস্থ্য-কর রুটি অপেক্ষা গৃহে সুজির রুটি প্রস্তুত করিয়া আহার করা ভাল।

পাঁউরুটি সেকিয়া বা ভাজিয়া (টোষ্ট) আহার করিলে, উহা খাইতে-ও ভাল লাগে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে-ও অনুকূল হয়। অনেক প্রকার নিয়মে পাঁউ-রুটি ভাজা হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভাজিলে, উহার আস্বাদ-ও ভিন্ন-রূপ হইয়া থাকে। এমন কি, বাজারের কদর্য্য রুটি-ও সেকিয়া লইলে, তাহা-ও মুখ-রোচক হইয়া থাকে।

সিকি ইঞ্চি মোটা করিয়া, রুটির এক একখানি খণ্ড, চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রাখ। একপোয়া পরিমিত রুটি হইলে, প্রায় এক ছটাক মাখন সামান্য আঁচে চড়াও; উহা উত্তমরূপ গলিয়া আসিলে, তাহাতে কর্ত্তিত রুটিগুলি ঢালিয়া দাও। মাখন যে, খাঁটি হওয়া আবশ্যক, তাহা যেন মনে থাকে। মৃদু আঁচে রুটির খণ্ডগুলি এ-পিট-ও-পিট উল্টাইয়া দাও। ঈষৎ বাদামী রং হইলে,

বুঝিতে হইবে, ভাজার কাজ শেষ হইয়াছে। অনন্তর, খণ্ডগুলি মাখন হইতে তুলিয়া, পরিষ্কৃত নেকড়া বা ব্লটিং কাগজের উপর রাখ; এইরূপ অবস্থায় অল্প-ক্ষণ থাকিলে রুটির গা হইতে মাখন কাগজে টানিয়া লইবে। পরে রুটির খণ্ডগুলি কোন পাত্রে তুলিয়া, আগুনের আঁচে রাখিবে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গরম থাকিবে। ভাজা রুটি গরম গরম আহার করা-ই প্রশস্ত।

প্রকারান্তর।—রুটি টুকরা টুকরা আকারে কাটিয়া, এক একখানি টুকরা কোন পাত্রে সাজাইয়া রাখ, অনন্তর, সর কিংবা গাঢ় দুগ্ধ প্রত্যেক টুকরার উপর এক এক চামচ বা ঝিনুক ঢালিয়া দাও। এক ঘণ্টা পরে, এই রুটির টুকরা-গুলি পূর্ব্বোক্ত নিয়মে খাঁটি মাখনে ভাজিয়া লও, এবং গরম গরম অবস্থায় পরিবেষণ কর। চিনির সহিত এই টুকরা খাইতে অতি সুখাদ্য।

মোহন রুটি।

উপকরণ ও পরিমাণ।—ময়দা এক সের, নারিকেল-দুগ্ধ পাঁচ ছটাক, দুগ্ধের সর তিন ছটাক।

মোহন রুটি উত্তম সুখাদ্য। উহা তন্দুরে * সেকিয়া লইলে-ই ভাল হয়। নতুবা কাট-কয়লার আঁচে সেকা-ই প্রশস্ত!

প্রথমে নারিকেলের দুধ প্রস্তুত করিবে। ঝুনা নারিকেল কুরিয়া, তাহাতে পরিমাণ মত গরম জল মিশাইয়া, কাপড়ে নিঙ্গড়াইয়া লইলে, অতি সহজে প্রচুর দুধ বাহির হইবে। এই দুধে সর মিশাইয়া, আগুনে পাক করিয়া লইবে। এখন, এই সর-মিশ্রিত দুগ্ধ ময়দায় মাখিবে। মাখিতে প্রয়োজন অনুসারে ময়দায় জল দিয়া খুব ঠাসিয়া লইবে। ময়দা মাখা শেষ হইলে, ইচ্ছানুসারে ছোট কিংবা বড় আকারে লেচি কাটিয়া, রুটি বেলিবে। অনন্তর, তাহা আগুনে সেকিয়া লইলে-ই মোহন রুটি প্রস্তুত হইল।

মোহন কচুরি।

উপকরণ ও পরিমাণ।—ময়দা তিন পোয়া, ছোলার বেসম এক ছটাক, আমসী-চূর্ণ এক ছটাক, কিসমিস্ এক ছটাক, পোস্তবীজ-বাটা আধ

* যে উনানে পাঁউরুটি প্রস্তুত হয়, তাহাকে তন্দুর কহে।

পোয়া, মরীচ আধ ছটাক, দারুচিনি-চূর্ণ তিন মাসা, ঘৃত আধ সের, দুধ আধ পোয়া।

প্রথমে, ময়দায় আধ পোয়া ঘৃত ময়ান দিবে, পরে তাহাতে দুধ মিশাইয়া, দলিতে থাকিবে। এখন, প্রয়োজন মত জল দ্বারা ময়দা মাখিতে থাকিবে। দলিবার বা মাখিবার সময় তাহাতে কিস্‌মিস্‌-বাটা, আমসী-চূর্ণ, পোস্তবীজ-বাটা, মরীচ ও দারুচিনি-চূর্ণ এবং এক ছটাক ঘৃত মিশাইয়া উত্তমরূপ দলিয়া লইবে।

এদিকে, অবশিষ্ট ঘৃত জ্বালে চড়াইবে। ঘৃত সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখিবে যে, লুচি, কচুরি প্রভৃতি যে কোন প্রকার ঘৃত-পক্ক দ্রব্য অধিক অর্থাৎ ভাসা ঘৃতে না ভাজিলে তাহা ভাল রকম ফুলিয়া উঠে না। সে যাহা হউক, জ্বালে ঘৃত পাকিয়া আসিলে, তাহাতে পূর্ব্ব-প্রস্তুত ময়দা দ্বারা কচুরি ভাজিয়া লইবে। এই কচুরি অত্যন্ত সুখাদ্য।

কচুরি ভাজিবার নিয়ম এই যে, ঘৃত-সহ পাক-পাত্র মধ্যে মধ্যে উনান হইতে নামাইয়া রাখিতে হয়; এরূপ নামাইবার কারণ এই যে, গরম ঘৃতের দমে কচুরি উত্তমরূপে সুসিদ্ধ হইয়া আইসে। নতুবা, ক্রমাগত তীব্র জ্বালে রাখিয়া ভাজিলে, কচুরির উপরিভাগ পুড়িয়া বা চোঁওয়াইয়া আসিবে, এবং ভিতর কাঁচা থাকিবে।

আমের মাধুরী।

কাঁচা আমের দ্বারা মাধুরী প্রস্তুত হইয়া থাকে, এই মিষ্ট খাদ্য রসনার অত্যন্ত উপাদেয়। নির্জ্জলা অর্থাৎ খাঁটি দুগ্ধ-ই মাধুরীর পক্ষে প্রশস্ত।

প্রথমে আমের খোসা ছাড়াইবে। একটু বাধাইয়া ছাড়াইলে-ই ভাল হয়। সমুদয় আমের খোসা ছাড়ান হইলে, তাহা সরু সরু করিয়া কাটিবে। এখন, তাহাতে চূণ (পাণে খাবার) মাখাইয়া রাখিবে। অধিকক্ষণ চূণ মাখাইয়া রাখিলে, আমের রঙ কাল হইয়া আসিবে; এজন্য অল্পক্ষণ পরে তাহা ভাসা জলে ধুইয়া ফেলিবে। উত্তমরূপ ধৌত হইলে, তাহাতে পরিমাণ মত লবণ ও চিনি মাখাইয়া রাখিয়া দিবে।

এদিকে, খাঁটি দুধ জালে বসাইবে। জালের অবস্থায় যে, সর্ব্বদা নাড়িয়া দিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। জালে দুধ আওটাইতে আওটাইতে, যখন দেখিবে, উহা বেশ ঘন হইয়া আসিয়াছে, অর্থাৎ কাটি বা খুন্তির গায়ে লাগিয়া যাইতেছে, তখন তাহাতে পরিমাণ মত চিনি দিয়া নাড়িতে থাকিবে। দুধ পাতলা ক্ষীরের আকারে পরিণত হইলে, মাধুরী প্রস্তুতের উপযুক্ত হইয়াছে, মনে করিতে হইবে।

পূর্ব্বে যে আমে লবণ ও চিনি মাথাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার অধিক জলে কচলাইয়া কচলাইয়া ধুইবে। ধোয়া শেষ হইলে, জল নিংড়াইয়া, তাহা ঐ ক্ষীরে ঢালিয়া দিবে। অনন্তর, দুই একবার ফুটিবার পর তাহা নামাইয়া রাখিবে। ক্ষীর শীতল হইলে, তাহার পরিমাণ বুঝিয়া, একটু চিনিতে দুই তিন ফোটা গোলাপী আতর মিশাইয়া, সেই চিনি আম-মিশ্রিত ক্ষীরে ছড়াইয়া দিয়া, একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে-ই, আমের মাধুরী প্রস্তুত হইল।

কখন-ও কখন-ও আবার, আমগুলি সামান্য থেঁত অথবা অল্প সিদ্ধ করিয়া-ও ক্ষীরে মিশান হইয়া থাকে। ফলতঃ, রুচি অনুসারে, লিখিত নিয়মের মধ্যে যে কোন নিয়ম অনুসারে, পাক করিতে পারা যায়।

শসার পায়স।

অন্যান্য পায়সের ন্যায়, শসার পায়স অতি উপাদেয় খাদ্য। ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিলে, এই পায়স রসনায় যার-পর-নাই আদরণীয় হইয়া থাকে। দুগ্ধের উৎকর্ষানুসারে পায়সের আস্বাদগত তারতম্য হইয়া থাকে। পায়সের প্রধান উপাদান দুগ্ধ; এজন্য নির্জ্জলা অর্থাৎ খাঁটি দুগ্ধ দ্বারা পায়স প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রথমতঃ, শসার বীজ বা বিচি ও খোসা ছাড়াইয়া পরিষ্কার করিবে। পরিষ্কৃত হইলে, সরু সরু করিয়া কুটিবে, আর খণ্ডগুলি মোটা মোটা হইলে, অল্প থেঁত করিয়া লইবে। এখন, এই শসাতে চূণ (পাণ খাবার) মাথাইয়া, অল্পক্ষণ পরে, অধিক জলে বেশ করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিবে। অধিকক্ষণ চূণ মাথাইয়া রাখিলে, শসা কাল হইবার সম্ভাবনা; এজন্য সত্বর ধুইয়া ফেলিবে।

এদিকে, দুধ জ্বালে চড়াইয়া, ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। আওটানর গুণে দুধ মিষ্ট হইয়া থাকে। জ্বালে দুধ ঘন হইয়া আসিলে, তাহাতে দুধের পরিমাণ বুঝিয়া পূর্ব্ব-প্রস্তুত শসা, বাদাম, পেস্তা এবং কিস্‌মিস্‌ দিয়া নাড়িতে থাকিবে। দুই একবার নাড়া চাড়ার পর, চিনি মিশাইবে। সচরাচর, সের প্রতি এক ছটাক হইতে আধ পোয়া পর্য্যন্ত চিনি দিলে-ই চলিতে পারে। জল-মিশ্রিত দুগ্ধ হইলে, চিনির পরিমাণ অধিক লাগিয়া থাকে। জ্বালের অবস্থায় দুধের আকার চন্দনী ক্ষীরের ন্যায় গাঢ় অর্থাৎ ঘন হইলে, তাহা উনান হইতে নামাইবে। নামাইয়া কিছুক্ষণ নাড়িতে থাকিবে। এই অবস্থায় নাড়িতে থাকিলে, সর পড়িতে পাইবে না। পায়স ঠাণ্ডা হইলে, পরিমাণ বুঝিয়া, দুই এক ফোটা গোলাপী আতর একটু চিনিতে মিশাইয়া, পায়সে ছড়াইয়া দিয়া, একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া দিবে। আতর ব্যবহারে যাঁহাদের আপত্তি থাকে, তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে কর্পূর ও ছোট এলাচ-চূর্ণ ব্যবহার করিতে পারেন।

প্রকারান্তর।—প্রথমে, ভাল রকম টাট্‌কা গাওয়া ঘৃত জ্বালে চড়াইবে। ঘৃত পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত ফো ় দিবে। ঘৃতে তেজপাত ভাজা ভাজা হইলে, তদুপরি দুগ্ধ ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। এখন, পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মে পায়স পাক করিবে। খাঁটি দুগ্ধে তেজপাতসহ ঘৃত সম্বরা দিয়া, পায়স পাক করিলে, সেই পায়স অত্যন্ত সুখাদ্য হইয়া থাকে; কিন্তু ঘৃত মিশাইলে, পায়স অপেক্ষাকৃত গুরুপাক হইয়া উঠে।

অমৃত দধি।

দধি, ক্ষীর কিংবা রাবড়ি প্রস্তুত করিতে হইলে, নির্জ্জলা অর্থাৎ খাঁটি দুগ্ধের দ্বারা না করিলে, কখন-ই উপাদেয় হয় না। এজন্য, সর্ব্বাগ্রে খাঁটি দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে হয়। অমৃত দধির পক্ষে গাভী-দুগ্ধ-ই উত্তম। প্রথমে, একখানি পরিষ্কৃত কড়াতে দুধ জ্বাল দিতে আরম্ভ করিবে। দুধ আওটাইতে আওটাইতে যখন দেখিবে, অর্দ্ধেকের কম মরিয়া আসিয়াছে, তখন নামাইবে। জ্বালের অবস্থায় যে, সর্ব্বদা নাড়িতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। সর্ব্বদা নাড়িবার দুইটি কারণ আছে; প্রথম কারণ এই যে, সর্ব্বদা না নাড়িলে, দুধ ধরিয়া বা আঁকিয়া

যাইবার সম্ভাবনা; দ্বিতীয় কারণ এই যে, সর্ব্বদা নাড়িতে থাকিলে, দুধে সর জমিতে পারিবে না। সর পড়িলে, দুধের সারভাগ সরে সঞ্চিত হয়; সর তুলিলে, দুধের তত আস্বাদ থাকে না।

আওটান অবস্থায় দুধ ঘন হইয়া আসিলে, তাহা জ্বাল হইতে নামাইবে; এবং নূতন মাটির পাত্রের ভিতরের চারিদিকে অম্ল-দধি মাখাইবে। অনন্তর, পূর্ব্ব-প্রস্তুত দুগ্ধ, ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে, দধি-লিপ্ত পাত্রে ঢালিয়া দিবে; এরূপ নিয়মে ঢালিয়া দিবে, যেন পাত্রটি পূর্ণ না হয়, অর্থাৎ কিছু খালি থাকে। এখন, অপর একটি বড় হাঁড়ি জল-পূর্ণ করিয়া, তাহাতে দুগ্ধ-সহ পাত্রটি স্থাপন করিবে, অর্থাৎ দুগ্ধের পাত্রটির যেন গলদেশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন থাকে। এদিকে, অপর একটি হাঁড়ির তলদেশে একটি টাকার আয়তন পরিমাণ ছিদ্র করিয়া, তাহা জলের হাঁড়ির উপর স্থাপন করিবে। এখন, ময়দা বা মৃত্তিকার লেপ দ্বারা জোড়-মুখ আঁটিয়া দিবে। অনন্তর, জলের হাঁড়ি তপ্ত অঙ্গারের উপর বসাইয়া রাখিবে, দধি জমিয়া আসিবে। এই দধি মিষ্টাস্বাদ-বিশিষ্ট করিতে হইলে, দুধ জ্বাল দেওয়ার সময়, তাহাতে সের প্রতি এক ছটাক চিনি কিংবা বাতাসা দিবে। অমৃত-দধি রসনার অত্যন্ত তৃপ্তি-জনক।

বাদশাহী খণ্ডুই।

উপকরণ ও পরিমাণ।—ছোলার বেসন এক পোয়া, দধি দুই সের, দারুচিনি দুই মাসা, ছোট এলাচ দুই মাসা, লবঙ্গ দুই মাসা, মেথি এক মাসা, মরীচ সাড়ে চারিমাসা, লবণ চারি তোলা এবং ঘৃত এক পোয়া।

প্রথমে জল-সহ আঠার তোলা বেসন মৃদু তাপে নাড়িতে থাক; নাড়িতে নাড়িতে উহা কঠিন হইলে, কাঠের পাটার উপর বিস্তৃত করিয়া দাও। অনন্তর, তাহা চৌকা চৌকা আকারে কাটিয়া, ঘৃতে ভাজিয়া রাখ; পরে দুই তোলা বেসন, মরীচ-চূর্ণ, লবণ এবং দধি এক সঙ্গে মিশ্রিত কর। এখন ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া, তাহাতে মেথি ফোড়ন দিয়া, তদুপরি দধি ঢালিয়া দাও। জ্বালে ফুটিতে আরম্ভ করিলে, ঘৃতে ভাজা বেসনের চৌকাগুলি উহাতে ঢালিয়া দাও। কিছুক্ষণ জ্বালে থাকিলে, দধি শুষ্ক হইয়া, অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়া আসিবে। এই সময় অবশিষ্ট উপকরণ মিশাইয়া নামাইয়া লও।

মাষকলাই গোলক।

প্রথমে, আস্ত মাষকলাই জাঁতায় ভাঙ্গিয়া, ঝাড়িয়া, জলে ভিজাইয়া রাখিবে। অধিকক্ষণ জলে থাকিলে, দাইল হইতে সহজে-ই খোসা ছাড়িয়া আসিবে। ফলতঃ, যখন দেখিবে, সহজে-ই খোসা ছাড়িয়া আসিতেছে, তখন ভাসা জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিবে। এখন, এই ধৌত দাইল, উত্তমরূপে বাটিয়া রাখিবে। বাটিবার সময়, দাইলে যেন খিচ না থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। এই খিচ-শূন্য দাইল-বাটাতে ডিমের শ্বেত ভাগ মিশাইয়া, খুব ফেনাইবে। ফুলরি প্রভৃতির গোলা উত্তমরূপ ফেনান হইলে, তাহা বেশ ফুলিয়া উঠে, এবং মোচক হইয়া থাকে। তবে, যাঁহাদের ডিম ব্যবহারে আপত্তি আছে, তাঁহারা উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন.।

এদিকে, ঘৃত-সহ পাক-পাত্র জ্বালে চড়াইবে, এবং ঘৃত পাকিয়া আসিলে, তাহাতে আধ ছটাক পরিমিত গোলা ঢালিয়া দিয়া, বড়া বা ফুলরি ভাজিয়া, এক-তার-বন্দ চিনির রসে ডুবাইয়া দিবে। রস পাতলা হইলে, সহজে তাহা ফুলরির ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। এই জন্য এক-তার-বন্দের রস ব্যবহার করিতে হয়।

ঘৃত ও চিনির পরিবর্ত্তে খাঁটি সরিষার তৈল এবং গুড়ের রস ব্যবহার করিতে-ও পারা যায়। কিন্তু তাহা তত সুখাদ্য হয় না। ফলকথা, সঙ্গতি অনুসারে ভোক্তাগণ, উভয়বিধ প্রণালীর মধ্যে, যে কোন নিয়ম অবলম্বন করিতে পারেন।

আমের ফুলরি।

সুপক আম্রের রস দ্বারা পাক করিতে হয় বলিয়া, ইহাকে আম্র-গোলক অর্থাৎ আমের ফুলরি কহিয়া থাকে। এই আম্র-গোলক অত্যন্ত সুমিষ্ট এবং পবিত্র খাদ্য। যে আম্রের রস গাঢ় অর্থাৎ ঘন এবং সুমিষ্ট, সেই আম্রের রস দ্বারা এই খাদ্য পাক করিতে হয়।

প্রথমে আমগুলি জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে। পরে, তাহার খোসা ছাড়াইয়া, পরিষ্কৃত বস্ত্রে ছাঁকিয়া, রস বাহির করিবে।

এ দিকে, ময়দায় ময়ান দিয়া দলিতে থাকিবে। ভাল রকম মাখা হইলে, তাহাতে দুগ্ধ, চিনি এবং আম্রের রস মিশাইয়া, ফেনাইতে থাকিবে। ফেনাইতে ফেনাইতে, যখন দেখিবে, উহা মাতিয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে দারু-চিনি-চূর্ণ মিশাইবে। অনন্তর, একখানি কড়াতে ঘৃত জ্বালে বসাইবে; এবং ঘৃত পাকিয়া আসিলে, আধ ছটাক পরিমিত গোলা লইয়া, ঘৃতে ভাজিবে। তালের ফুলরি বা বড়া যেরূপ নিয়মে ভাজিয়া লইতে হয়, সেইরূপ নিয়মে ভাজিয়া লইবে।

সন্তানিকা।

সন্তানিকা এক প্রকার সর-ভাজা। অনেক প্রকার নিয়মে সর-ভাজা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অনুসারে পাক করিলে, উহার আস্বাদ-গত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষীর, সর এবং নবনীত প্রভৃতি দুগ্ধ-জাত নানাবিধ উপাদেয় অথচ পুষ্টি-কর খাদ্য হিন্দু-জাতির মধ্যে, প্রথমে-ই ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। দুগ্ধ-জাত খাদ্যমাত্রে-ই অত্যন্ত পবিত্র; এই পবিত্র খাদ্য প্রস্তুত করিতে হিন্দুজাতির ন্যায়, আর কোন জাতি পারদর্শিতা প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে।

সন্তানিকা প্রস্তুত করিতে হইলে, নির্জ্জলা দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে হয়। প্রথমে, দুগ্ধ জ্বাল দিতে আরম্ভ করিবে। জ্বালের অবস্থায় দুগ্ধ ঘন হইয়া আসিলে, জ্বাল হইতে উহা নামাইবে। দুগ্ধ গরম থাকিতে থাকিতে, ঘোল-মোয়ার ন্যায়, মন্থন-দণ্ড দ্বারা ঘুরাইতে থাকিবে। ঘুরাইবার সময়, দুধের ফেনা উঠিতে থাকিবে। যখন দেখিবে, অত্যন্ত ফেনা উঠিয়াছে, তখন আর মন্থন-দণ্ড না ঘুরাইয়া, দুগ্ধ-সহ পাক-পাত্রটি তপ্ত অঙ্গারের উপর স্থাপন করিবে। কিছুক্ষণ এইরূপ অব-স্থায় থাকিলে, দুধের উপর অত্যন্ত পুরু সর পড়িবে। অনন্তর, সাবধানতার সহিত সরখানি তুলিয়া, অপর পাত্রে রাখিবে। এখন অস্ত্র দ্বারা ইচ্ছানুসারে সর চৌকা আকারে কাটিবে। এই কর্ত্তিত খণ্ডগুলি ভাল ঘৃতে ভাজিয়া, চিনির রসে ডুবাইয়া তুলিয়া লইলে-ই, সন্তানিকা পাক হইল। রুচি অনুসারে এই সময়, উহাতে দুই এক ফোটা গোলাপী আতর মিশাইয়া লইলে, উহা আর-ও উপাদেয় হইবে।
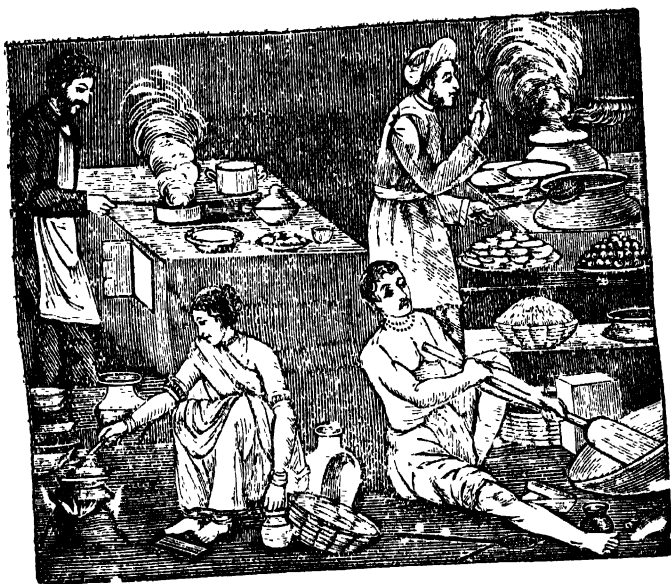
পাক-প্রণালী।

রন্ধন-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

আমাদের দেশে রন্ধন সম্বন্ধে-পুস্তক প্রচারের যে, গুরুতর অভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, একথা কে অস্বীকার করিবে? রন্ধন করিয়া আহার করিতে হয়; এবং আমরা নিত্য যাহা আহারের নিমিত্ত রন্ধন করিয়া থাকি, সে সম্বন্ধে অল্পাধিক জ্ঞান, অনেকের-ই আছে, সত্য বটে; তথাপি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে পুস্তক লিখিয়া রন্ধন-বিদ্যা শিক্ষা দিবার প্রয়োজন বা উপকারিতা কি? সত্য বটে, রন্ধন-সম্বন্ধে আমরা সকলে-ই কিছু না কিছু অভিজ্ঞ;

কিন্তু অভিজ্ঞ বলিয়া, রন্ধন-সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল আমরা যে, সম্পূর্ণ অবগত আছি, একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের অনভিজ্ঞতা এবং সুব্যবস্থার অভাবে, অনেক দ্রব্য, যাহা রন্ধন করিয়া, আহারোপযোগী করিয়া লইতে পারি, তাহা হেলায় আমরা নষ্ট করিয়া থাকি; আমরা সকল প্রকার আহার্য্য দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারি না। এই অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমরা যে কেবল, তৃপ্তি-কর আহার হইতে আত্ম-বঞ্চনা করিয়া থাকি, তাহা নহে; পরন্তু পরোক্ষে আমরা বহুবিধ নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সম্ভারের অপচয় করিয়া, আমাদের অপরিমিত-ব্যয়িতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি; দুঃখ কষ্টের সংসারে, বিশৃঙ্খলতার প্রসার বৃদ্ধি করিয়া, সংসারকে অশান্তির আকর করিয়া তুলি। এই বিশৃঙ্খলা এবং রন্ধন-সম্বন্ধে সাধারণের এই অনভিজ্ঞতা দূর করিবার জন্য-ই, পাক-বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন।

আর এক কথা। ক্ষুধা পাইলে-ই খাইতে হয়, ইহা স্বভাবের নিয়ম; প্রাণিগণ এই প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী বলিয়া-ই, আহার-সম্বন্ধে শিক্ষা কাহাকে-ও দিতে হয় না; পশু ও মানব, এই আহার-সম্বন্ধে এক ধর্ম্মাবলম্বী; নিদ্রা ও মৈথুন-সম্বন্ধে-ও এই এক-ই কথা। কিন্তু এই তিনটি প্রাকৃতিক বিষয়ে পশু ও মানবে প্রভেদ কি? পশুরা বিচার না করিয়া আহার করিয়া থাকে; অসভ্য অজ্ঞান নরপশুদের মধ্যে, জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ আদৌ পরিলক্ষিত হয় না, তাহারা-ও এই তিন বিষয়ে পশু অপেক্ষা কোন অংশে-ই প্রায় শ্রেষ্ঠ নহে। কিন্তু মানুষ জ্ঞান-চালিত; বিবেক ও বিচার কর্ত্তৃক পরিচালিত বলিয়া-ই মানুষ,—মানুষ; যিনি ধীমান্ ও সমধিক বিচারবান্, তিনি-ই মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ! অতএব, মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য, যে কোন কার্য্য হউক না কেন, বিচার করিয়া, তাহা সম্পাদন করা। সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কার্য্য হইতে, অতি উচ্চতর কার্য্য পর্য্যন্ত, বিচার-বিহিত-চিত্তে সম্পন্ন করা মনুষ্যমাত্রের-ই কর্ত্তব্য। অতএব, রন্ধন-সম্বন্ধে-ও বিশেষ বিচারের প্রয়োজন।

কথাটা একটু খুলিয়া বলি। অনেকে মনে করেন, অন্ন-ব্যঞ্জন প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্য-সমূহ অর্থাৎ যাহা পিতৃ-পিতামহাদির কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, যাহা গৃহস্থ-গৃহে সচরাচর খাইয়া থাকে এবং জুটে, এই ত আমাদের আহার; ইহা-ই কোনরূপে সুসিদ্ধ করিয়া, আহারোপযোগী করিতে পারিলে-ই যথেষ্ট হইল; বিভিন্ন

প্রকারের রন্ধন অর্থাৎ যাহার নাম কখন-ও শুনি নাই, এমন জিনিষ রাঁধিয়া খাওয়া, সে ত কেবল বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। একে ডাইনে আনিতে বামে কুলায় না, তাহার উপর আবার এরূপ হাঙ্গামা; কাজ নাই আমার রন্ধন-শিক্ষায়! যাহা চলিতেছে, তাহা-ই ভাল।

যাহারা বিচার-পরিশূন্য, তাহাদের-ই মুখে রন্ধন-সম্বন্ধে এইরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, রন্ধনের গুরুত্ব কি, সে কথা অনুধাবন করিলে, এরূপ যুক্তি-শূন্য কথা বলা চলে না। বাস্তবিক, বিলাস-বর্দ্ধনের জন্য রন্ধন ও আহার নহে, আত্মরক্ষণের জন্য, সমাজ ও দেশের কল্যাণ-সাধনের জন্য, রন্ধন ও আহারের প্রয়োজন, জীবন-ধারণ করিবার জন্য, আহারের প্রয়োজন। যে আহারের উপর আমাদের জীবন ও মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, তাহা কখন-ই উপেক্ষণীয় নহে; আবার, যখন রন্ধনের উপরে-ই আহার্য্য-দ্রব্য-নিচয়ের গুণাগুণ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, তখন রন্ধন-বিদ্যা-ও উপেক্ষণীয় নহে। রন্ধন-বিষয়ে জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। কাজে-ই সে জ্ঞান-প্রচারের জন্য রন্ধন-সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশের-ও প্রয়োজন।

আমাদের স্বাস্থ্য ও রন্ধন, পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ যে, রন্ধনের প্রতি উপেক্ষা করিলে, স্বাস্থ্যের প্রতি উপেক্ষা করা হয়। যদি স্বাস্থ্য গেল, তবে বাঁচিয়া থাকা, সে ত বিড়ম্বনা মাত্র। কাজে-ই স্বাস্থ্যবান্ হইতে হইলে, রন্ধনের প্রতি দৃষ্টি রাখা-ও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শরীরের পুষ্টিসাধন ও পরিপোষণের জন্য-ই আহারের প্রয়োজন; কেবল রসনার-তৃপ্তি সাধনের জন্য নহে। যাহা আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার কি গুণ, কোন্ দ্রব্যে শরীরের কোন্ কোন্ অংশের পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে, নানাবিধ দ্রব্য একত্র করিয়া রন্ধন করিলে, তাহার কি গুণ হয়, এই সকল নিয়ম, স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য, আমাদের সকলের-ই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য; এবং এই সকল নিয়ম জানিয়া, তদনুরূপ রন্ধনের ব্যবস্থা করা-ও আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে, আমাদের শরীর নিয়ত-ই ক্ষয়-হইতেছে; কিন্তু যেমন ক্ষয়-হইতেছে, সেইরূপ আবার স্বভাব হইতে-ই, তাহা পরিপূরণ করিবার একটা চেষ্টা-ও সেই সঙ্গে সঙ্গে হইতেছে; হরণ ও পূরণের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মধ্যে, আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন; কখন আছে, কখন নাই; জ্ঞান বলিতেছে,

জীবনের উপর, ধর্ম্ম মোক্ষ—যাহা কিছুমনুষ্যত্ব, তাহা নির্ভর করিতেছে, বিদ্যা বুদ্ধি—যাহা কিছু মনুষ্যের গৌরবের আস্পদ, দয়া দাক্ষিণ্য—যাহা কিছু মানব-চরিত্রের সদ্গুণ, সে সকলে-ই এই জীবন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; আবার এই জীবন, এক হইতে দুই—এইরূপে ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া, সমাজ-শরীর আচ্ছন্ন করিয়া আছে; অতএব, এই জীবনকে রক্ষা করা-ই মনুষ্যের সর্ব্ব-প্রধান ও সর্ব্ব-প্রথম কর্ত্তব্য। যাহা নিত্য ক্ষয় হইতেছে, যাহা প্রতি-শ্বাসক্ষেপে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার পূরণ করিতে হইবে; যে বেগবান্ অশ্ব স্বভাবের আকর্ষণে মৃত্যু-মুখে প্রধাবিত হইতেছে, তাহার বল্গা সংযত করিতে হইবে, তাহার গতি ফিরাইতে হইবে; জীবন রক্ষা ও তাহা ধারণ করিতে হইবে, তাহাকে কার্য্যক্ষম করিতে হইবে; তবে ত আত্ম-উন্নতি হইবে, তবে ত জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধিত হইবে, তবে ত সমাজ ও দেশের কল্যাণ সম্পাদিত হইবে। নতুবা রোগ-শোকাগার অকর্ম্মণ্য খেদ-খিন্ন দেহ-ভার বহিয়া লাভ কি? মৃত্যু-ই ত শ্রেয়ঃ!

এই যে দেহ বা জীবনের নিত্য ক্ষয়, ইহার পূরণ স্বভাবের সাহায্যে স্বতঃ-ই সাধিত হইতেছে, কিন্তু তাহা[illegible]রে-ও জ্ঞানের একটা কার্য্য আছে; রোগ হইলে, কখন কখন বিনা চিকিৎসায়-ও তাহা আরোগ্য হইতে পারে, স্বভাবের নিয়মে সারিতে পারে বটে, কিন্তু তথাপি চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে; সে প্রয়োজনীয়তা কি? না, স্বভাবের অনুগামী হইয়া, আরোগ্য লাভের পথ সুগম ও সহজ-সাধ্য করা; পদব্রজে তিন মাসে কাশী না গিয়া, বাষ্পীয়-যান-সাহায্যে একদিনে কাশী যাওয়া। বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ পানীয়, নিরুদ্বেগ-চিত্তে নিদ্রা, স্বাস্থ্য-কর আহার—ইহা-ই না, আমাদের শরীরের নিত্য-ক্ষয়কে পূরণ করিতেছে; অলক্ষ্যে যুদ্ধ; উভয় পক্ষই প্রবল, এক পক্ষ বলিতেছে, "আমি এই যে মাংস-পিণ্ড দেহ—মেদ-অস্থি-শোণিত-মল-মূত্রের আধার, ইহাকে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইব; আমার গতি অপ্রতিহত, আমার শক্তি অপরিমেয়, কেহ আমার গতিরোধ করিও না; আমার নাম মহাকাল; আমি তমঃ—আমি মৃত্যু।" আর একজন বলিতেছে, "সাধ্য কি? আমি এই মেদ, অস্থি ও শোণিত লইয়া দেব-মূর্ত্তি গঠন করিব; এই মূর্ত্তিকে চির-জীবিত করিয়া রাখিব; ইহার সৌরভে দিক্ আমোদিত হইবে; ধর্ম্মের পথ প্রশস্ত হইবে, জ্ঞান-দীপ্তি অজ্ঞান-তিমির বিদূরিত

করিয়া, পৃথিবীকে স্বর্গ করিয়া তুলিবে। আমার নাম জীবন, আমার নাম সত্তা, আমার অধিকারে মৃত্যুর প্রবেশ নিষেধ, এস যুদ্ধ করি।" এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? মৃত্যুকে সাহায্য করা, না, জীবনের সহায়তা করা? কোন্ অজ্ঞানান্ধ মূর্খ বলিবে যে, মৃত্যুকে সাহায্য করিব? ক্ষয়কে আলিঙ্গন করিতে কাহার সাধ? কাজে-ই পূরণ করিতে হইবে। জীবনের বল-বৃদ্ধি করিতে হইবে। বল-বৃদ্ধি করিতে হইলে-ই, রসদের সুব্যবস্থা করা চাই। স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে, অবস্থা, কার্য্য ও প্রয়োজনীতা হিসাবে, ক্ষয় পূরণার্থ সু-আহারের আবশ্যক। সু-আহার, অর্থাৎ স্বাস্থ্যোপযোগী আহার্য্য-নির্ব্বাচনের জ্ঞান থাকা আবশ্যক; বিচারের প্রয়োজন; এবং সু-রন্ধনের নিয়ম পরিজ্ঞাত হওয়া-ও একান্ত কর্ত্তব্য। কাজে-ই দেখা যাইতেছে, রন্ধন-বিদ্যা উপেক্ষণীয় নহে; যাহার উপর জীবন নির্ভর করিতেছে, তাহা উপেক্ষার বিষয় ত হইতে পারে না। এই জন্য-ই রন্ধন-বিদ্যার অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক, এবং এতৎ-সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচারে-ও নিতান্ত প্রয়োজন।

বিবিধ-রন্ধন।

আরেবিয়ান পোলাও।

আরব দেশে এই পোলাও ব্যবহৃত হয় বলিয়া, ইহাকে আরেবিয়ান অর্থাৎ আরব্য পোলাও কহিয়া থাকে। এই পোলাওয়ের রন্ধন-প্রথা অতি সহজ। ইহাতে অধিক পরিমাণে ঘৃত ও মসলা ব্যবহৃত হয় না। এজন্য ইহা গুরুপাক-ও নহে।

পোলাওয়ের উপযুক্ত চাউল উত্তমরূপে ঝাড়িয়া বাছিয়া অধিক জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে। এই ধৌত চাউল, ভাত রাঁধার নিয়মে অন্ন পাক করিবে। তবে প্রভেদ এই যে, ভাতের ফেন গালিয়া ফেলিতে হয়, কিন্তু এ অন্নের ফেন ফেলিতে হয় না; অর্থাৎ এরূপ পরিমিতি জল দিয়া পাক করিবে যেন, অন্ন পাক হয়, অথচ ফেন না থাকে। আর দানাগুলি ভাঙ্গিয়া না যায়। অর্থাৎ এরূপ অন্ন প্রস্তুত করিতে হইবে, উহা বেশ সুসিদ্ধ অথচ ঝরঝরে থাকিবে।

এদিকে, অপর একটি পাক-পাত্রে মাখন অথবা ভাল ঘৃত জ্বালে চড়াইবে। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত, আদার কুচি দিয়া নাড়িতে হইবে, এবং উহা ভাজা ভাজা হইলে, তদুপরি অন্নগুলি ঢালিয়া দিয়া, তাহাতে পরিমাণ-মত লবণ ও মরীচের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে।

কেহ কেহ আবার, লবণ প্রভৃতি দেওয়ার সময়, উহাতে পাখীর মাংসের কাথ অর্থাৎ যূষ দিয়া থাকেন। পাখীর মাংস সিদ্ধ করিয়া দিতে হইলে,

পোলাও রাঁধিবার পূর্ব্বে, একটি পাক-পাত্রে পাখীর মাংস জলে সিদ্ধ করিতে হয়। উহা এরূপ নিয়মে সিদ্ধ করিতে হইবে, যেন মাংস গলিয়া প্রায় জলের সহিত মিশিয়া যায়। অনন্তর, ঐ সিদ্ধ জলে বা যূষে পরিমাণ মত লবণ দিতে হয়, অন্য কোন প্রকার মসলা দিতে হয় না। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, আরব্য পোলাও প্রস্তুত হইল।

নিগমৎ পোলাও।

এই পোলাও-পাকে চিনি-শর্কর চাউল হইলে-ই ভাল হয়। ইহা এক প্রকার মিঠা পোলাও। আম্র-রস দ্বারা এই পলান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রথমে, অধিক জলে অন্ন পাক করিয়া, এক ফুট শক্ত থাকিতে থাকিতে নামাও; এবং পাক-পাত্রের মুখে গামছা বাঁধিয়া, পাত্রটি উপুড় করিয়া দাও, সমুদয় ফেন পড়িয়া যাইবে।

এদিকে, দুধ জ্বালে আওটাইয়া, অর্দ্ধেক পরিমাণ থাকিতে, তাহাতে মিষ্ট আমের রস, চিনি ও সামান্য খোয়া-ক্ষীর ও জাফরাণ দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া রাখ।

এদিকে, একটি পাক-পাত্রে মাখন-মারা ঘৃত জ্বালে চড়াও, এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে গরম-মসলার গুঁড়া দিয়া, নাড়িতে থাক। জ্বালে উহা ভাজা ভাজা হইলে, তদুপরি ভাত ঢালিয়া দাও। অনন্তর, অন্নের উপর পূর্ব্ব-প্রস্তুত আমের রস ঢালিয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখ। ইচ্ছা হইলে, এই সময় পেস্তা ও কিস্‌মিস্ উহাতে দিতে পার। এই সময় হইতে, উহাতে আর জ্বাল দিবে না। ভাত শক্ত থাকিলে, সামান্য দমে রাখিবে। পরিবেষণের সময়, পোলাওয়ে গোলাপ জল ছিটাইয়া দিবে।

আলুবোখারার খিচুড়ি।

এই খিচুড়ি অম্ল-মধুর আস্বাদের জন্য রসনায় যার-পর-নাই আদরণীয়। তেঁতুল কিংবা অন্য প্রকার অম্ল অপেক্ষা আলুবোখারা দ্বারা পাক করিলে,

খেচরান্ন সমধিক সুস্বাদু হইয়া থাকে। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা বর্ষা ও শীত কাল-ই পোলাও ও খিচুড়ি আহারের প্রশস্ত সময়।

এই খিচুড়ি জল দ্বারা রন্ধন না করিয়া নারিকেল-দুধ দ্বারা পাক করিলে, অপেক্ষাকৃত মধুর-আস্বাদ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে; এজন্য চাউলের পরিমাণ বুঝিয়া, ঝুনা-নারিকেলের দুধ বাহির করিয়া লইবে। নারিকেল-কুরাতে গরম জল মিশাইয়া, তাহা কাপড়ে নিংড়াইয়া লইলে, প্রচুর দুধ বাহির হইবে। এই দুধ, পাকের জন্য রাখিবে।

এদিকে, আলুবোখারা ভাসা-জলে দুই চারি বার উত্তমরূপে ধুইয়া লইবে। আলুবোখারাতে যেরূপ ময়লা থাকে, তাহা ভাল করিয়া না ধুইয়া লইলে, খাদ্য-দ্রব্য মলিন ও অস্বাস্থ্য-কর হইবে। এই ধৌত আলুবোখারা দুই এক-বার আগুনে ফুটাইয়া, নামাইয়া রাখিবে।

এখন, পাক-পাত্র জ্বালে চড়াইয়া, তাহাতে পরিমাণ-মত ঘৃত ঢালিয়া দিবে। যে-কোন খিচুড়িতে ঘৃত একটু অধিক দিয়া পাক করিলে, উহা সুখাদ্য হইয়া থাকে। ঘৃত পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাতা, লবঙ্গ, জীরা এবং দারুচিনি দিয়া নাড়িতে থাক। জ্বালে উহা চুড়চুড় করিয়া ফুটিয়া আসিলে, তাহাতে আদা-বাটা দিয়া নাড় এবং মধ্য মধ্যে জলের ছিটা দিতে থাক। মসলার উত্তমরূপ গন্ধ বাহির হইলে, ছোট এলাচ, চাউল দাইল উহার উপর ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে আরম্ভ কর। এই খিচুড়ির পক্ষে দাদখানি ও পেশোয়ারি প্রভৃতি চাউল এবং সোণামুগ কিংবা খাঁড়ি মসুরের দাইল-ই ভাল হয়। ঘৃতে চাউল ভাজা ভাজা হইলে, পূর্ব্ব-রক্ষিত নারিকেল-দুধ তাহার উপর ঢালিয়া একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। জ্বালে খিচুড়ি ফুটিতে আরম্ভ হইলে, পাক-পাত্রের ঢাকনি খুলিয়া, মধ্যে মধ্যে ভাল করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। কারণ, এই সময় ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া না দিলে, উহা ধরিয়া যাইতে পারে।

এদিকে, অপর একটি পাত্রে চিনির রসের সহিত আলুবোখারা পাক করিতে থাক। উহা ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে ছোট এলাচের দানা, (অল্প থেঁত করিয়া) লবণ এবং জাফরাণ বাটা দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া রাখ। উনানস্থিত খিচুড়ি এক ফুট শক্ত থাকিতে থাকিতে, তদুপরি রস-সহ আলুবোখারা ঢালিয়া দিয়া,

একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রটি দমে বসাইয়া রাখিবে। এবং সুসিদ্ধ হইলে, দম হইতে তুলিয়া, খিচুড়ির উপর গোলাপজলের ছিটা মারিয়া, আর একবার নাড়িয়া চাড়িয়া পরিবেষণ করিবে।

আলু-পটোলের মাফিন।

চপ ও কোপ্তার ন্যায় মাফিন-ও এক প্রকার ভাজা-বিশেষ। পোলাও ও খিচুড়ির সহিত উহা খাইতে বেশ সুখাদ্য। বিশেষতঃ, নিরামিষ-ভোজীর পক্ষে উহা উপাদেয় ভোজ্য।

প্রথমে, চপের আলুর ন্যায় আলু জলে সিদ্ধ করিয়া, খোসা ছাড়াইবে। শীত-কাল হইলে, দেশী আলু এবং বর্ষাকালে নাইনিতাল আলু মাফিনের পক্ষে উত্তম উপকরণ। এখন, সিদ্ধ আলু খিচ-শূন্য করিয়া বাটিয়া লইবে। অনন্তর, তাহা ঘৃতে কসিতে থাকিবে। কসিবার সময়, আলুতে পরিমাণ-মত লবণ, আদা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, এবং ধনে-বাটা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। রসা হইলে, উহা নামাইয়া রাখিবে।

এদিকে, ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া, তাহাতে পটোলের (খোসা ছাড়ান) সরু সরু চাকা, কাঁচা লঙ্কার সরু সরু কুচি * দিয়া নাড়িতে থাক। অর্দ্ধেক ভাজা হইলে, তাহাতে ময়দা ছড়াইয়া দিয়া, নাড়িতে আরম্ভ কর। অল্পক্ষণ পরে, পরিমাণ মত লবণ ও সামান্য মরীচের গুঁড়া এবং অল্প জল ঢালিয়া দিবে। জ্বালের অবস্থায় নাড়িতে নাড়িতে, উহা বেশ লপেট গোছের হইলে, নামাইয়া রাখিবে।

এখন, পূর্ব্ব-প্রস্তুত আলুর এক একটি লেচি কাটিয়া, তাহা বেলিয়া, কচুরির আকারে বিস্তৃত কর; এবং তাহার উপর আলু-পটোলের পূর দিয়া, আলুর ঐরূপ আর একটি চাকৃতি দিয়া ঢাকিয়া দাও। পরে, টিপিয়া টিপিয়া চারি-ধারের যোড়-মুখ আঁটিয়া রাখ। এইরূপে সমুদয়গুলি প্রস্তুত হইলে, থালায় সাজাইয়া রাখ।

এদিকে, আলুর চাকৃতির পরিমাণ-অনুসারে, দুধে ময়দা, বেসন এবং সামান্য লবণ দিয়া, বেগুনি-ভাজার গোলার ন্যায় গোলা প্রস্তুত করিবে। অনন্তর,

* ইচ্ছা হইলে, পিয়াজের সরু সরু কুচি এই সঙ্গে ব্যবহার করিতে পার।

জ্বালে ঘৃত চড়াইয়া, উহা পাকাইয়া লইবে। এখন, এই গোলাতে এক এক-খানি আলুর চাকৃতি ডুবাইয়া, গোলা-সহ ঘৃতে ভাজিয়া লইলে-ই মাফিন প্রস্তুত হইল। দুধের অভাবে, জলদ্বারা-ও গোলা প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু তাহা তত সুখাদ্য হয় না। গরম গরম অবস্থায় মাফিন বেশ সুখাদ্য।

পটোল-থিচির চাকতি-ভাজা।

প্রথমে, টাট্‌কা পাকা পটোলের বিচিগুলি বাহির করিয়া রাখ। এই বিচির পরিমাণ অনুসারে আদা ও কাঁচা লঙ্কার সরু সরু কুচি কর। এখন একটি পাত্রে দধি, সফেদা এবং ময়দা মিশাও। তাহাতে পটোল-বিচি, আদা ও লঙ্কার কুচি এবং লবণ মিশাইয়া ফেটাইতে থাক। এই গোলা যেন অত্যন্ত পাতলা কিংবা অধিক ঘন না হয়।

এখন, কড়ায় করিয়া ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে চড়াও। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে এক এক ঝিনুক (পটোল-বিচি ও আদা প্রভৃতির) গোলা ঢালিয়া দাও। জ্বালে এক পিঠ শক্ত হইলে, উল্‌টাইয়া, অপর পিঠ ভাজিয়া তুলিয়া লও। গরম গরম এই চাকতি বেশ মুখ-প্রিয়।

ক্ষীর-কোপ্তা।

প্রথমে আলুগুলি জলে সিদ্ধ কর। সিদ্ধ হইলে খোসা ছাড়াইয়া মোলায়েম করিয়া বাটিয়া রাখ। কলাই-শুঁটির খোসা ছাড়াইয়া থিচ-শূন্য ভাবে বাট। খোয়া বা ডেলা ক্ষীর পিষিয়া রাখ। এখন, ঘৃতে তেজপাতা ফোড়ন দিয়া, তাহাতে কলাইশুঁটি-বাটা কসিয়া রাখ, নতুবা উহার হাল্‌সে গন্ধ যাইবে না। রুচি-অনুসারে, এই সময় সরু সরু পিঁয়াজের কুচি-ও ভাজিয়া রাখতে পার।

এখন, কলাইশুঁটি, আলু, ক্ষীর, পিঁয়াজ-ভাজা, লঙ্কা-বাটা, গরম-মসলার গুঁড়া, ভাজা ধনের গুঁড়া, ভাজা জীরার গুঁড়া, লবণ, ময়দা এবং সফেদা এক সঙ্গে চট্‌কাইয়া মাখ। উত্তমরূপ মাখা হইলে, তদ্দারা আমড়ার ন্যায় এক একটি লেচি পাকাও।

এদিকে, উনানে ঘৃত বা তৈল চড়াইয়া দাও। এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে কোপ্তাগুলি লাল্‌চে ধরণে ভাজিয়া লও। ক্ষীর-কোপ্তা গরম গরম উত্তম সুখাদ্য। শীতকালে কলাইশুঁটি উঠিয়া থাকে, সেই সময় উহা প্রস্তুত করিবার প্রশস্ত সময়। তবে, অন্য ঋতুতে তৈয়ার করিতে হইলে, শুঁটি ত্যাগ করিয়া, লিখিত অন্যান্য উপকরণে পাক করা যাইতে পারে।

মাছ টাট্‌কা রাখিবার উপায়।

বড় বড় মাছ অপেক্ষা ছোট মাছ, দুই এক দিনের জন্য ব্যবহারোপযোগী করিয়া রাখা যাইতে পারে। সচরাচর, অন্য ঋতু অপেক্ষা, শীতকালে-ই মাছ শীঘ্র পচিয়া উঠে না। শীতকালে-ই প্রয়োজন-অনুসারে আজিকার মাছ কালি ব্যবহার করিতে পারা যায়। যে মাছ বাসি রাখিবার প্রয়োজন, তাহা টাট্‌কা থাকিতে থাকিতে ভাল করিয়া, তাহার ভিতরের (পেটের) ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। পরে, মাছটি ভাল করিয়া ধুইয়া, শুষ্ক নেকড়া দ্বারা পুঁছিয়া ফেলিবে; এবং শুষ্ক খট্‌খটে স্থানে ছকে তাহা [illegible]য়া রাখিবে। মাছ পুঁছিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গে তৈল বুলাইয়া দিলে ভাল হয়। কেহ কেহ লবণ-ও মাখাইয়া রাখেন। কিন্তু, লবণ মাখাইলে, স্বাদের কিছু বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। মাছের গায়ে যেমন তৈল মাখাইতে হয়, সেইরূপ পেটের ভিতর ভিনিগার (সির্কা) মাখাইলে ভাল হয়। অর্থাৎ শীঘ্র মাছ পচিয়া উঠে না।

আজকাল, পদ্মার ইলিস মাছ, বরফে রাখিয়া, কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। বরফে রাখিলে, শীঘ্র পচিয়া উঠে না। বরফ শীঘ্র গলিয়া না যায়, এজন্য বরফের চাপে মধ্যে মধ্যে লবণ মাখাইয়া দিতে হয়।

মেষের রাঙের রোষ্ট।

পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে মেষ-মাংসের (মটনের) আদর বৃদ্ধি হইতেছে। উহার চপ, কুকেট এবং রোষ্ট প্রভৃতি আহার করিতে অনেকের-ই লালসা দেখা যাইতেছে। রোষ্ট করিয়া, মাংস আহার করা, আমাদের দেশের রীতি নহে। রোষ্ট বা ঝলসান মাংস, ইয়ুরোপীয়েরা-ই সমধিক আদর করিয়া থাকেন; আমাদের

দেশে-ও অনেকে এখন ইংরাজী ধরণে মাংসাহার পসন্দ করিতেছেন। ইংরাজেরা যেরূপ নিয়মে রোষ্ট করিয়া থাকেন, নিম্নে তাহা-ই লিখিত হইল।

মেষের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা, রাঙ্-ই রোষ্টের পক্ষে উপযুক্ত। রোষ্টের মাংস ছাড়াইবার একটা নিয়ম আছে। সচরাচর যেরূপ নিয়মে আমরা মাংস কুটিয়া থাকি, সেরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিলে, রোষ্টের মাংস তৈয়ার হয় না ; মিউনিসিপাল বাজারে, যাহারা মাংস বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বলিয়া দিলে-ই, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রন্ধনের উপযোগী, নানা প্রকারে মাংস কুটিয়া দেয়। রোষ্টের জন্য রাঙ্-ই বাছিয়া লইবে ; এই রাঙ্ উত্তমরূপে ছাড়াইয়া, আস্ত রাখিয়া দিবে। কিন্তু আস্ত থাকিলে-ও, ছুরি দ্বারা চিরিয়া, উহার ভিতরের গ্রন্থিল অংশ তুলিয়া ফেলিবে। রন্ধনের পূর্ব্বে যদি ভাল করিয়া ধোওয়া হয়, তবে শুক্‌ন নেকড়া দ্বারা তাহা পুঁছিয়া ফেলিবে। আর, রোষ্ট করিবার পূর্ব্বে, রাঙের উপর কিছু ময়দা ছড়াইয়া দিবে।

রোষ্টের পক্ষে মৃদু জ্বাল-ই প্রশস্ত ; এজন্য কাঠের আগুনে রোষ্ট করা উচিত ; নতুবা উহা কখন সুস্বাদু হয় না। রন্ধনের প্রথম অবস্থায়, মাংস-খণ্ড অগ্নির উত্তাপ হইতে কিছু দূরে রাখিতে হয় ; অর্থাৎ যেন মাংসের সকল স্থানে-ই আঁচ লাগিতে পায়। অনন্তর, যখন দেখা যাইবে যে, উহা উত্তাপে প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহা আগুনের উপর বসাইবে। চারি পাঁচ ঘণ্টায় রোষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। যখন দেখিবে, মাংস প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন বিশ ত্রিশ মিনিট উহা দমে রাখিবে, মাংস, নিজ চর্ব্বিতে সিদ্ধ হইয়া আসিবে। এইরূপে সুসিদ্ধ হইলে, উহা আগুন হইতে নামাইয়া লইবে। উনান হইতে নামাইবার পূর্ব্বে, উহাতে পরিমাণ-মত লবণ ও সামান্য পরিমাণে একটু জল আছড়াইয়া দিবে। নতুবা, মাংস একেবারে কাট কাট হইবে। অধিক জল দিলে, উহা সুস্বাদু হইবে না।

ইংরাজেরা, লিখিত নিয়মে মাংস রোষ্ট বা ঝলসাইয়া, আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু, এরূপ রন্ধন এদেশে অনেকের রসনায় আদর পায় না ; এজন্য পাকের সময় মাংসে মধ্যে মধ্যে পিয়াজ, আঁদার রস এবং দৈ দিয়া, সিদ্ধ করিলে, উহা অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু হইয়া থাকে।

চাইনা-চিলো।

উপকরণ ও পরিমাণ।—মটন (মেষমাংস) আধ সের, কলাই-শুঁটি দেড় পোয়া, ইচ্ছানুসারে শসা দুইটি, কারি-পাউডার এক চামচ, বড় পিয়াজ একটি, লবণ পরিমাণ-মত, মরীচের গুঁড়া আধ চামচ, জল পরিমিত। বিশুদ্ধ মাখন দেড় ছটাক এবং মৃদু জ্বাল অথবা দমে রাখিবার সময় দুই ঘণ্টা।

ভেড়ার পশ্চাতের অংশ বা রাং দ্বারা চাইনা-চিলো প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাংস, ছোট ছোট টুকরা করিয়া কুটিবে; মাংসের গাত্র-সংলগ্ন চর্ব্বি ইচ্ছা করিলে, পরিত্যাগ করিতে পার। মাংস কুটিয়া ডেকৃচি অথবা হাঁড়িতে রাখিবে; এবং অন্যান্য উপকরণগুলি মাংসের উপর ঢালিয়া দিবে। এখন পাক-পাত্রটি মৃদু আঁচে স্থাপন করিবে। মাংস গরম হইলে, হাতা বা খুন্তি দ্বারা একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। চাইনা-চিলো দমে পাক করিলে-ই ভাল হয়, নতুবা একখানি কাঠের মৃদু-জ্বালে রন্ধন করিবে। এরূপ আগুনের দমে রাখিবে, যেন হাঁড়ির মধ্যস্থ মাংস খুব ধীরে ধীরে ফুটি[illegible] থাকে। দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত দমে ফুটিতে পারে, এরূপ নিয়মে আগু[illegible]বন্দোবস্ত করিবে।

চাইনা-চিলো অত্যন্ত বল-কারক অথচ ল[illegible]ক খাদ্য। অনেকে, অধিক পরিমাণে ঘৃত ও মসলা ব্যবহার না করিয়া, মাংস খাইতে ভাল বাসেন না; কিন্তু মাংসে যত অল্প ঘৃত মসলা ব্যবহৃত হয়, তত-ই উহা লঘু-পাক ও উপকারী হইয়া থাকে। অধিক পরিমিত ঘৃত-মসলায় মাংস গুরু-পাক হয়। সে যাহা হউক, ভোক্তাদিগের রুচি-অনুসারে, চাইনা-চিলোয় কারি-পাউডার অথবা গরম মসলা ব্যবহার করিতে পারা যায়।

পোলাও অথবা সাদা ভাতের সহিত চাইনা-চিলো ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পক্ষি-শাবকের কট্‌লেট।

যে সকল পাখী আহারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই সকল পক্ষি-শাবকের মাংসে কট্‌লেট প্রস্তুত করিলে, তাহা অতি উপাদেয় হয়। কট্‌লেটের পক্ষে কোমল মাংস-ই প্রশস্ত।

প্রথমে পাখীর পালকাদি ছাড়াইয়া, ফুটন্ত জলে, তাহার পা ধরিয়া, দুই তিন

মিনিট ডুবাইয়া রাখিলে-ই, সহজে গায়ের চামড়া পরিষ্কৃত হইবে। এইরূপে চামড়া ছাড়াইয়া, পাখীটিকে খণ্ডাকারে কাটিবে; এবং যত্ন-সহকারে, পাঁজরা, রাং ও সন্ধি-স্থানের হাড়গুলি ছাড়াইয়া, মাংস উত্তমরূপে থুরিবে। এখন এই থোরা মাংসে পরিমাণ-মত লবণ, আদার রস, জায়ফলের গুঁড়া, মরীচের গুঁড়া এবং ইচ্ছানুসারে পিয়াজ ও রসুনের রস, * ভাল করিয়া মাখাইবে। মসলা মাখাইবার সময় যে, কট্‌লেটের আকারে মাংস কাটিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে।

এদিকে, পাক-পাত্রে ঘৃত জ্বালে চড়াইবে। মৃদু আঁচে যে, মাংস উত্তমরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা যেন মনে থাকে। অনন্তর, এক এক খণ্ড মাংস ডিমের তরলাংশে ডুবাইয়া, তাহাতে বিস্কুট অথবা পাঁউরুটির গুঁড়া মাখাইয়া, উনান-স্থিত ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। কট্‌লেট গরম গরম উত্তম সুখাদ্য। ইচ্ছা হইলে, আহারের সময়, কট্‌লেটে রাই-সরিষার (মষ্টার্ড) গুঁড়া মাখাইয়া, আহার করা যাইতে পারে। মষ্টার্ডে পরিমাণ-মত জল ও লবণ গুলিয়া, পাতলা করিয়া লইলে-ই, খাদ্যের উপযুক্ত হয়।

পায়রা রোষ্ট।

রোষ্ট করিবার পক্ষে টাট্‌কা মাংস-ই উত্তম। এ জন্য, যে কোন পক্ষী রোষ্ট করিতে হইলে, পাখীটি মারিয়া-ই, টাট্‌কা থাকিতে থাকিতে, পালকাদি পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। পাখীর পালক ও চর্ম্ম ছাড়াইয়া, তাহার পেট চিরিয়া, ভিতরের ময়লা বাহির করিয়া ফেলা আবশ্যক। অনন্তর, পাখীর মাথা ও গর্দ্দানা এবং পায়ের থাবা কাটিয়া ফেলিবে। এখন পাখীর পা দুইখানি পশ্চাৎদিকে বাঁকাইয়া দিয়া, তাহার গায়ে মাখন বা ঘৃত মাখাইয়া দিবে।

এদিকে, পাক-পাত্র জ্বালে বসাইবে, এবং তাহা গরম হইলে, তদুপরি পাখীটি স্থাপন করিবে। জ্বালের অবস্থায়, মধ্যে মধ্যে আদা ও পিয়াজের রসে লবণ গুলিয়া, পাখীর গায়ে দিতে থাকিবে। প্রয়োজন বুঝিয়া, মধ্যে মধ্যে আবার, মাখন বা ঘৃত এবং জলের ছিটা-ও দিতে হইবে। পাকের সময়, দুই একবার

* পরিত্যাগ করিলে-ও চলিতে পারে।

যে, পাখীটি উল্‌টাইয়া দিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিলে মাংস উত্তমরূপ সুসিদ্ধ হইয়া আসিবে। সুসিদ্ধ হইলে, উনান হইতে নামাইয়া লইবে।

রোষ্ট-পাখী ছুরি দ্বারা কাটিয়া, মাষ্টার্ড মাখাইয়া, আহার করিতে হয়। রুচি-অনুসারে আবার, পাখীর পেটের ভিতর আলুর পূর পূরিয়া, সেলাই করিয়া দিতে পারা যায়। রোষ্ট মাংসে প্রায়-ই কোন প্রকার মসলা ব্যবহার হয় না; এজন্য, উহা গুরু-পাক খাদ্য নহে, সহজে হজম হইয়া থাকে। রোষ্ট এক প্রকার ঝলসান মাংস বিশেষ।

আলুর ঝালফুলুরি।

এই ফুলুরি, গরম গরম বেশ সুখাদ্য। ভোক্তাদিগের রুচি-অনুসারে ইহা ঝাল এবং মিঠা, উভয় প্রকারে-ই পাক করা যাইতে পারে। মিষ্ট আস্বাদের করিতে হইলে, লঙ্কা ব্যবহার না করিয়া, চিনি কিংবা গুড়, গোলায় ব্যবহার করিতে হয়।

প্রথমে, আলু জলে সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইল, জ্বাল হইতে নামাইয়া, তাহার খোসা ছাড়াইয়া, খিচ-শূন্য করিয়া চট্‌কাইয়া কিংবা বাটিয়া লইবে। এখন এই আলুতে সফেদা, লবণ, লঙ্কা-বাটা এবং জল মিশাইয়া ফেটাইবে। উত্তমরূপ ফেটান হইলে, ফুলুরির গোলা প্রস্তুত হইল।

এদিকে, একখানি কড়াতে ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে চড়াইয়া দাও। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে এক একটি ফুলুরি ছাড়িতে আরম্ভ কর; পাকে লালচে রঙের হইলে, ঝাঁঝরি করিয়া তুলিয়া লইয়া, পরিবেষণ কর। এই ফুলুরি অত্যন্ত মোলায়েম অথচ মোচক হইয়া থাকে।

ডুমুরের ক্রুকেট।

প্রথমে, কচি কচি ডুমুর বাছিয়া লইবে। পাকা ডুমুর, খাইতে তত সুখাদ্য নহে; এজন্য যে কোন খাদ্যে কচি ডুমুর ব্যবহার করিবে। ডুমুরগুলি হয় আস্ত, নতুবা দুখানি করিয়া কাটিয়া, জলে ফেলিবে। এইরূপে

সমুদয় ডুমুর কুটা হইলে, জল হইতে তুলিয়া, একটি হাঁড়িতে জল-সহ জ্বালে বসাইবে, এবং সুসিদ্ধ হইলে, উনান হইতে নামাইয়া লইবে। ঠাণ্ডা হইলে, শিলে বাটিয়া, অন্য পাত্রে রাখিবে। এই সময়, বাটা-ডুমুরের পরিমাণ বুঝিয়া, লঙ্কা * ও আদা বাটিয়া রাখ।

এদিকে, পাক-পাত্রে ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া দাও, এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে ময়দা দিয়া নাড়িতে চাড়িতে থাক; লাল্‌চে বর্ণ হইলে, ডুমুর-বাটা ঢালিয়া দাও। অনন্তর, তাহাতে লবণ এবং মরীচের গুঁড়া দিয়া, ভাজিয়া, নামাইয়া রাখ। হাত-সওয়া ঠাণ্ডা হইলে, এই ভাজা বা কসা-ডুমুর-বাটা হইতে এক একটি লেচি কাট, এবং তাহা পান্তোয়ার মত লম্বা আকারে গঠন কর। এইরূপে সমুদয় প্রস্তুত করিয়া রাখ।

এখন, দধি, লঙ্কার গুঁড়া এবং সামান্য-পরিমাণ লবণ এক সঙ্গে গুলিয়া, ফেটাইয়া লও। এদিকে, একখানি তৈ উনানে বসাও, এবং তাহাতে ঘৃত কিংবা খাঁটি সরিষার তৈল ঢালিয়া দাও। যখন দেখিবে, উহার গাঁজা মরিয়া আসিয়াছে, তখন গঠিত [illegible] একটি ক্রুকেট, দৈ-গোলাতে ডুবাইয়া তুলিয়া, চপের ন্যায় সুজি মাখাইয়া, [illegible] তাতে ভাজিয়া, তুলিয়া রাখ। এইরূপে সমুদয় ক্রুকেটগুলি ক্রমে ক্রমে ভাজিয়া লও এবং গরম গরম আহার করিয়া দেখ।

ভোক্তাদিগের রুচি-অনুসারে, লঙ্কা ও পিঁয়াজের পরিমাণ-অল্পাধিক ব্যবহার করিবে।

কাঁটালের ভূতি ভাজা।

সচরাচর, কাঁটালের ভূতি, প্রায়-ই ফেলিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু উহা দ্বারা নানা প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাঁটালের ভূতি বা মা'জ কাহাকে কহে, তাহা এদেশে সকলে-ই জানেন। এই ভূতি চাকা চাকা করিয়া

---

* ফুলুরি কিংবা কোপ্তা বা চপে, কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার করিলে, এক প্রকার সুখাদ্য হইয়া থাকে। কাঁচা লঙ্কার অভাবে, শুষ্ক লঙ্কা ব্যবহার করিবে। আর রুচি-অনুসারে পিঁয়াজ-বাটা-ও ব্যবহার করিতে পার।

কুটিবে। সমুদয় কুটা হইলে, তাহা হরিদ্রা-জলে ডুবাইয়া, সিদ্ধ করিবে। জ্বালে সুসিদ্ধ হইলে, নামাইয়া, জল ঝরাইয়া লইবে।

জল ঝরিয়া গেলে, তাহাতে পরিমাণ-মত লবণ, হরিদ্রা এবং লঙ্কার গুঁড়া বা বাটা মাখাইবে। পরে, তাহা তৈলে সামান্যরূপ ভাজিয়া, উহার গন্ধ মারিয়া নামাইবে।

এদিকে, পরিমাণ-মত বেসন সফেদা, লঙ্কা-বাটা, বা গুঁড়া, লবণ এবং জল এক সঙ্গে মিশাইয়া, খুব ফেটাইয়া লইবে। অনন্তর, এক একখানি চাকা, এই গোলাতে ডুবাইয়া, ঘৃতে কিংবা তৈলে ভাজিয়া লইলে, কাঁটালের ভূতি-ভাজা হইল। এস্থলে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, এক সঙ্গে সমুদয়গুলি না ভাজিয়া, এক এক খোলায় অল্প করিয়া ভাজিবে। কারণ, অনেক সময় দেখা যায়, ভাজার দোষে খাদ্য-দ্রব্য নষ্ট হইয়া থাকে।

নটেশাকের বেসনী।

পাকা নটে অপেক্ষা, কচি কচি নটে-শাক দ্বারা বেসনী ভাল হইয়া থাকে। পাতা-সহ নটে শাক বাছিয়া লইবে। এখন, এক কিংবা আধ আঙুল লম্বা করিয়া, শাকগুলি কাটিয়া রাখিবে। কাটিবার সময়, প্রত্যেক ডাঁটার মাথায় যেন পাতা থাকে। এখন, ভাসা-জলে শাকগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া, চুবড়িতে রাখিবে। অল্পক্ষণ রাখিলে, জল ঝরিয়া যাইবে।

এদিকে, শাকের পরিমাণ বুঝিয়া, ময়দা লইয়া, তাহাতে একটু ময়ান মাখাইবে। এখন, এই ময়দার সহিত বেসন মিশাইয়া, জলে গুলিবে। জলে গুলিলে যে গোলা প্রস্তুত হইবে, তাহাতে পরিমাণ-মত লঙ্কার কুচি বা গুঁড়া, আদার কুচি বা বাটা, আস্ত জীরা এবং লবণ দিয়া খানিক ফেটাইবে। ভালরূপ ফেটাইলে, গোলা তৈয়ার হইবে।

এই সময়, উনানে ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে বসাইবে এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, ধৌত নটের দুই চারি গাছি গোলাতে ডুবাইয়া, তাহাতে ভাজিয়া লইবে। এইরূপে, নটের সমুদয় বেসনীগুলি ক্রমে ক্রমে ভাজিয়া লইবে। গরম গরম আহার করিয়া দেখ, উহা কেমন সুখাদ্য।

পাকা পেঁপের বড়া।

এই বড়া বা ফুলুরি উত্তম সুখাদ্য; তালফুলুরির ন্যায় উহা পীড়াদায়ক নহে। কাঁচা ও পাকা উভয় প্রকার পেঁপে-ই খাদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ রোগে কাঁচা পেঁপের ডাল্‌না, ও জলপানে পাকা পেঁপে আহার করিলে, কোষ্ঠ সরল হয়। পূর্ব্ব-প্রকাশিত পাক-প্রণালীতে পেঁপের ডাল্‌না, ও পাকা পেঁপের মোহনভোগ প্রস্তুতের নিয়ম লিখিত হইয়াছে; এক্ষণে পেঁপের বড়া বা ফুলুরি-পাকের প্রণালী লিখিত হইতেছে।

প্রথমে, পেঁপের খোসা পরিষ্কৃত করিবে। এখন, পেঁপেটি লম্বা ভাবে চিরিয়া, বিচি ফেলিয়া, জলে ধুইয়া লইবে। অনন্তর, তাহা জলে সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে, নামাইয়া রাখিবে; এবং ঠাণ্ডা হইলে, তাহা চট্‌কাইবে। এখন, উহাতে পরিমাণ-মত সফেদা, ময়দা, খোসা-তোলা তিল, গোলমরীচ-চূর্ণ, গরম মসলার গুঁড়া, লবণ এবং চিনি মিশাইবে।

এদিকে, পাক-পাত্রে [illegible]ত অথবা তৈল জ্বালে চড়াইবে; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে এক উ[illegible]ভাবে করিয়া বড়া ছাড়িতে আরম্ভ করিবে। এক খোলা ছাড়া হইলে, বড়ার [illegible] পিঠ শক্ত অর্থাৎ ভাজা হইলে, অপর পিঠ উল্টাইয়া দিবে। দুই পিঠ বেশ খড়্‌খড়ে ভাজা হইলে, ঝাঝরা-হাতায় করিয়া ঘৃত বা তৈল ঝাড়িয়া, পাত্রান্তরে তুলিয়া লইবে। গরম গরম বেশ সুখাদ্য হইবে।

ফলের জেলি।

উপকরণ ও পরিমাণ।—ফল পাঁচ পোয়া, চিনি পাঁচ ছটাক, উত্তাপ দশ মিনিট, তৎপরে উত্তাপ আট দশ মিনিট, দুইটি লেবুর রস।

উত্তম উত্তম রসাল টাট্‌কা ফল সংগ্রহ করিয়া, জেলি প্রস্তুত করিতে হয়; এক-জাতীয় কিংবা বিভিন্ন প্রকারের নানাবিধ সুপক্ক ফল একত্র করিয়া-ও, জেলি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ফলের জেলি অতি উপাদেয় ও সুখ-সেব্য খাদ্য; এবং ইহার গুণ-ও অশেষ। যে কোন ফলের সারাংশ লইয়া-ই এই রসনা-তৃপ্তি-কর খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি সকলের মধ্যে, জেলির যার-পর-নাই আদর।

ফলের জেলি অতি পবিত্র ; সুতরাং উহা প্রস্তুত করিবার নিয়ম শিখিলে, হিন্দু-গৃহে উহার প্রচলন হইতে পারে। বিশেষতঃ, এদেশে যে সকল ফল পাওয়া যায়, তৎসমুদয় স্বভাবতঃ-ই অতি উপাদেয় ; তদ্দারা আবার জেলি প্রস্তুত করিলে, নূতন একটি খাদ্যের আস্বাদন দ্বারা রসনার আনন্দ বৃদ্ধি হইতে পারে।

যে ফলের জেলি হইবে, তাহা পরিপুষ্ট, টাট্কা এবং অত্যন্ত রসাল হওয়া উচিত। আম, জাম, আপেল, লিচু, জামরুল প্রভৃতি ফল-সমূহ দ্বারা উৎকৃষ্ট জেলি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে নিয়মে ফলের জেলি প্রস্তুত করিতে হয়, নিম্নে তাহা পাঠ কর।

ভাল ভাল টাট্কা ফল জেলির জন্য সংগ্রহ কর। এখন, প্রত্যেক ফলের বোঁটা ও খোসা বা খোলা উত্তমরূপে ছাড়াইয়া ফেল। অনন্তর, একটি পরিষ্কৃত বড় জারের মধ্যে, ছাড়ান ফলগুলি ভাল করিয়া পাতাইয়া রাখ। ফলগুলি পাতান হইলে, তাহার উপর পরিষ্কৃত ঠাণ্ডা জল এরূপ নিয়মে ঢালিয়া দিবে, যেন ফলগুলি ডুবিয়া থাকে।

এদিকে, জল-সহ একখানি বড় কড়া জ্বালে চড়াও ; কড়ার জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে, তাহার উপর জারটি বসাইয়া দাও ; এবং মৃদু মৃদু জ্বাল দিতে থাক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফলগুলি বেশ সুসিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ পাক-পাত্র উনানে বসাইয়া রাখ।

যখন দেখিবে, জ্বালে ফলগুলি সুসিদ্ধ হইয়াছে, তখন পাক-পাত্রটি জ্বাল হইতে নামাও। অনন্তর, জেলি-ব্যাগ অর্থাৎ যে বস্ত্র-খণ্ডে জেলি ঢালিতে হইবে, তাহাতে ফলগুলি ঢালিয়া দাও। যেরূপ নিয়মে কোন প্রকার যূষ কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হয়, সেইরূপ নিয়মে বস্ত্র-খণ্ডের (জেলি-ব্যাগ) নিম্নে একটি পাত্র স্থাপন কর, তাহাতে ফোটা ফোটা করিয়া রস পড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে, আর রস পড়িতেছে না, তখন পাত্রস্থ রস ওজন কর ; যদি-ও এই রসের পরিমাণ অল্প হইবে, কিন্তু তাহা যার-পর নাই সুখ-সেব্য হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন, এই রস, মৃদু জ্বালে দশ মিনিট পাক করিতে থাক ; দশ মিনিটের পর, আগুন হইতে পাক-পাত্রটি নামাইয়া, রস উত্তমরূপে নাড়িতে থাক। নাড়িবার সময়, তিন পোয়া রসে দেড় ছটাক

চিনির হিসাবে, পরিষ্কৃত চিনি ঢালিয়া দাও; * কিন্তু অনবরত নাড়িতে থাক। রসে চিনি মিশাইয়া, পুনর্ব্বার তাহা জ্বাল দিতে থাক। অল্পক্ষণ পরে, রস হইতে গাদ উঠিতে থাকিবে, তখন তাহা যত্ন-সহকারে তুলিয়া ফেলিয়া দাও। অনন্তর, উনান হইতে নামাইয়া, বোতল প্রভৃতি কোন পরিষ্কৃত পাত্রে তুলিয়া রাখ। তিন পোয়া পরিমিত জেলিতে, একটি পাতি কিংবা কাগজি লেবুর রস মিশাইয়া, বোতলে রাখ। আগুন হইতে নামাইয়া এবং বোতলে তুলিবার দুই তিন মিনিট পূর্ব্বে লেবুর রস দেওয়া বিধি।

ওলের ভর্ত্তা।

ওলের একটি নাম শূরণ। ওল অত্যন্ত উপকারী তরকারি। ওল ভাতে, পোড়া, ডাল্না এবং আচার প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্শ রোগের পক্ষে উহা অত্যন্ত উপকারী। শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ওল খাইবার প্রশস্ত সময়।

প্রথমে, ওলের খোসা ছাড়াইয়া, মাঝারি আকারে এক একটি খণ্ড কর। পরে, তাহা জলে সিদ্ধ কর। সুসিদ্ধ হইলে, নামাইয়া রাখ। হাত-সওয়া গরম থাকিতে থাকিতে, তাহাতে খাঁটি সরিষার তৈল, সরিষা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, আদা-বাটা, লেবুর রস এবং লবণ মাখাইয়া চট্‌কাইয়া লও, তাহা হইলে-ই ওলের ভর্ত্তা প্রস্তুত হইল। ওল, ভাতের সহিত সিদ্ধ করিলে, ভাত ময়লা হইতে পারে, এজন্য স্বতন্ত্র সিদ্ধ করা-ই ভাল।

ভর্ত্তার ন্যায়, ওল পোড়াতে-ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ ওলের উপর মাটির লেপ দিয়া-ও পোড়াইয়া থাকেন। ভর্ত্তার ন্যায়, উহাতে সরিষাদি মাখাইয়া লইবে।

ওল দীপন, রুক্ষ, কষায়, কণ্ডুজনক, কটু, বিষ্টম্ভকারক (ভার), বিশদ, রুচিকর, লঘু, কফঘ্ন, প্লীহা ও গুল্ম রোগের বিনাশক, অর্শ রোগের ঔষধ ও পথ্য। দদ্রু, রক্তপিত্ত এবং কুষ্ঠ রোগীর পক্ষে ইহা উপকারী নহে। †

---

* উৎকৃষ্ট রিফাইণ্ড চিনি হইলে ভাল হয়।

† শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডুকৃৎ কটুঃ।
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘু (ভার)।

পোস্ত চচ্চড়ি।

বর্ষাকালে তরকারির অভাব ঘটিলে, গৃহস্থ গৃহে পোস্ত এবং তিল প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জন পাক হইয়া থাকে। পোস্তের ব্যঞ্জন খাইতে মন্দ নহে।

পোস্তের সহিত কাঁকর প্রভৃতি দূষিত পদার্থ থাকে, এজন্য উহা ভাল করিয়া ধুইয়া লইতে হয়। বাটীতে জল রাখিয়া, অতি সাবধানতার সহিত, উপর হইতে দানাগুলি তুলিয়া লইবে, বালি কিংবা কাঁকর নীচে পড়িয়া থাকিবে। এইরূপ নিয়মে দুই তিনবার ধুইলে, বেশ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে। এখন, পোস্তগুলি শিলে বাটিয়া লইবে।

তৈল-সহ পাক-পাত্র উনানে চড়াইবে। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে বড়ি ভাজিয়া, তুলিয়া রাখিবে। অনন্তর, অবশিষ্ট তৈলে লঙ্কা ও পাঁচফোড়ন সম্বরা দিয়া, তাহাতে ব্যঞ্জনের আলু ছাড়িয়া দিবে। আলু আধ-কসা হইয়া আসিলে, তাহার উপর পোস্ত-বাটা ঢালিয়া দিবে। এই সময় হইতে সর্ব্বদা নাড়িতে থাকিবে; বেশ লাল্‌চে রং হইলে, হলুদ-বাটা জলে গুলিয়া, তাহাতে ঢালিয়া দিবে। একবার ফুটিয়া আসিলে, লবণ ও লঙ্কা-বাটা দিয়া, আর একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। ক্রমে জল মরিয়া আসিলে, নামাইয়া লইবে। পোস্তের ব্যঞ্জনে তৈল একটু অধিক দিলে, উহা বেশ সুস্বাদু হইয়া থাকে।

পটোলের নৃপবল্লভ।

প্রথমে পুষ্ট টাট্‌কা পটোলের খোসা উত্তমরূপে ছাড়াইয়া, লম্বা-লম্বি-ভাবে তাহা চের। এই চেরা-পটোলের বিচি ফেলিয়া দাও।

এদিকে, মোচা, ইঁচড় অথবা আলু ছাড়াইয়া, জলে সিদ্ধ করিয়া রাখ। ঠাণ্ডা হইলে, বাটিয়া, তৈল কিংবা ঘৃতে কসিয়া লও। কসার অবস্থায় ইঁচড় বা মোচা

বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহাগুল্মবিনাশনঃ।
সর্ব্বেষাং কন্দ-পাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
দদ্রুণাং রক্তপিত্তানাং কুষ্ঠানাং ন হিতো হি সঃ॥ (ভাব প্রকাশ।)

অথবা আলুর পরিমাণ বুঝিয়া, তাহাতে কাঁচা লঙ্কার কুচি, জীরা-ভাজার গুঁড়া এবং লবণ দিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া কসিয়া নামাও।

এখন, চেরা-পটোলের আধখানায়, এই পুর পুরিয়া, অপরার্দ্ধ দ্বারা ঢাকিয়া রাখ। এইরূপে, সমুদয় পটোলের যোড় মিল করিয়া, থালার উপর সাজাইয়া রাখ। অনন্তর, পটোলের পরিমাণ অনুসারে সফেদা ও খাসা ময়দা এক সঙ্গে মিশাইয়া, তাহাতে ঘৃতের ময়ান রাখ। এই ময়ান-দেওয়া ময়দা, দধিতে গুলিতে থাক; প্রয়োজন হইলে, সামান্য-পরিমাণ জল মিশাইতে-ও পার। গোলা যেন খুব ঘন কিংবা পাতলা না হয়। গোলা ফেটাইবার সময়, তাহাতে অল্প পরিমাণে জায়ফলের গুঁড়া ও লবণ মিশাইয়া লইবে। এখন, বেগুনি ভাজার ন্যায়, এক একটি পটোল গোলায় ডুবাইয়া, ঘৃত অথবা তৈলে ভাজিয়া লও, নৃপবল্লভ পাক হইল। সাধারণ পটোল-ভাজা অপেক্ষা ইহা যে, অতি উপাদেয় মুখ-রোচক খাদ্য, তাহা একবার পরীক্ষা করিলে-ই বুঝিতে পারা যায়। পটোলের ন্যায়, করলা ও ঝিঙ্গের ভিতর এইরূপ 'পুর' পুরিয়া, প্রস্তুত করিতে পারা যায়। মোচা, ইঁচড়, অথবা আলু, যে কোন তরকারী দ্বারা নৃপবল্লভ প্রস্তুত করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে পাক হইলে, আস্বাদের-ও ভিন্নতা হইয়া থাকে।

ছানার রমণ চাকৃতি।

নিরামিষ-ভোজীর পক্ষে ছানার এই রমণ চাকৃতি অতি উপাদেয় খাদ্য। ইহাকে নিরামিষ কট্‌লেট বলিলে-ও, বড় দোষ হয় না। একটু অম্ল-রস-বিশিষ্ট ছানা দ্বারা এই খাদ্য প্রস্তুত করিলে, অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু হইয়া থাকে। মিষ্ট দ্রব্য ভিন্ন, ছানার দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জন ও ভাজা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছানায় কালিয়া, কোর্ম্মা, কট্‌লেট এবং চপ্ প্রভৃতি বহুবিধ নিরামিষ খাদ্য পাক করিতে পারা যায়।

প্রথমে, ছানার জল নিংড়াইয়া লইবে। জল নির্গত হইলে, চন্দনের মত করিয়া, ছানা চট্‌কাইয়া বা বাটিয়া লইবে। এখন, তাহাতে আদার রস, * জায়ফল, লবঙ্গ ও দারচিনির গুঁড়া, লঙ্কা-বাটা বা গুঁড়া, লবণ এবং সফেদা মিশাইয়া, দলিয়া বা মাখিয়া লইবে।

* রুচি অনুসারে এই সময় পিয়াজের রস-ও মিশাইতে পার।

ভিতরে পূর দেওয়ার জন্য পুদিনা, ধনে শাক, কাঁচা লঙ্কা এবং অল্প তেঁতুলের মাড়ি এক সঙ্গে মিশাইবে। শাক ও লঙ্কা খুব মিহি করিয়া কুচাইয়া লইবে। পরে, তাহাতে অল্প চিনি ও লবণ মিশাইয়া চট্‌কাইয়া, কাদার মত করিবে।

এখন, পূর্ব্ব-প্রস্তুত ছানার এক একটি গুছি কাটিয়া, রসগোল্লার ন্যায় গোল করিবে, এবং টিপিয়া তাহার মধ্যে একটি গর্ত্ত করিবে। এই গর্ত্তে, শাকের পূরের সঙ্গে দুই একটি কিসমিস দিয়া, উহা পাকাইয়া গোল বা বাদামী যে কোন আকারে গড়াইয়া রাখিবে।

এদিকে ভাজিবার জন্য ঘৃত জ্বালে চড়াইবে। এই ঘৃতে পরিমাণ-মত চাকৃতি ছাড়িয়া দিবে। ঘৃতে দুই পিঠ উত্তমরূপ ভাজা হইলে, তুলিয়া লইবে। এইরূপে সমুদয়গুলি ক্রমে ক্রমে ভাজিয়া লইবে। যদি এককালে অনেকগুলি চাকৃতি ভাজার দরকার হয়, তবে ঘৃতের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, অর্থাৎ ঘৃতে ছানার কুচি প্রভৃতি পড়িয়া, যে খাঁকরি পড়িবে, তাহা তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। কারণ, তদ্দ্বারা ঘৃতের রঙ্‌ ময়লা হইবার সম্ভাবনা। ময়লা ঘৃতে ভাজিলে, ভাজা দেখিতে কাল হইবে।

অন্নের মণ্ড পাক।

রোগীর পথ্যে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন মিহি অর্থাৎ দাদখানি প্রভৃতি চাউল-ই পথ্যের উপযুক্ত। প্রথমে, চাউল বেশ করিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া, ভাসা জলে উত্তমরূপে কচলাইয়া ধুইবে।

এখন, একটি পরিষ্কৃত হাঁড়িতে জল জ্বালে চড়াইবে। যে পরিমাণ চাউল, তাহার চৌদ্দগুণ জল দিবে; অর্থাৎ চাউল এক ছটাক হইলে, চৌদ্দছটাক জল হাঁড়িতে দিবে। জ্বালে জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে, তাহাতে ধৌত চাউলগুলি ঢালিয়া দিবে। হাঁড়িতে চাউল দিয়া, শরা দ্বারা পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। এস্থলে ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, মাটির পাত্র-ই পথ্য-রন্ধনের পক্ষে উপযুক্ত। জ্বালে ভাত সুসিদ্ধ হইলে, অর্থাৎ গলিয়া আসিলে, হাঁড়িটি উনান হইতে নামাইবে, এবং হাঁড়ির মুখে শরা ঢাকা দিয়া, উপুড় করিয়া দিবে, সমুদয় ফেন বাহির হইয়া পড়িবে। এখন, ভাতে অল্প পরিমাণে গরম জল

ঢালিয়া দিয়া, তাহা একবার চট্‌কাইয়া লইবে। * অনন্তর, উহা পরিষ্কৃত সরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে, যে মণ্ড বা মাড় বাহির হইবে, তাহা-ই রোগীর পথ্যে ব্যবহার করিবে। চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে, এই মণ্ডতে কাগজি বা পাতি লেবুর রস, শিঙ্গি বা মাগুর মাছের ঝোল, গাঁদালের ঝোল মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিবে। অগ্নি-বৃদ্ধির জন্য, কোন কোন চিকিৎসক উহাতে আবার সামান্য সৈন্ধব লবণ এবং শুঁঠ মিশাইয়া-ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-মতে মণ্ড ধারক, লঘু, শীতল, অগ্নির উদ্দীপক, ধাতু-সাম্য-কারী, জ্বর-নাশক, তৃপ্তি-জনক, বল-কারক, আর পিত্ত, শ্লেষ্মা ও শ্রমের শান্তি-কারক। †

মধুরার্দ্রক।

প্রথমে, আদার খোসা ছাড়াইয়া, তাহার সরু সরু খণ্ড করিবে। এখন, তাহাতে লবণ মাখাইয়া রাখিবে।

এদিকে, চিনির রস প্রস্তুত করিয়া, তাহা জ্বালে চড়াইবে। দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, তাহাতে [illegible] কিংবা পাতি লেবুর রস ঢালিয়া দিবে। যে পরিমাণ চিনির রস, তাই [illegible] সিকি পরিমিত লেবুর রস দিবে। পাকে উহা অর্দ্ধেক মরিয়া আসিলে, তাহাতে জাফরান-বাটা মিশাইয়া দিবে। এখন রসে আদাগুলি ঢালিয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে।

অনন্তর, উনান হইতে পাক-পাত্র নামাইয়া রাখিয়া, অপর একটি পাত্রে ঘৃত জ্বালে চড়াইবে, এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে রস-সহ আদা ঢালিয়া দিবে। দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ঘন হইয়া আসিলে, তাহা নামাইবে। পরে, তাহাতে গন্ধদ্রব্য-চূর্ণ দিয়া, একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া, ঢাকিয়া রাখিবে। এইরূপ পাক-করা আদাকে মধুরার্দ্রক কহে।

রোগীর পথ্যে মধুরার্দ্রক ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আদা অত্যন্ত উপ-কারী। শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে, অর্থাৎ সর্দ্দি কাসিতে, আদা খাইলে উপকার হইয়া থাকে।

---

* ফেন ফেলিয়া দিয়া, অর্থাৎ ফেনে ভাত না চট্‌কাইয়া, গরম জলে চট্‌কাইলে, তাহা গুরু-পাক হইবে না। ফেন অত্যন্ত গুরু-পাক খাদ্য। এজন্য খিচুড়ি, ফেন্‌সা-ভাত গুরু-পাক; অতএব, উহা রোগীর পথ্যে ব্যবহার করা উচিত নহে।

† মণ্ডোগ্রাহী লঘুঃ শীতো দীপনো ধাতুসাম্যকৃৎ।
জ্বরঘ্নস্তর্পণো বল্যঃ পিত্তশ্লেষ্মশ্রমাপহঃ॥ (ভাব প্রকাশ।)

পাক-প্রণা

আর্য্য-জাতির খাদ্য। *

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, পরিদৃষ্ট হয় যে, অন্যান্য বিদ্যার ন্যায়, এদেশে খাদ্যাদির গুণ-বিচার-সহ রন্ধন-বিদ্যার-ও সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল। মনীষাসম্পন্ন আর্য্য-ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন, মানবের শৌর্য্য-বীর্য্য ও পরমায়ু খাদ্য দ্রব্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। এজন্য তাঁহারা আহার্য্য দ্রব্যাদি নির্দ্ধারণ ও রন্ধনের সুব্যবস্থা বিষয়ে বিশেষরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন

* এই প্রবন্ধের লিখিত বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য, যে সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাদি হইতে মতামত গ্রহণ করিয়াছি, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের প্রতি হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

করিয়া গিয়াছেন। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" আর্য্য জাতির ইহা অতি প্রাচীন কথা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপাদান মানব-জীবন; সেই জীবন আবার খাদ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। আর্য্য-চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিশারদ মহর্ষি সুশ্রুত নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"প্রাণিনাং পুনর্ম্মূলমাহারো বলবর্ণৌজসাঞ্চ"; অর্থাৎ কেবলমাত্র আহার-ই প্রাণিগণের জীবন-রক্ষার এবং বল, বর্ণ ও তেজের একমাত্র নিদান। অতএব, দেহ-রক্ষা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে আহারের সুব্যবস্থা করা আবশ্যক। আবার আহারের সুব্যবস্থা করিতে হইলে, খাদ্য-দ্রব্য নিরূপণ এবং রন্ধন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

পৃথিবীর বাল্য ইতিহাস অনুশীলন করিলে, পরিলক্ষিত হয় যে, যে দেশে প্রথমে বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইয়াছিল,—সভ্যতার বিমল আলোক-মালায় দশ দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছিল,—মানবগণ মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিল, সেই দেশে-ই সর্ব্বাগ্রে খাদ্য ও পাক সম্বন্ধে ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে ভারত অতি প্রাচীন সভ্য দেশ; ভারতে অতি পূর্ব্ব কাল হইতে রসনা-তৃপ্তি-কর নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যাদির প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, আপামর সাধারণকে অন্ন-দান করা, হিন্দু-জাতির একটি পরম পবিত্র ধর্ম্ম। অন্ন-দানের যে কি মাহাত্ম্য, তাহা পৃথিবীর মধ্যে ভারত-ই প্রথমে বুঝিতে পারিয়াছিল। ভারতের প্রতিগৃহ অতিথিশালা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতিথি বিমুখ হইলে, তাহার পাপ গৃহীর প্রতি অর্শিবে, এবং গৃহস্থের পুণ্যের ভাগ অতিথি লাভ করিবে, যে দেশে, যে জাতির শাস্ত্রের এরূপ বিধান, এবং হৃদয়ের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, সে দেশে, সে জাতির মধ্যে অন্নদান-প্রথা যে, কত দূর প্রচলিত ছিল, তাহা অনায়াসে-ই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। হিন্দুজাতির মধ্যে এমন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান-ই নাই যে, তাহাতে অন্ন-দানের পবিত্র প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্ন-দান সম্বন্ধে আর্য্য-জাতির বিশ্বজনীন উদারতার প্রমাণ-গুলি এখন পর্য্যন্ত-ও ভারত-বক্ষে অবিনশ্বর স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে। তাঁহারা কেবলমাত্র মানবজাতিকে অন্ন-দান করিয়া, নিরস্ত থাকিতেন না; তাহার প্রমাণ দেখুন ঃ—

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসংঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তং॥
পিপীলিকা-কীট-পতঙ্গকাদ্যা বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং মুদিতা ভবন্তু॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥
যে চান্যে পতিতাঃ কেচিদপাত্রাঃ পাপযোনয়ঃ॥

অর্থাৎ দেবতা, মনুষ্য হইতে কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষাদি এবং বন্ধু-বান্ধব-বিহীন, পতিত ও পাপী সকলে-ই আমার প্রদত্ত এই অন্ন গ্রহণ করিয়া, তৃপ্ত ও মুদিত হউক। কি অপূর্ব্ব আতিথেয়তা!

আর্য্য-শাস্ত্র বলেন ঃ—

ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বাশ্রয়ো যতঃ।
শ্ব-চণ্ডাল-বিহঙ্গানাং ভুবি দদ্যাত্ততো নরঃ॥

অর্থাৎ গৃহস্থ সকলের আশ্রয়; অতএব সকলকে না খাওয়াইয়া, আপনি খাইতে পারেন না। শাস্ত্রকারেরা আর-ও বলিয়াছেন ঃ—

ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদিদং ভূতনিকায়ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাং॥

অর্থাৎ ভূতসমূহের স্বরূপ স্বয়ং বিষ্ণুর প্রতিরূপ আমি সমস্ত প্রাণিবর্গের পালনার্থ এই অন্ন-দান করিতেছি।

ফলতঃ, ভারতবাসীর শাস্ত্র-শিক্ষিত নিত্য অন্ন-দান অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বজীবে দয়া এবং পরার্থপরতার অভ্যাস যেরূপে সাধিত হয়, তাহা অপর কোন জাতির কল্পনা-শক্তির অগোচর। পুরুষানুক্রমিক এইরূপ অনুষ্ঠান-সকলের ফলে-ই ভারতবাসী অন্যান্য জাতি সকলের অপেক্ষা অহিংসক, দয়ালু ও পরার্থজীবী হইয়া আছেন। সমধিক দুঃখের বিষয় এই যে, এই সনাতন অনুষ্ঠানের দিন দিন লোপ হইয়া আসিতেছে!

পূর্ব্বকালে আর্য্য-জাতির ভোজন সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলিত ছিল। গৃহী কেবলমাত্র অতিথি-সেবা করিয়া-ই, ভোজন করিতেন।

স্ববাসিনীং তথা রোগি-গর্ভিণী-বৃদ্ধ-বালকান্।
ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী॥

অর্থাৎ নবোঢ়া, রোগী, গর্ভিণী, বৃদ্ধ এবং বালককে সংস্কৃতান্ন দ্বারা ভোজন করাইয়া, গৃহী তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিবেন। এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে প্রাতর্ভোজনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃকালে একবার সামান্যরূপ আহার অর্থাৎ কল্যবর্ত্ত (প্রাতরাশ) শব্দের উল্লেখ অনেক স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে, দ্বিজ ভিন্ন অন্য জাতির এরূপ ভোজন হইলে-ও হইতে পারে। কিন্তু, এস্থলে একটি কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণেরা ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রাতঃকালের আচমন-মন্ত্র ও মধ্যাহ্ন সময়ের আচমনের মন্ত্র স্বতন্ত্র। রাত্রিকালে হস্ত, পদ ও উদর প্রভৃতি দ্বারা যে পাপ-কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তাহার প্রশমনার্থ প্রাতরাচমন-মন্ত্র পঠিত হয়;—অর্থাৎ—

যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং
পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু।

আবার দ্বিপ্রহরের সময় যে আচমন-মন্ত্র পঠিত হয়, তাহাতে উচ্ছিষ্ট ও অভোজ্য-ভোজনের পাপ হইতে পবিত্রতা লাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়। যথা—

যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম সর্ব্বং পুনন্তু মা মাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।

এখন দেখা উচিত যে, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ভোজন না থাকিলে, উচ্ছিষ্ট ও অভোজ্য-ভোজনের পাপ-দূরীকরণার্থ কেন তৎকালে উপাসনা হইবে? রাত্রিকালীন অভোজ্য-ভোজনের পাপ দূর করিবার জন্য ত প্রাতরাচমনে-ই প্রার্থনা থাকিল। আবার সায়ংকালে দিবাভাগের নিষিদ্ধ ভোজনের পাপ-ক্ষয় কামনা হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্ট-ই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে-ও প্রাতরাশ প্রচলিত ছিল। অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

দিবা পুনর্ন ভুঞ্জীতান্যত্র ফলমূলয়োঃ।

অর্থাৎ দিবসের মধ্যে দুই-বার ভোজন করিবে না। যদি একাধিক বার খাইতে হয়, তবে ফলমূলাদি খাইবে।

গৃহ্যসূত্রে সায়মাশ ও প্রাতরাশ শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

নিষ্ঠিতে সায়মাশ-প্রাতরাশে ভূতমিতি প্রবাচয়েৎ।

অর্থাৎ, প্রাতরাশ ও সায়মাশ অনুষ্ঠিত হইলে পর, (ছাত্রগণকে) অধ্যয়ন করাইবে। আমরা প্রাতঃকালীন ভোজনকে প্রাতরাশ বলি, কিন্তু সায়ংকালীন ভোজনকে সান্ধ্য-ভোজন শব্দে সচরাচর ব্যক্ত করিয়া থাকি। কিন্তু বোধ হয়, সান্ধ্য-ভোজন অপেক্ষা বৈদিক সায়মাশ শব্দ ব্যবহার করিলে, অপেক্ষাকৃত শ্রুতি-মধুর হয়।

মহাভারতের এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রৌপদী দেবী জয়দ্রথকে বলিতেছেন,—"আমি তোমাদের প্রাতরাশের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি।" দেবতাদিগের "বাল্য-ভোগের" কথাটা এদেশে আবালবৃদ্ধ সকলে-ই অবগত আছেন।

ভোজন-কালে মৌনী হওয়া আমাদের শাস্ত্রের বিধি। কিন্তু ইয়ুরোপীয়-দিগের ব্যবহার ইহার বিপরীত। তাঁহারা বলেন,—"কথোপকথন করিতে করিতে ভোজন করিলে, পরিপাকাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়।" কিন্তু কথা কহিতে গেলে-ই, মুখের লালা-নিঃস্রাব কম হইয়া জিহ্বা শুষ্ক হয়। এই জন্য-ই বোধ হয়, ভোজন-কালে তাঁহাদিগের ঘন ঘন জল বা মদ্য পান করিতে হয়। লালা শুষ্ক হওয়া এবং তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে জল খাওয়া, পরিপাক-ক্রিয়ার অনুকূল নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে মাংস পরিপাক করিতে লালার প্রয়োজন তত বেশী হয় না; এজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাংসভুক্ জন্তুরা ভোজনকালে গর গর করিয়া শব্দ করিয়া থাকে।

ভোজন সম্বন্ধে আর্য্য-ঋষিগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন :—

প্রাগ্দ্রবং পুরুষোঽশ্নীয়াৎ মধ্যে চ কঠিনানি বৈ।
পুনরন্তে দ্রবাশী তু বলারোগ্যং ন মুঞ্চতি॥

প্রথমে দ্রব অর্থাৎ তরল দ্রব্য খাইবে, মধ্যে কঠিন দ্রব্য খাইবে এবং শেষে আবার দ্রব-দ্রব্য খাইবে। এরূপ করিলে, বলের এবং স্বাস্থ্যের হানি হইবে না। ভোজন-কালে পরিবেষণ সম্বন্ধে ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

লবণং ব্যঞ্জনঞ্চৈব ঘৃতং তৈলং তথৈব চ।
লেহ্যং পেয়ঞ্চ বিবিধং হস্তদত্তং ন ভক্ষয়েৎ॥

অর্থাৎ লবণ বা ব্যঞ্জন, ঘৃত, তৈল, লেহ্য এবং পেয় কিছু-ই হাতে করিয়া পরিবেষণ করিলে খাইবে না। এস্থলে ব্যঞ্জনাদির পরিবেষণ পরিশুদ্ধরূপে না হইলে যে, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার উদ্রেক হইয়া, চিত্তের অপ্রশস্ততা জন্মে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা হইয়াছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে-ই, আর্য্য-জাতির মধ্যে ত্রিবিধ খাদ্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; অর্থাৎ মূল্যবান্ বা গুরু-পাক খাদ্য। যথা—পলান্ন, খেচরান্ন, শূল্য-মাংস অর্থাৎ শিক-কাবাব, পায়স ও পিষ্টক ইত্যাদি। নিত্য খাদ্য অর্থাৎ যাহা আমরা প্রতিদিন আহার করিয়া থাকি। আর রোগীর খাদ্য অর্থাৎ নানাবিধ যূষ ও মণ্ড ইত্যাদি। পলান্ন অর্থাৎ মাংস-সহ অন্ন-পাকের ব্যবস্থা; পুরাকাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মুসলমান রাজাদিগের রাজত্ব-কালে, উহার প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে। তাঁহারা অত্যন্ত ভোগ-বিলাসী ছিলেন। সেই বিলাসিতার অনুরোধে, তাঁহারা ঐ সকল খাদ্যাদি নানাবিধ উত্তেজক মসলা দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া, রসনার তৃপ্তি-সাধন এবং ভোগ-তৃষ্ণা চরিতার্থ করিতেন।

মধ্যাহ্নের আহার অপেক্ষা রাত্রিকালের আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রের দুইটি আদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম আদেশ এই যে, রাত্রি-ভোজনে অতি তৃপ্তি পরিহার করিবে, অর্থাৎ রাত্রিতে অত্যন্ত পেট ভরিয়া খাইবে না। দ্বিতীয় ব্যবস্থা—রাত্রি-ভোজনের পর, একটু বিশ্রাম করিয়া শয়ন করিবে। বলা বাহুল্য যে, ইয়ুরোপীয় ডাক্তারেরা-ও ঐ মতের পোষকতা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ত্রিবিধ খাদ্যের উল্লেখ আছে; সাত্ত্বিক আহার, রাজস আহার ও তামস আহার। এই ত্রিবিধ আহার-ভেদে, মানসিক ভাবের-ও কিয়ৎপরিমাণে ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। যথা;—

আয়ুঃসত্ত্ব বলারোগ্য-সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রূক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুসিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস-প্রিয়ং॥

অর্থাৎ সরস, সিদ্ধ ও মনোরম আহারই সাত্ত্বিক আহার। অধিক কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ-বীর্য্য, তীক্ষ্ণ-বীর্য্য, রুক্ষবীর্য্য ও উগ্রবীর্য্য আহার—রাজস আহার। শৈত্যাবস্থা-প্রাপ্ত, অসার, দুর্গন্ধ, পর্য্যুসিত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র আহার-ই তামস আহার। সাত্ত্বিক আহারে পরমায়ু, বল, উৎসাহ, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধন করে। রাজস আহার দুঃখ, শোক ও রোগাদির হেতু। সাত্ত্বিক আহার সাত্ত্বিক-স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তির-ই প্রিয়। রাজস আহার রাজসপ্রকৃতি ব্যক্তির-ই অভিরুচি এবং তামস-স্বভাব ব্যক্তির-ই তামস আহারে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। আর্য্য-ঋষিরা মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সর্ব্বাঙ্গ-ই বিধিবোধিত করিয়া, পবিত্র এবং পাশব ভাব পরিচ্যুত করিতে যত্ন-শীল ছিলেন। তাঁহারা গৃহীকে উপদেশ দিয়াছেন :—

ইন্দ্রিয়প্রীতিজননং বৃথাপাকং বিবর্জ্জয়েৎ।

অর্থাৎ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের প্রীতি-কর বৃথা-পাক বর্জ্জন করিবে।

এক্ষণে নানা কারণে আমাদের দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। অতএব এ সময় খাদ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কেবল-মাত্র অন্নের উপর নির্ভর না করিয়া, অন্ততঃ একবেলা ময়দা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। দাইল, রুটি যে, উত্তম পুষ্টি-কর—এ কথা সকলে-ই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। ময়দায় শতকরা বার দশমিক বিয়াল্লিশ অংশ নাইট্রোজেন্ পদার্থ আছে; কিন্তু চাউলে উক্ত নাইট্রোজেনের পরিমাণ শতকরা সাত দশমিক একাশি মাত্র। অন্নভোজী বাঙ্গালী ও রুটি-ভোজী পশ্চিমাঞ্চলবাসী লোকের শরীরের প্রতি একবার দৃষ্টি করিলে-ই, উভয়ের পুষ্টি ও শক্তির তারতম্য অনায়াসে-ই বুঝিতে পারা যায়। আজ্ কাল ধনি-শ্রেণীর মধ্যে এবং কোন কোন মধ্যবিত্ত লোকের গৃহে রুটি ও লুচির প্রচলন ক্রমশ-ই বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সকল বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের ত কথা-ই নাই। কলিকাতা ও তন্নিকট-বর্ত্তী গ্রাম-সমূহের অধিকাংশ সম্পন্ন লোকে-ই আজ কাল একবেলা অন্ন ও এক-বেলা রুটি বা লুচি আহার করিয়া থাকেন। জনৈক খ্যাতনামা ইংরাজ ডাক্তার,—যিনি জীবনের অধিকাংশ সময়, বাঙ্গালা দেশে-ই যাপন করিয়াছিলেন—তিনি বলিয়াছেন,—"ময়দার চলন না থাকাতে-ই, বাঙ্গালীর শরীর এত ক্ষীণ। অন্ন অপেক্ষা রুটি পাক-যন্ত্রের স্বল্পতর স্থান ব্যাপিয়া থাকে, যাঁহারা আধুনিক কালের

শ্রম-সাধ্য, গুরুতর, চিন্তা-জনক কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে রুটি-ই উপকারজনক।" ডাক্তারেরা আরোগ্যোন্মুখ রোগীদিগকে রুটি পথ্য দিয়া থাকেন। রুটি অপেক্ষা অন্নে লবণের ভাগ অনেক পরিমাণে অল্প থাকে বলিয়া, অন্ন অপেক্ষা রুটি অধিক পরিমাণে পুষ্টি-কর।

খাদ্যাখাদ্য-নির্ব্বাচনের উপর যে, আমাদের স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে, একথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অসংযত ভাবে যা তা খাইয়া, কেহ-ই সুস্থ থাকিতে পারে না। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাস্থ্য যে, আহার দ্বারা উন্নত হয়, একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত। কোন্‌টি খাদ্য, কোন্‌টি-ই বা অখাদ্য এবং খাদ্যের মাত্রা-ই বা কিরূপ স্বাস্থ্যের উপযোগী, তাহা স্বয়ং স্থির করা বড় সহজ কথা নহে। এই জন্য ভক্ষ্য ও আহার সম্বন্ধে একটি শাসন থাকা—একটা বাঁধাবাঁধি রাখা, নিতান্ত আবশ্যক। সেই শাসন, হয় ধর্ম্মানুমোদিত, না হয় সমাজানুমোদিত অথবা নিজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অনুমোদিত না হইলে, তাহার দৃঢ়তা থাকে না, লোকে সহজে তাহা পালন করিতে সম্মত হয় না। এই জন্য-ই আহার বিষয়ে—খাদ্যাদি বিষয়ে—আর্য্য-জাতির শাসন অত্যন্ত প্রবল। কোন্ দ্রব্য আমাদের খাদ্য, কোন্ দ্রব্য আমাদের খাদ্য নহে, কাহার পক্ষে কি পরিমাণে আহার করা উচিত, কোন্ তিথিতে কি দ্রব্য আহার করা উচিত, কোন্ তিথিতে কি দ্রব্য আহার করা নিষিদ্ধ, এই সকল বিষয়ে হিন্দু-শাস্ত্রে যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ ব্যবস্থা আছে, সেরূপ ব্যবস্থা প্রায় কোন দেশে, কোন জাতির মধ্যে নাই। কেবলমাত্র ইহুদি জাতির মধ্যে-ও আহার ও খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। এই উভয় জাতি ভিন্ন অপর কোন সভ্যজাতির মধ্যে-ই এ বিষয়ে কোন প্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেখা যায় না। মোজেস আহার ও খাদ্যাদি বিষয়ে নানাবিধ সুনিয়ম বিবিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কত কাল পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্যাপি ইহুদিরা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আহারের নিয়ম যত্ন-সহকারে পালন করিয়া থাকে। প্রাণান্তে-ও সে ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে না। যাহারা আর্য্য-শাস্ত্রানুমোদিত ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার না করিয়া, যথেচ্ছ আহার করেন, তাঁহাদিগকে অহিন্দু বলিয়া-ই, সাত্ত্বিক হিন্দুরা ঘৃণা করিয়া থাকেন। যাঁহারা আহার বিষয়ে যথেচ্ছাচারী, তাঁহারা ঘৃণার পাত্র হউন বা না হউন, তাঁহারা যে, আত্মদ্রোহী—তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহুদিরা

বহু শতাব্দী ধরিয়া নানাজাতির সংঘর্ষে পড়িয়া-ও আহার বিষয়ে চিরপ্রচলিত বিধি ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু আমরা, প্রায় দেড় শত বৎসর মাত্র ভিন্ন-জাতীয়-সংঘর্ষে পড়িয়া, যুগান্তর ঘটাইয়া ফেলিয়াছি; অনেকে অভক্ষ্য ও অখাদ্য খাইয়া, নানা পীড়ায় ভুগিতেছেন। বাস্তবিক, যদি আমরা যাহা ভাল লাগে, তাহা-ই খাইব, ভগবৎ-প্রদত্ত মনুষ্যোচিত জ্ঞান দ্বারা যদি আমাদের আহার নিয়ন্ত্রিত না করিব, তাহা হইলে, আমরা কিরূপে ভগবানের সৃষ্ট যাবতীয় জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব (মনুষ্য) নামের যোগ্য হইব? তাহা হইলে পশু হইতে আমাদের কি পার্থক্য রহিল? দেশ-কাল-পাত্রানুসারে আহার ও খাদ্যের পার্থক্য হইয়া থাকে,—হওয়া-ও উচিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যাহা খাদ্য, তাহা কখন শীতপ্রধান দেশে উপযোগী হয় না; তাহা শীতপ্রধান দেশের অসহ্য হইবার-ই কথা। জাতি-বিশেষের খাদ্য-ও অপর জাতির খাদ্য হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে। সুতরাং অপর জাতির খাদ্য ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে, বিশেষ বিচার করিয়া-ই, তাহা গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। আমরা সভ্য হইবার জন্য-ই হউক, আর বাধ্য-বাধ্যকতার খাতিরে-ই হউক, বিজাতীয় অনেক প্রকার খাদ্য ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি ও শিখিতেছি; কিন্তু ঐ সকল খাদ্য ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে বুঝিয়া দেখা উচিত, উহা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী কি না? আমাদের চির-প্রচলিত খাদ্য হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ কি না? এবং স্বজাতীয় খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া, অন্য জাতির খাদ্য আহার করিবার পক্ষে সুযুক্তি আছে কি না? হিন্দু-শাস্ত্রে আমাদের পক্ষে যে সকল খাদ্য ব্যবহার্য্য ও যাহা পরিহার্য্য বলিয়া বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহা লঙ্ঘন করিবার পক্ষে বিশেষ যুক্তি ও প্রয়োজন না বুঝিয়া, তাহা করা উচিত নহে। ঐ বিধি ব্যবস্থা এক সময়ের বা এক জনের কল্পনা-প্রসূত নহে, পরন্তু প্রগাঢ় চিন্তাশীল সংসারাভিজ্ঞ বহু ব্যক্তির বহুকালের গবেষণা ও বহুদর্শিতার ফলরূপে বিধি-বদ্ধ আছে। শরীর-রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন বুঝিলে, এতাদৃশী বিধি-ব্যবস্থা-ও লঙ্ঘন কর,—আপত্তি নাই। কিন্তু সখের জন্য, রসনা-তৃপ্তির জন্য, আহার-সম্বন্ধে আমাদের অহিন্দু হওয়া কোন মতে-ই উচিত নহে। আর্য্য-ঋষিগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন :—

প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
জঙ্গমং স্থাবরং চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনং॥

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি সমুদয়কে-ই প্রাণের অন্নরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সমস্ত-ই জীবের ভক্ষ্য। বাস্তবিক, আহারের তাদৃশ অভাব হইলে, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিতে হয় না। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সকল দ্রব্য-ই খাইতে পারে। কিন্তু সংযত আহার যে, আমাদের পক্ষে মহোপকারী, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ, সংযত আহারে কেবলমাত্র যে, শরীর ভাল থাকে, এবং স্বাস্থ্য-সুখ-ভোগ ঘটে, তাহা নহে; সংযতাহারী ব্যক্তি পারত্রিক সুখের-ও অধিকারী হন। আহার সংযত করিতে না পারিলে, চিত্ত কখন-ই সংযত হয় না। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন ঃ—

অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনং।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ অতিভোজন-দোষে, শরীর নীরোগ হয় না, আয়ুর খর্ব্বতা হয়, স্বর্গ-প্রাপ্তির ব্যাঘাত হয়, উহা অপবিত্র, লোকের বিদ্বেষ-জনক; অতএব অতিভোজন ত্যাগ করিবে।

অত্যধিক পরিশ্রম, অসময়ে পরিশ্রম ও ব্যায়াম-চর্চ্চার হ্রাস নিবন্ধন, এখনকার লোকের ভোজন-শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এটি, শারীরিক বল-বীর্য্য-ক্ষয়ের কার্য্য ও কারণ দুই-ই। পূর্ব্বকার লোকেরা বিলক্ষণ আহার করিতে পারিতেন, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। এক্ষণকার লোকে সেরূপ পারে না। পূর্ব্বকালে যখন কেবল গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে হইত, তখন বালকেরা তিন বার ভাত খাইত। পূর্ব্বকালে ভদ্রলোকে-ও কতকগুলা ঝুনা নারিকেল ও চিড়া চিবাইয়া খাইয়া হজম করিতে পারিতেন। ইহা যে অত্যন্ত পুষ্টি-কর আহার, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু, এক্ষণকার অধিকাংশ লোকে-ই, এরূপ পুষ্টি-কর খাদ্য খাইয়া, হজম করিতে পারে না। ইংরাজেরা যে পরিমাণে আহার করিতে পারেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে, বাঙ্গালীদিগের আহার নাই বলিলে-ই হয়। অধিক আহার করিয়া, অনায়াসে-ই জীর্ণ করিতে পারা, শারীরিক বলের একটি প্রধান কারণ।

পুষ্টি-কর-দ্রব্য-ভক্ষণের হ্রাস, এ কালের লোকদিগের শারীরিক বল-বীর্য্য-ক্ষয় ও অল্পায়ুর এক কারণ। আমাদের বৈদ্যক গ্রন্থে লিখিত আছে, "আরোগ্যং কটুতিক্তেষু বলং মাংসপয়ঃসু চ।" অর্থাৎ কটু ও তিক্ত দ্রব্য স্বাস্থ্য-কর, এবং মাংস ও দুগ্ধ বল-কর। এক একটি জাতির এক একটি প্রধান খাদ্য আছে। গো-মাংস যেমন ইংরাজদিগের প্রধান খাদ্য, গোল-আলু যেমন আইরিশদিগের খাদ্য, দাইল রুটি যেমন হিন্দুস্থানীদিগের খাদ্য, তেমন-ই দাইল, ভাত, দুধ, মাছ বাঙ্গালীদিগের প্রধান খাদ্য। এই চারি দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ যেমন পুষ্টি-কর, এমন অন্য পদার্থ নহে। পূর্ব্বে আপামর সকলে-ই যেমন দুগ্ধ খাইতে পাইত, এক্ষণে দুগ্ধ মহার্ঘ হওয়াতে, সেরূপ পায় না। দুগ্ধ বাঙ্গালীদিগের শরীর-রক্ষা ও শারীরিক-বল-বিধান পক্ষে এরূপ উপযোগী যে, তদভাবে আমাদেব শারীরিক উন্নতির আশা নাই। দুগ্ধ যে পুনর্ব্বার সুলভ হইবে, তাহার-ও কোন-ও আশা দেখা যায় না। একদা, ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া সংবাদপত্রের কোন-ও সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—"দুগ্ধ মহার্ঘ হওয়াতে বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। রের অসম্পূর্ণ পোষণ, বর্ত্তমান বাঙ্গালীদিগের অল্পায়ুর কারণ বলিয়া প্রতীয়-মান হয়।" বাস্তবিক, একে ইরাংজী-সভ্যতা-জনিত প্রভূত পরিশ্রমের চাপ, তাহার উপর ভোজন-শক্তির হ্রাস, ও পুষ্টি-কর-দ্রব্য-ভক্ষণের অল্পতা; ইহাতে কি আর রক্ষা আছে?

বর্ত্তমান সময়ে খাদ্য-সম্বন্ধে আর একটি গুরুতর অপকারিতা, রন্ধ্রগত শনির ন্যায়, মহৎ অনিষ্ট করিতেছে। পূর্ব্বে দুগ্ধ, ঘৃত ও তৈল প্রভৃতি দ্রব্য-সমূহ যেরূপ অকৃত্রিম পাওয়া যাইত, এখন আর সেরূপ পাওয়া যায় না। জিনিষের মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কৃত্রিমতা বৃদ্ধি হইতেছে। এটি একটি সভ্যতার চিহ্ন! সভ্যতার লীলা-নিকেতন বিলাতে এরূপ কৃত্রিমতা বিলক্ষণ চলে। ব্যবসায়ীরা লাভের আশায় খাদ্যে নানাবিধ বিষময় দ্রব্য মিশাইয়া, শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। এই সকল দ্রব্য আহারে যে, আয়ু ও বলের ক্ষয় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? জিনিষ ভেজাল করা কেবল ইংরাজী আমলে দৃষ্ট হইতেছে। মুসলমানদিগের আমলে এরূপ ছিল না। আমাদের বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের আমলে সকল বিষয়ে-ই ভেজাল, সকলেতে-ই খাদ, সকল-ই গিল্টি। এমন কি, মানুষে-ও ভেজাল, মানুষে-ও খাদ, মানুষ-ও গিল্টি!

দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য এবং মাংসাদি পুষ্টি-কর খাদ্য যাহা কিছু গৃহস্থ-গৃহে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা প্রায় পুরুষেরা-ই ভোগ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকদিগের ভাগ্যে তাহা প্রায় ঘটে না। পুরুষদিগের ভোজনাবশিষ্ট শাক পাত প্রভৃতি অতি অসার খাদ্য স্ত্রীলোকেরা আহার করিয়া থাকেন। এইরূপ অসার খাদ্য আহার দ্বারা শরীর কখন-ই সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে না। জননীর দেহ সুস্থ না থাকিলে যে, সন্তান বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট হয় না, এ ধারণা অনেকের-ই নাই। যেমন নিস্তেজ ও কীট-দষ্ট বৃক্ষ হইতে উপাদেয় ফল লাভ হয় না, সেইরূপ অসুস্থ রমণী হইতে-ও সুস্থ সন্তান জন্মে না। নিস্তেজ বৃক্ষে ফল ধরে না, যদিও ধরে, তবে সেই ফল, ক্ষুদ্র ও বিস্বাদ হয়; অপক্ক অবস্থায় ভূমিতে পতিত হইয়া থাকে এবং পাকিলে-ও ব্যবহারোপযোগি হয় না। সেইরূপ দুর্ব্বলা তেজোহীনা রমণীর গর্ভে যে সন্তান জন্ম-হগ্রণ করে, সে সন্তান যে, ক্ষুদ্রকায় ও দুর্ব্বল হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কণ্টকময় বন-বৃক্ষ হইতে সুমিষ্ট আঙ্গুর ফল অন্বেষণ করা, আর নিস্তেজ, দুর্ব্বল পিতা-মাতা হইতে সুস্থ-কায়, দীর্ঘ-জীবী সন্তানের আশা করা এক-ই কথা।

কলিকাতায় প্রতিবৎসর যে পরিমাণে আত্মহত্যা সংঘটিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে, চারি ভাগের তিন ভাগ স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক। এই আত্মহত্যার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে, দেখা যায় যে, কদর্য্য আহার-ই এই সকল আত্মহত্যার মূলে বর্ত্তমান। কোন-ও খ্যাতনামা ডাক্তার এক স্থানে লিখিয়াছেন,—আমি যখন মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি আইন শিখিতাম, তখন ডাক্তার উডফোর্ড সাহেব উহা শিখাইতেন। জলে ডুবিয়া, গলায় দড়ি দিয়া, বিষ খাইয়া মরিলে, পরীক্ষার জন্য সেই সব লাশ চালান হইয়া, তাঁহার কাছে যাইত। লাশ উপস্থিত হইলে, তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট আত্মহত্যার কারণ সাহেব জিজ্ঞাসা করিতেন। অনন্তর আমাদিগকে বলিতেন, আত্মহত্যার যে কারণ তোমরা শুনিলে, সে অতি সামান্য কারণ; সে কারণে আপনার জীবন নষ্ট করিবার ইচ্ছা হওয়া সম্ভব নহে; সে কারণ উপলক্ষ মাত্র। আত্মহত্যার মূল কারণ, পেটের ভিতর। এই বলিয়া, লাশের পেট চিরিয়া ফেলিতে বলিতেন। পেট চেরা হইলে—অন্ত্র চেরা হইলে,—অন্ত্রের ভিতর একরূপ শত শত ক্রিমি আমরা দেখিতে পাইতাম; এই শত শত ক্রিমির উত্তেজনা-ই

আত্মহত্যার কারণ। আত্মীয় স্বজনের সহিত বিবাদ বিসংবাদ, ইহার মূল কারণ নহে। কদর্য্য আহার হইতে-ই যে, এই সকল ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে, চিকিৎসা-শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

স্বীকার করি, আমাদের দেশের জল-বায়ু-মৃত্তিকা ভাল নহে। যে দেশ চির-তুষার-বিমণ্ডিত শত শত নদ নদীর উৎপাদক হিমাদ্রির পাদমূলে এবং অতল-স্পর্শ অনন্ত সাগরের কূলে অবস্থিত, যে দেশ অগণ্য নদ নদী ও অসংখ্য হ্রদ তড়াগে সমাকীর্ণ, যে দেশে চারি মাস ঘোরতর বর্ষার পর, ক্রমাগত চারি মাস অবিশ্রান্ত নীহার-প্রপাত হয়, এবং যে দেশের মৃত্তিকা প্রায় কখন শুষ্ক হইতে দেখা যায় না, সে দেশের জল-বায়ু-মৃত্তিকা যে, দূষিত হইবে, ইহা বিচিত্র কি? কিন্তু যথার্থ-ই কি, কেবলমাত্র জল-বায়ু-মৃত্তিকার দোষে আমরা দুর্ব্বল? আমরা যে-প্রকার আহার করি, তাহাতে কি আমাদের সুস্থ হইবার কথা? না, আমাদের দেহ পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবার কথা? পুরাতন সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্নে সার পদার্থ কি আছে? শাক, কচু, লাউ, কুমড়া কি খাদ্য? না দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য এবং মাংস স্বাস্থ্য-[illegible]খাদ্য! একে দিন দিন নানা কারণে দেশের জল-বায়ু-মৃত্তিকা দূষিত হইতেছে, তাহার উপর আবার পুষ্টি-কর খাদ্যের অভাব ঘটিতেছে; এতন্নিবন্ধন অধিবাসি-বর্গ দিন দিন দুর্ব্বল, হীন-বীর্য্য এবং অল্প-পরমায়ু হইয়া পড়িতেছে। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘ-জীবী লোক প্রায় দেখা যায় না। বঙ্গদেশে দুগ্ধ, ঘৃত ও মৎস্য প্রধান খাদ্য-দ্রব্য-মধ্যে পরিগণিত ছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, দিন দিন গো-কুল নির্ম্মূল হইতেছে, সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় আর লোকে দুগ্ধ, ঘৃত আহার করিতে পাইতেছে না। নদী সকল মজিয়া যাওয়াতে মৎস্যাদি-ও দিন দিন পরিহীয়মান হইয়া পড়িতেছে। ভরসার মধ্যে এক দাইল ও ভাত; তাহার-ও আবার বিদেশে রপ্তানি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ আমাদের নিত্য-সহচর হইয়া উঠিয়াছে। জীবিকার ভাণ্ডার-স্বরূপ ভারত-ভূমি জগতের আহারোপযোগি ফল-শস্যের প্রসূতি-স্বরূপ ছিল, আক্ষেপের বিষয় এই যে, সেই ভারত-ভূমি এক্ষণে দুর্ভিক্ষের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছে! সুখ সৌভাগ্য, ধন সম্পত্তি, ধর্ম্মোন্নতি, বলবীর্য্য এবং জীবনোপায়-স্বরূপ খাদ্য-দ্রব্যাদির জন্য ভারত চিরকাল উন্নত ছিল। ভারতের হিমালয় যেমন কাহার-ও নিকট মস্তক নত করে নাই—পৃথিবীর সকল পর্ব্বতের অপেক্ষা উন্নত, সেইরূপ ভারতের পূর্ব্ব-গৌরব-স্বরূপ

আর্য্যজাতি, সুখের জন্য, শৌর্য্য-বীর্য্যের জন্য এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য পৃথিবীর কোন-ও জাতির নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। তাঁহাদের মস্তক-স্থিত রাজমুকুটের নিকট, সকল মুকুট অবনত—তাঁহাদের সভ্যতা-জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত—তাঁহাদের রসনা-বিনিঃসৃত বেদ, উপনিষদ্ এবং দর্শনাদির সঙ্গীতে নিদ্রিত জগৎ জাগরিত—তাঁহাদের ভুজ-বলে অরাতি-কুল শাসিত—তাঁহাদের বক্ষঃস্থল মনুষ্যত্বের গৌরবে পরিপূরিত—তাঁহাদের বাস-ভবন ভারত-ভাণ্ডারের শস্যাদি-খাদ্যে পৃথিবী প্রতিপালিত হইয়াছিল। এখন সেই ভারতের সেই সুখ—সেই সম্পত্তি—সেই সৌভাগ্য—সেই ধর্ম্ম—সেই বীরত্ব—সেই উদার আতিথেয়তার সহিত তুলনা করিলে, এ ভারত সুখ-বিহীন—দগ্ধ মরু—ধর্ম্মের অন্ধ বিশ্বাসে দৃষ্টিহীন—সামান্য উদরান্নের জন্য পর-পদ-সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে! এখন ভারতকে আর্য্যজাতির ভারত বলিতে লজ্জা বোধ হয়—ভারত-ভূমিকে স্বর্ণ-ভূমি বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—ভারতের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা মনে হইলে, বক্ষঃস্থলের এক একখানি অস্থি চূর্ণ হইয়া আইসে। ভারতের অন্নের কথা ভাবিলে, শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে! ভারতের দুরবস্থার পরিসীমা নাই, অন্তঃসার-শূন্য কাপুরুষের ন্যায় জীবন ধারণ করিতেছে! ভারতের অন্ন-কষ্ট, ভারতের অসচ্ছলতা—ভারতের অভাব, দাবানলের ন্যায় ভারত-সন্তানদিগকে দগ্ধ করিতেছে। দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি হইলে-ও, যে ভারতে অন্ন-কষ্ট হইত না, এখন সেই ভারতবাসীদিগের ভবনে অহোরাত্র অন্নের জন্য হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে! "বসুধৈব কুটুম্বকং" এই পবিত্র নীতি, যে জাতির প্রশস্ত অন্তঃকরণ হইতে সমুত্থিত হইয়াছিল, সেই জাতি এখন আত্মীয়-স্বজন-প্রতিপালনে সংকীর্ণ-হৃদয় পশুর ন্যায় স্বার্থপর হইয়া, আর্য্য-নাম কলঙ্কিত করিতেছে!

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে যে আর্য্যজাতির শারীরিক ও মানসিক শক্তি-প্রভাবে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল, যাঁহাদিগের কীর্ত্তি-কলাপ এখন পর্য্যন্ত মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় ভারত-গগনে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, যাঁহাদের শৌর্য্য-বীর্য্যের অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ জগতের সম্মুখে অটলভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ কিরূপ দ্রব্যাদি আহার করিতেন এবং কিরূপ পুষ্টি-কর খাদ্য প্রভাবে-ই বা তাঁহারা মানব-জাতির শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

আর্য্যজাতির খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে পূর্ব্বে মাংসের বহুল প্রচলন ছিল। ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি এবং আর্য্যাবর্ত্তে অবস্থিতি-কালে মাংস, প্রায় নিত্য-ব্যবহৃত হইত। অনন্তর, তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি-সহকারে, উক্ত বংশের শাখা প্রশাখা ভারতের নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ভারতের সকল স্থানের জল-বায়ু-মৃত্তিকা এবং উত্তাপ একরূপ নহে, এজন্য বিভিন্ন স্থানের প্রকৃতি-অনুসারে সাধারণতঃ মাংসাহার সংযত হইয়া আসিয়াছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাকালে আর্য্যেরা অত্যন্ত মাংসাশী ছিলেন।

সুশ্রুতের ৪৬ অধ্যায়ে আহার-বিধানে মাংসের গুণ এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে:—

মাংসং স্বভাবতো বৃষ্যং স্নেহনং বলবর্দ্ধনং।

অর্থাৎ মাংস, স্বভাবতঃ শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক এবং বলবর্দ্ধক।

চরকের মতে মাংস :—

গুরূষ্ণ-স্নিগ্ধ-মধুরা বলোপচয়বর্দ্ধনাঃ।
বৃষ্যাঃ পরং বাতহরাঃ কফপিত্তাতিবর্দ্ধনাঃ॥

অর্থাৎ মাংস অপেক্ষাকৃত গুরু, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মধুর, বলকর ও পুষ্টিকর এবং সর্বপ্রকার-বাতনাশক, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে কফ-পিত্ত-বর্দ্ধক।

চক্রপাণি বলিয়াছেন :—

সর্ব্ববাতহরং মাংসং বৃষ্যং বল্যং স্মৃতং গুরু।
প্রীণনং বৃংহণং হৃদ্যং মধুরং রসপাকয়োঃ॥

অর্থাৎ মাংস সর্ব্বপ্রকার বাত নষ্ট করে, বল বর্দ্ধন করে, শরীরের পুষ্টি সম্পাদন করে, হৃৎপিণ্ডের পরিপোষণ করে, এবং রন্ধনে মধুর-রসাভিষিক্ত হইয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করে।

এ ত গেল—চিকিৎসকদিগের কথা। এক্ষণে দেখা যাউক, মৎস্য-মাংস-ভক্ষণ আর্য্যদিগের মধ্যে সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল কি না। যে কোন-ও জাতির আচার ব্যবহার অবগত হইতে হইলে, সেই জাতির সাহিত্য আলোচনা করিতে হয়। এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, শ্রোতৃ-বর্গের মধ্যে অনেকে-ই আর্য্যজাতির পুরাণ ও নাটক প্রভৃতিতে পাঠ করিয়াছেন—পুরাকালীন আর্য্যগণ প্রায় সকলে-ই মাংসাহার করিয়া তৃপ্ত হইতেন। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি অপর সাধারণ,

প্রায় কেহ-ই মাংসাহারে বিরত ছিলেন না। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে—ষোড়শ অধ্যায়ে ঔর্ব্ব মুনি কহিলেন ঃ—

হবিষ্যমৎস্যমাংসৈস্তু শশস্য শকুনস্য চ।
শৌকরচ্ছাগলৈরৈণৈ রৌরবৈর্গবয়েন চ॥
ঔরভ্র-গব্যৈশ্চ তথা মাসবৃদ্ধ্যা পিতামহাঃ।
প্রয়ান্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্তু র্নিত্যং বার্দ্ধ্রীণসামিষৈঃ॥

অর্থাৎ শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্য করাইলে, পিতৃগণ এক মাস পরিতৃপ্ত থাকেন; মৎস্য দিলে, দুই মাস; শশ-মাংস দিলে, তিন মাস; পক্ষি-মাংস দিলে, চারি মাস; শূকর-মাংস দিলে, পাঁচ মাস; ছাগ-মাংস দিলে, ছয় মাস; এণ-নামক হরিণ-মাংস দিলে, সাত মাস; রুরু-মাংস দিলে, আট মাস; গবয়-মাংস দিলে, নয় মাস; মেষ-মাংস দিলে, দশ মাস; এবং গো-মাংস দিলে, এগার মাস পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের এক-নবতিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভরদ্বাজ ঋষি, ভরতের সৈনিকদিগকে ছাগ, মৃগ, বরাহ ও কুক্কুট-মাংস ভোজন করাইয়াছিলেন। মহাভারত পাঠ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে; শরশয্যাশায়ী মোক্ষাভিলাষী মহাত্মা দেবব্রত ভীষ্মদেব, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"হে ধর্ম্মরাজ! স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, কৃশ ও ক্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মাংস পুষ্টিকর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মাংস ভক্ষণ করিলে, অচিরাৎ পুষ্টি-লাভ হইয়া থাকে। মাংস হইতে উৎকৃষ্ট খাদ্য আর নাই।"

যদুকুল-পতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং খাসি খাইতে ভালবাসিতেন। বরাহ-পুরাণে লিখিত আছে ঃ—

ত্রৈবর্ষিকঃ কৃতস্ত্রীবোহতিবৃদ্ধো যো হ্যজাপতিঃ।
স তু বার্দ্ধ্রীণসঃ প্রোক্তো মম বিষ্ণোরতিপ্রিয়ঃ॥

একদা অগস্ত্য মুনি মেষরূপী বাতাপি রাক্ষসের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন; একথা রামায়ণে উল্লিখিত আছে। মহাভারতে আছে যে, সেই অগস্ত্য মুনি সমস্ত বন্য-জন্তু মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষিত করায়, অরণ্যচারী পশু-পক্ষীর মাংস দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃলোককে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে আর প্রোক্ষিত করিতে হয় না। সভা-পর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "বৈশম্পায়ন কহিলেন,—মহারাজ ধর্ম্মরাজ

যুধিষ্ঠির ঘৃত-মধু-মিশ্রিত পায়স, ফল, মূল, হরিণাদি-পশু-মাংস, বিবিধ চূস্য, নানাবিধ পেয় ও মিষ্টান্ন দ্বারা দিগ্‌দেশাগত অযুত-সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেন।" যাঁহারা উত্তর-রাম-চরিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য-ই অবগত আছেন যে, সূর্য্যবংশের গুরু বশিষ্ঠদেব বৎসতরীর মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে দেখিতে পাইবেন, মহারাজ রন্তিদেব, মহানসে অর্থাৎ রন্ধনশালায় প্রত্যহ দুই সহস্র গো বধ করিয়া, অতিথি অভ্যাগত ও অন্যান্য জনগণকে স-মাংস অন্ন প্রদান পূর্ব্বক লোকে অতুলকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের ধর্ম্ম-ব্যাধের উপাখ্যানে রাজর্ষি জনক-রাজের রাজধানীর বর্ণনা পাঠ করিলে, বোধ হয় যেন, আমরা কলিকাতা সহরের ধর্ম্মতলার বাজারের সম্মুখে ভ্রমণ করিতেছি।—কোন স্থানে অশ্ব, কোন স্থানে রথ, কোন স্থানে অন্যান্য যান সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে। কোন স্থানে বা যোদ্ধৃগণ বীরদর্পে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে; সমুদয় স্থান-ই উৎসবময়, সমুদয় লোক-ই ; নগরের চতুর্দ্দিক্‌ই ধর্ম্মালয় ও সুরম্য হর্ম্ম্য-সমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; এবং ব্যাধেরা শূনা-মধ্যে সমাসীন হইয়া, মৃগ ও মহিষ-মাংস বিক্রয় করিতেছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্ট-ই প্রতীয়মান হয় যে, মাংসাদি হিন্দু-সাধারণের খাদ্য ছিল না। এক্ষণে দেখা যাউক, মন্বাদি স্মৃতি-শাস্ত্রে মৎস্য-মাংসাদি-সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা আছে। মনুসংহিতার ৫ম অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে লিখিত আছে :—

চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রিণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ॥

অর্থাৎ হরিণাদি বিচরণশীল পশুরা নিশ্চল তৃণাদি আহার করে; দন্তর ব্যাঘ্রাদি প্রাণীরা সামান্য-দন্তশালী হরিণাদিকে আহার করে; হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যেরা হস্ত-হীন মৎস্যাদি আহার করে; সিংহ প্রভৃতি বীর পশুরা ভয়শালী পশু আহার করিয়া থাকে। বিধাতার এইরূপ বিধান।" উক্ত সংহিতার ৫ম অধ্যায়ে ৩০শ শ্লোকে লিখিত আছে ;—

নাত্তা দুষ্যত্যদন্নদ্যান্ প্রাণিনোঽহন্যহন্যপি।
ধাত্রৈব সৃষ্টা হ্যদ্যাশ্চ প্রাণিনোঽত্তার এবচ॥

অর্থাৎ ভোক্তা ভোজনের উপযুক্ত প্রাণি-সমূহ প্রতিদিন ভোজন করিলে, দোষভাগী হন না। যেহেতু ঈশ্বর, ভক্ষ্য বস্তু ও ভোক্তা উভয়ের-ই সৃষ্টি

করিয়াছেন। যে দুইটী শ্লোকের কথা বলা হইল, তাহাতে মনু স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন যে, মৎস্য-মাংস-ভক্ষণ মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এবং স্বভাসিদ্ধ বলিয়া-ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য। তবে যে, তিনি কয়েকটি বিপরীত মতের শ্লোক, সংহিতা-মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে কেবল মৎস্য-মাংসের অযথা সেবনের শাসনমাত্র। যেহেতু তিনি সংহিতার ৫ম অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥

এই শ্লোক দ্বারা তিনি ইহা-ই বুঝাইয়াছেন যে, সংসারীর পক্ষে (আপনার ও সমাজের অনিষ্ট না হয়, এইরূপ করিতে পারিলে) উক্ত ত্রিবিধ স্বতঃপ্রবৃত্তি-জনক কার্য্যে কোন-ই দোষ নাই। কিন্তু নিবৃত্তি হওয়ায় পুণ্য আছে।

আমরা আর্য্যজাতির খাদ্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া, দেখিলাম যে, মনুষ্য-লোকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটি পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। নিবৃত্তি-মার্গ যতি ও যোগীদিগের পন্থা; সংসারীর পক্ষে প্রবৃত্তি-মার্গ-ই প্রশস্ত। আমরা গৃহস্থ, সুতরাং প্রবৃত্তি-মার্গ-ই আমাদের অবলম্বনীয়। আর-ও দেখা উচিত যে, সংসার-ধর্ম্ম করিতে হইলে, জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে, প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইলে-ই যে, পুষ্টি-কর খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। নিরামিষ ও আমিষ-ভোজনের দোষ গুণ বিচার করা, যদি-ও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি মৎস্য-মাংসাদি-ভোজনে যে, শারীরিক ও মানসিক বিস্তর উপকার সাধিত হইয়া থাকে, ইহা-ই অধিকাংশ শরীর-তত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকের মত।

এক্ষণে আমরা দেখাইব যে, অতি প্রাচীন কালে আর্য্যজাতি, মৎস্য-মাংসাদি পুষ্টি-কর আহার-সম্বন্ধে যে উপকারিতা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই প্রাচীন তত্ত্বের অনুকরণ করিতেছেন মাত্র। যে সময় আর্য্যজাতির বিজয়-দুন্দুভি দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত হইয়াছিল, আর্য্যজাতির সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ এবং আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিদ্যার সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়াছিল, তখন আর্য্যজাতির খাদ্যে মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টি-কর দ্রব্য সমূহ নিত্য ব্যবহৃত হইত। কাল-সহকারে আর্য্যজাতির

খাদ্যের অবনতির সহিত মনুষ্যত্ব-রক্ষোপযোগী সমুদয় গুণগ্রাম বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই অবনতি-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য-দার্শনিক-প্রবর হারবার্ট স্পেন্‌সার্ বলিয়াছেন,—"অষ্ট্রেলিয়াবাসী ও বুসম্যান প্রভৃতি যে সকল নিকৃষ্ট বন্যজাতি, কেবলমাত্র বনজাত ফলমূল ও কীটপতঙ্গাদি আহার করিয়া, জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তাহারা স্বভাবত-ই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা খর্ব্বকায়, দুর্ব্বল, স্ফীতোদর ও অসম্পূর্ণ-পেশী-বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং তাহারা ইয়ুরোপীয়-দিগের ন্যায় কোন গুরুতর শ্রম-জনক কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। উত্তর-আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ান, প্যাটাগোনিয়া-বাসী এবং কাফ্রি প্রভৃতি উদ্ধত-প্রকৃতির কর্ম্মঠ, চঞ্চল ও দীর্ঘাবয়ব-বিশিষ্ট বন্য জাতিদিগকে দেখ—দেখিবে, তাহাদের সকলে-ই অপর্য্যাপ্ত-মাংস-ভোজী। ধাতুপোষক-আহারশালী এক জন ইংরাজের সমক্ষে, অসার-আহারজীবী এক জন হিন্দু, দাঁড়াইতে-ও সমর্থ হয় না।"

জল ও অন্নে অধিক পরিমাণে মৃদংশ থাকিলে, শোণিত-প্রবাহ রুদ্ধ হয়। দেহ-মধ্যে অবাধে রক্ত সঞ্চালিত হইতে না পারিলে, উহা দূষিত হইয়া, নানাপ্রকার রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। শোণিত-ই জীবগণের [illegible]ন; অতএব যে সকল খাদ্যে শোণিত-প্রবাহের ব্যাঘাত না জন্মে, সে সকল খাদ্য-ই আমাদের খাওয়া উচিত। দুগ্ধ, মাংস, ডিম এবং দ্রাক্ষা-রসে মৃদংশ অল্প পরিমাণে থাকে, অথচ এ সকল যার-পর-পর নাই বল-কর, বিশেষতঃ মাংসের ন্যায় বল-কর খাদ্য আর কিছু-ই নাই; কিন্তু আমরা প্রায়-ই মাংস আহার করি না। মাংস যেমন শীঘ্র পরিপাক পায়, এমন আর কোন পদার্থ-ই পায় না। কোন বহুদর্শী ইংরাজ লিখিয়াছেন,—"উদ্ভিজ্জ আহার অপেক্ষা জৈব আহার যে, শরীর-গঠনে বিশেষরূপ উপযোগী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জৈব আহার অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ আহার পরিপাক করা, স্বল্প-সময়-সাধ্য ও স্বল্প-পরিশ্রম-সাপেক্ষ। কেননা, আমরা যে সকল প্রাণী আহার করিয়া থাকি, তাহারা উদ্ভিদ্ হইতে-ই শরীরে পুষ্টি-কর ও বল-বর্দ্ধক অংশ সংগ্রহ করিয়া আত্ম-দেহ গঠিত করিয়াছে। কাজে-ই, প্রাণি দেহ হইতে-ই আমরা প্রকারান্তরে উদ্ভিদের সারাংশ, সহজে ও পরিপাক-শক্তির স্বল্প ব্যয়ে লাভ করিয়া, আমাদের শরীর-গঠনে নিয়োজিত করিতে পারি।"

খাদ্য-সম্বন্ধে—খ্যাতনামা ডাক্তার ডিক্শন সাহেব বলিয়াছেন,—"কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ আহার-ই যে, মনুষ্যের জন্য নির্দ্ধারিত হয় নাই, মানবের দন্ত-পংক্তি-ই, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। এ বিষয়ে মস্তিষ্কের বিশেষ পরিচালনা না করিলে-ও, সহজে তাহা বুঝিতে পারা যায়।"

কোন দূরদর্শী ইংরাজ লেখক এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"কোন জাতির শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস করিয়া, তাহাদিগকে অধঃপাতিত করিবার ভার, যদি আমার প্রতি ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে, সেই জাতির আহারের ব্যবস্থা দ্বারা এই কার্য্য, আমি যত সহজে সম্পন্ন করিতে পারি, আর কোন উপায়ে তত সহজে তাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই না।"

কবি-বর বায়রন্ এক সময়ে বলিয়াছিলেন,—"মৎস্য, মাংস ও ডিম্বাদি অত্যন্ত বল-কর এবং ইহা-ই সাহিত্য-সেবীর আহারের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।"

সে যাহা হউক, মাংসভোজী জীবমাত্রে-ই উদ্ভিজ্জভোজী প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর দুর্দ্দান্ত। সিংহ, ব্যাঘ্রের নিকট বৃহদাকার হস্তী-ও পরাভূত হয়। কুক্কুর, বিড়াল স্বাধীন; অশ্ব, গর্দ্দভ ও গবাদি পশুরা পরাধীন! যাহারা উদ্ভিজ্জ-মাত্র-ভোজী, তাহারা সকলে-ই, প্রায় ভীরু এবং ভীরু বলিয়া-ই, মাংসাদ জীব-গণের নিকট ঘেঁসিতে-ও পারে না। সিংহ-ব্যাঘ্রের কথা ছাড়িয়া দাও,—মাংস-ভোজী কুক্কুর-বিড়াল-ও, যথেচ্ছ সুখে বিচরণ করে, কিন্তু হস্তী ও অশ্ব, ভারবাহী পশু-পদ-বাচ্য! বঙ্গদেশবাসী মুসলমানেরা, বাঙ্গালী হিন্দুদিগের অপেক্ষা বহুগুণে বলিষ্ঠ ও সাহসী; তাঁহারা মাংস খান বলিয়া বলিষ্ঠ—মাংস খান বলিয়া সাহসী।

এই সকল কথার যথার্থতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না। আর্য্য-জাতির অবনতির ইতিহাস, তার-স্বরে ইহার সারবত্তার পরিচয় দিতেছে। আর্য্যগণ যত দিন মাংসাহার করিয়াছিলেন, তত দিন এই বিশাল ভারত-ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পবিত্র কেতন উড্ডীন ছিল। কিন্তু কি কুক্ষণে বুদ্ধদেব, যে দিন ভারতে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" প্রচার করিলেন, সেই দিন হইতে-ই ভারতের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। ঐ অহিংসা পরমোধর্ম্ম-ই ভারতবাসীদিগকে ক্রমশঃ উদ্যমশূন্য, উৎসাহশূন্য, নির্বীর্য্য, নির্জ্জীব এবং ক্লীব-তুল্য করিয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে-ই আমরা পুরুষানুক্রমে

যে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছি, আমরা আশৈশব যে খাদ্য ও যে শিক্ষা লাভ করিতেছি, তাহাতে আমাদের সাহসী বা বিক্রমী হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমরা যে ভীরু ও নীচ-প্রকৃতি হইব, তাহার বিচিত্রতা কি? যেরূপ শিক্ষা, সেইরূপ কার্য্য—ইহা প্রসিদ্ধ-ই আছে। পূর্ব্বকার আর্য্যগণ, যেরূপ খাদ্য ও যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, সেইরূপে-ই কার্য্য-ও করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক, পুষ্টি-কর আহার দ্বারা যেরূপ শারীরিক বল-বীর্য্য ও তেজস্বিতা জন্মে, সেইরূপ সৎশিক্ষা ও সদনুষ্ঠান দ্বারা হৃদয়ের তেজস্বিতা, কর্ত্তব্য-জ্ঞান এবং ধর্ম্মভাব সম্পূর্ণ বিকসিত হইয়া থাকে। পুরাকালে শারীরিক ও মানসিক, উভয়বিধ শক্তি-বর্দ্ধন জন্য বিশেষরূপ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইত। এইরূপ শক্তি-প্রভাবে হিন্দু-মহিলাগণ-ও যেরূপ হৃদয়ের তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি প্রমাণ দেখুন :—

পূর্ব্বকালে বিদুলা-নাম্নী এক বহুদর্শিনী, যশস্বিনী রাজনন্দিনী ছিলেন। স্বীয় আত্মজকে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক বিনির্জ্জিত অবস্থায় উদ্যমশূন্য, বিষণ্ণচিত্তে শায়িত হইতে দেখিয়া, তিনি এই বলিয়া, তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন,—"রে শত্রুনন্দন! তুমি আমার নন্দন নহ; আমার গর্ভে-ও তোমার জন্ম হয় নাই, এবং তোমার পিতা-ও তোমাকে উৎপাদন করেন নাই; তুমি কুলের কণ্টক-স্বরূপ হইয়া, কোথা হইতে আসিয়াছ—বুঝিতে পারি না। তোমার না আছে সংরম্ভ, না আছে পুরুষকার; তোমার আকার, বুদ্ধি এবং প্রবৃত্তি সকল-ই ক্লীবের ন্যায়। তোমাকে পুরুষ বলিয়া, গণনা করা-ই অ-বিধি! তুমি চিরকালের নিমিত্ত একেবারে নিরাশ হইয়া বসিয়াছ। রে দুর্ব্বুদ্ধে! যদি কল্যাণের কামনা থাকে, তবে এখন-ও পুরুষোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। কাপুরুষতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উৎসাহ ও অধ্যবসায়-প্রভাবে মনুষ্যত্বের অনুসরণ করিয়া, শঙ্কাপহৃত চিত্তকে বলীয়ান্ কর। রে কুলাঙ্গার! বরং বিষধরের দন্তোৎপাটন করিয়া নিহত হও, তথাপি কুক্কুরের ন্যায় নীচভাবে নিধন প্রাপ্ত হইও না। জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়া-ও বিক্রম প্রকাশ কর।"

এ-প্রকার শিক্ষা, এখন কি আর আমরা কুত্রাপি পাইয়া থাকি? জননী হইয়া, সন্তানকে বলিতেছেন,—"হয় আপনার গৌরব রক্ষা কর, নয় নিত্যসিদ্ধ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হও"! এরূপ তেজস্বিনী জননী, কি আর দৃষ্টি-গোচর হয়? রমণীর

কথা দূরে যাউক, সভ্যতাভিমানী শিক্ষিত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে-ও কি এরূপ তেজস্বিতা পরিলক্ষিত হয়? হিন্দুসন্তানগণ দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকিয়া, যাহা কিছু ভীরুতার মহৌষধ, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা আত্ম-মর্য্যাদা, স্বজাতি-প্রেম, স্বদেশ-বাৎসল্য ও ধর্ম্মানুরাগ—যাহাতে মানবের উৎসাহ, সাহস ও তেজস্বিতা বৃদ্ধি হয়, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বহুকাল পরাধীন থাকিয়া, উপযুক্ত খাদ্য ও শিক্ষার অভাবে, অপমান ও নির্য্যাতন-সহিষ্ণু হইয়া ভীরু হইয়া পড়িতেছেন। উপযুক্ত খাদ্য ও সুশিক্ষার প্রভাবে যে, ভীরুতা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে, ইহা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস এবং সমগ্র মানব-জাতির ইতিহাস-ও এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিতেছে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান খাদ্য ও শিক্ষা-প্রণালী অতীব কদর্য্য এবং অসম্পূর্ণ; অতএব সর্ব্বাগ্রে ইহার সংস্কার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

উপসংহার-কালে আমার বক্তব্য এই যে, এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে ভাব ঔদাসীন্য অবলম্বন করা উচিত নহে। আজকাল লোকে, বিলাসিতা চরিতার্থ করিতে যে পরিমাণে অর্থ, অকাতরে ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা না করিয়া যদি সেই অর্থ দ্বারা স্ব স্ব পরিবার-মধ্যে স্বাস্থ্য-কর ও পুষ্টি-জনক খাদ্যাদির ব্যবস্থা নিয়ম করিয়া দেন, তবে তদ্দ্বারা এ দেশের প্রকৃত উপকার সম্পাদিত হয়। হিন্দু-জাতির খাদ্যের অভাবজনিত অপকার, অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায়, সকল শ্রেণীর লোকের অন্তরে অন্তরে সঞ্চারিত হইতেছে। তাই বলি, আর উদাসীন থাকিও না—সকলে সমবেত হইয়া, চেষ্টা কর। তোমরা দাতার বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, সামান্য উদরান্নের জন্য মুষ্টিভিক্ষার নিমিত্ত পর-প্রত্যাশী হইও না। পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, অক্ষুণ্ণ তেজঃ এবং পরার্থপরতা স্মরণ করিয়া, অন্নপূর্ণার অন্নক্ষেত্র—এই ভারত-ক্ষেত্রে আবার অন্নদানের চিরন্তন গৌরব রক্ষা কর *।

* এই প্রবন্ধ ২৮শে পৌষে "সাহিত্য-সভায়" পঠিত হইয়া, সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিবিধ রন্ধন

কলাই শুঁটির মালাই খিচুড়ি।

ই খিচুড়ি সোণামুগ বা খাঁড়ি মসূরী এবং কলাই শুঁটি দ্বারা পাক করিতে হয়। খিচুড়ি রাঁধিতে যে পরিমাণ জলের দরকার, সেই পরিমাণ নারিকেল-দুধ সংগ্রহ করিবে। ঝুনা নারিকেল কুরিয়া, তাহাতে গরম জল মিশাইয়া, কাপড়ে নিংড়াইয়া লইলে-ই, প্রচুর দুধ বাহির হইবে।

খিচুড়িতে যে পরিমাণ ঘৃত দিবে, তাহা একটি পাক-পাত্রে জ্বালে চড়াইবে। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে লঙ্কা ও পিয়াজ-কুচা (রুচি-অনুসারে) দিয়া নাড়িতে থাকিবে। ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে তেজপাত, লঙ্কা, লবঙ্গ এবং দারচিনির কুচি দিয়া নাড়িতে থাকিবে। একটু পরে-ই তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, লঙ্কা-বাটা এবং আদা-বাটা দিয়া নাড়িতে থাকিবে এবং মধ্যে মধ্যে জলের কিংবা দৈয়ের ছিটা মারিতে থাকিবে। যখন দেখিবে, মসলাগুলি ভাজা হইয়া, ঘৃতের উত্তম রঙ্ হইয়াছে, এবং গন্ধে ভর্ ভর্ করিতেছে, তখন তাহাতে চা'ল-ডা'ল ও কলাই শুঁটি ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। অনন্তর, তাহাতে নারিকেল-দুধ ঢালিয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে।

এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ জ্বাল পাইলে, চা'ল-ডা'ল গলিয়া আসিবে। এখন, উহাতে লবণ দিবে। এ সময় হইতে আর অধিক জ্বাল দিবে না, মৃদু জ্বালে খিচুড়ি

পাক করিবে, এবং সর্ব্বদা ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। কারণ, খিচুড়ির এই অবস্থায় অধিক জ্বাল দিলে, কিংবা মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া না দিলে, উহা ধরিয়া বা আঁকিয়া যাইবার সম্ভাবনা। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, খিচুড়ি আর সম্বরা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। অনন্তর, উহা উনান হইতে নামাইয়া লইবে। পরিবেষণ করিবার বিলম্ব থাকিলে, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে।

ছানার দোমেষা।

নিরামিষ আহারে দোমেষা একটি উত্তম খাদ্য। টাট্‌কা ছানার জল নিংড়াইয়া তাহাতে সামান্য লবণ, আদা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, রুচি-অনুসারে পিঁয়াজ-বাটা মিশাইয়া, চন্দনের মত করিয়া ছানা বাটিবে। এখন, সামান্য ঘৃত জ্বালে চড়াইবে; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে ছানা-বাটা ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। নাড়িবার সময় ছানা হইতে ঘৃত বাহির হইবে। জ্বালে বাদামী রঙ্গ হইলে, ছানা ভাজা হইয়াছে জানিবে। এখন, উহা জ্বাল হইতে নামাইবে।

ভাজা ছানা ঠাণ্ডা হইলে, পুনর্ব্বার তাহা বাটিবে। এই ছানা-বাটা গরম-মসলার গুঁড়া, গোলমরীচের গুঁড়া, রুচি-অনুসারে ভাজা পিঁয়াজের গুঁড়া এবং ছোলার ছাতু মিশাইবে। এখন, এই ছানার গুছি কাটিয়া, বাঁটুলের মত গোল করিয়া পাকাইবে। সমুদয়গুলি গড়া হইলে, তাহা ঘৃতে বাদামী রঙে ভাজিয়া লইবে।

এদিকে, একটি পাক-পাত্রে ঘৃত জ্বালে চড়াইবে; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, আদা-বাটা, লঙ্কা-বাটা দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। এবং মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প দৈয়ের ছিটা মারিতে থাকিবে। জ্বালে মসলাগুলি ভাজা হইলে, তাহাতে অল্প পরিমাণে জল ঢালিয়া দিবে। জ্বালে উহা ফুটিয়া আসিলে, তাহাতে ছানার ভাজা গোলকগুলি ছাড়িয়া দিবে। একবার ফুটিয়া আসিলে, পরিমাণ-মত লবণ দিবে। অল্প অল্প ঝোল থাকিতে থাকিতে, জ্বাল হইতে নামাইবে। নামাইয়া, তাহাতে গরম-মসলার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া, এক-বার ব্যঞ্জন নাড়িয়া চাড়িয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, ছানার দোমেষা রাঁধা হইল।

ঘৃত-চম্পক।

চাঁপানটে-শাকে ঘৃত-চম্পক পাক করিতে হয়। ইহা এক প্রকার নিরামিষ-ঘন্ট। চাঁপানটে-শাক, কচি অবস্থায়, উত্তম সুখাদ্য। একটি চলিত কথা আছে,—"শাকের ছা, আর মাছের মা।" অর্থাৎ শাক কচি অবস্থায় এবং মাছ পাকা অবস্থায় আহারে উপাদেয় বোধ হইয়া থাকে। পাকা শাক যেমন অখাদ্য, সেইরূপ আবার অত্যন্ত অস্বাস্থ্য-কর।

প্রথমে, চাঁপা-নটে শাকের সরু সরু ডগার সহিত পাতাগুলি কুচাইবে। পরে, তাহা ভাসা জলে কচলাইয়া কচলাইয়া, ভাল করিয়া ধুইবে। এখন ঘন্টের উপযুক্ত আকারে থোড়, আলু এবং কাঁচকলা প্রভৃতি তরকারিগুলি কুটিয়া ও ধুইয়া রাখিবে।

পরে, [illegible] জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তরকারি-[illegible] কসিয়া লইবে। কসা হইলে, তাহাতে শাকগুলি ফেলিয়া দিবে এবং দুই এক-বার নাড়িয়া চাড়িয়া দেওয়ার পর, তাহাতে লবণ দিবে। শাকে লবণ পড়িলে, তাহা হইতে জল বাহির হইতে থাকিবে। অনন্তর, তাহাতে লঙ্কা-বাটা ধনে[illegible] এবং হরিদ্রা-বাটা দিবে। কেহ কেহ আবার হরিদ্রা ত্যাগ করিয়া-ও রাঁধিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায়, অল্পক্ষণ জ্বালে থাকিলে, তরকারি সিদ্ধ হইয়া আসিবে। এখন, দুধ, চিনি এবং জীরামরীচ-বাটা এক-সঙ্গে গুলিয়া, উহাতে ঢালিয়া দিবে। এই সময়, একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া, উহা উনান হইতে নামাইবে।

এদিকে, সম্বরা দেওয়ার জন্য ঘৃত জ্বালে চড়াইবে। এবং তাহাতে জীরা ও তেজপাত ফোড়ন দিয়া-ই সম্বরা দিবে। সম্বরা দেওয়ার পর, ব্যঞ্জন অধিকক্ষণ জ্বালে রাখিতে হয় না; উহা বেশ থক-থকে হইয়া আসে। এখন, ব্যঞ্জনে নারিকেল-কুরা ও ভাজা বড়ি মিশাইয়া, নামাইয়া লইবে, ঘৃত-চম্পক পাক হইল। ঘৃতের ন্যায় তৈল দ্বারা-ও ইহা পাক হইয়া থাকে, তবে আস্বাদগত পার্থক্য হইবে।

বেগুণের দুধে ভর্ত্তা।

ভর্ত্তার পক্ষে কচি বেগুন-ই উত্তম। যে বেগুণ রাঁধিলে, ক্ষীরের ন্যায় থক-থকে হয়, সেইরূপ বেগুণ বাছিয়া লইয়া, কাঠ-কয়লার আগুনে পোড়াইবে। পাতুরে-কয়লার আগুনে অতি সাবধানতার সহিত বেগুণ পুড়াইতে হয়। বেগুণ অত্যন্ত পুড়িলে, উহার স্বাদ খারাপ হইয়া যায়।

আগুন হইতে বেগুণ-পোড়া তুলিয়া, তাহার পোড়া ছাল বা খোসা ফেলিয়া, ধুইয়া লইবে। এখন, তাহা উত্তমরূপ চট্‌কাইতে থাক এবং তাহার সহিত লবণ, অল্প দুধ এবং চিনি মিশাও।

এদিকে, পাক-পাত্রে ঘৃত বা তৈল জ্বালে চড়াইবে; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত ও লঙ্কা সম্বরা দিয়া, বেগুণ ঢালিয়া দিবে। এই সময়, একবার বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। অনন্তর, আদা ও মৌরী চন্দনের মত খিচ-শূন্য করিয়া বাটিয়া, বেগুণে ঢালিয়া দিয়া, নাড়িয়া নামাইলে-ই বেগুণের দুধে ভর্ত্তা প্রস্তুত হইল। এই ভর্ত্তা অত্যন্ত মুখ-রোচক।

কেহ কেহ বেগুণ না পুড়াইয়া, উহা সিদ্ধ করিয়া-ও এইরূপ ভর্ত্তা প্রস্তুত করিয়া থাকেন; কিন্তু সিদ্ধ অপেক্ষা পোড়া বেগুণ দ্বারা-ই উত্তম ভর্ত্তা হইয়া থাকে। সিদ্ধ বেগুণ কিছু পান্সে আস্বাদের হয়।

বৈদ্য-শাস্ত্র-মতে বেগুণ পোড়া সামান্য পিত্ত-কর, লঘুপাক, সারক, এবং কফ, মেদ ও বাত-নাশক।

মানকচুর ফুলুরি।

প্রথমে মানকচুর খোসা ছাড়াইবে। পরে তাহা ফালি ফালি করিয়া কুটিবে। এখন এই কচু জলে সিদ্ধ করিবে। বেশ সিদ্ধ হইলে, নামাইবে। ঠাণ্ডা হইলে, কচু মোলায়েম করিয়া চট্‌কাইবে কিংবা বাটিবে।

এদিকে কচুর পরিমাণ বুঝিয়া সফেদা জলে গুলিবে। এখন, এই গোলাতে কচু, লঙ্কা-বাটা, আদা-বাটা এবং লবণ মিশাইয়া, বেশ করিয়া ফেটাইবে।

অঙ্গারপক্কা বার্ত্তাকী কিঞ্চিৎ পিত্তকরী মতা।
কফমেদোঽনিলহরা সরা লঘুতরা পরা॥ (রাজবল্লভ।)

অনন্তর জ্বালে তৈল চড়াইবে; এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে এক একটি ফুলুরি ছাড়িতে আরম্ভ করিবে। জ্বালে উহা বেশ খড়-খড়ে করিয়া ভাজিয়া তুলিয়া লইবে। লিখিত নিয়মে প্রস্তুত করিলে, কচুর ফুলুরি পাক হইল।

মানকচু অত্যন্ত উপকারী তরকারি। অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা শীতকালের কচু-ই বেশ সুখাদ্য। উদরাময় ও শোথ রোগে কচু সুপথ্য। বৈদ্য-শাস্ত্রে কচুর এইরূপ গুণ লিখিত আছে:*—মানকচু শীতল, লঘু, আর শোথ এবং রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

দয়ে-ঘণ্ট।

পটোল, আলু, ইঁচড় অথবা ধোঁকা দ্বারা দয়ে-ঘণ্ট রাঁধিতে পারা যায়। কখন কখন কেবলমাত্র একটি, কখন বা দুইটি তরকারি এক-সঙ্গে মিশাইয়া-ও, ঐ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিরামিষ ব্যঞ্জনের মধ্যে দয়ে-ঘণ্ট অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহা অন্ন, লুচি বা রুটি এবং পরেটার সহিত আহার করিতে পারা যায়।

যদি আলু ও পটোলের দয়ে-ঘণ্ট রাঁধিতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথমে ঐ সকলের খোলা ছাড়াইয়া কুটিয়া লইবে। তরকারি কুটিয়া ও ধুইয়া, ঘৃতে কসিয়া রাখিবে। দয়ে-ঘণ্ট ঘৃতে পাক করিলে-ই সমধিক সুস্বাদু হইয়া থাকে; এমন কি ভাল করিয়া রাঁধিতে পারিলে, ভোক্তাদিগের রসনায় মাংস বলিয়া ভ্রম হইবে। তবে অসঙ্গতির পক্ষে তৈল দ্বারা রাঁধিলে চলিতে পারে। তৈলে রন্ধন করিলে, জাফরাণ-আদির প্রয়োজন হয় না।

তরকারি কসা হইলে, তাহা তুলিয়া, ঘৃতে কিস্‌মিস্ ভাজিয়া লইবে। এখন পাক-পাত্রে ব্যঞ্জন রাঁধিবার মত সমুদয় ঘৃত ঢালিয়া দিবে। এবং দারচিনির কুচি, লবঙ্গ, তেজপাত, ছোট এলাচের দানা সম্বরা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। মসলাগুলি ঘৃতে ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে আদা-বাটা ধনে-বাটা, লঙ্কা-বাটা, জাফরাণ বা হরিদ্রা-বাটা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। মসলা-সমূহ ভাজা হইয়া আসিলে, তাহাতে দধি ঢালিয়া দিবে। উহা খুব ফুটিতে থাকিলে, তাহাতে আলু ও পটোল ফেলিয়া দিবে, এবং দুই একবার ফুটিয়া আসিলে,

* মানকঃ শোথহৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ। (ভাব প্রকাশ)

লবণ, বাদাম ও কিস্‌মিস্‌ ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। যখন দেখিবে, ব্যঞ্জন বেশ থক-থকে গোছের হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহা নামাইয়া লইবে। এখন ব্যঞ্জনে গরম-মস্‌লার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া লইলে-ই, দয়ে-ঘণ্ট পাক হইল।

দেশী কুমড়ার ঘণ্ট।

আজকাল আমাদের দেশে, বিলাতি ও দেশী দুই প্রকার কুমড়া, ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কুমড়ার আস্বাদ ও গুণ বিভিন্ন প্রকার। দেশী বা চাল কুমড়ার কচি অবস্থায় উহা পিত্ত-নাশক; অর্দ্ধ-পক্ক কুমড়া কফ-নাশক; এবং পক্ক কুষ্মাণ্ড লঘু-পাক, উষ্ণ, ক্ষারযুক্ত, অগ্নি-উদ্দীপক, মূত্রাশয়, শুদ্ধিকারক, ত্রিদোষ-নাশক, হৃদ্য এবং উন্মাদ-রোগগ্রস্ত রোগীর সুপথ্য। *

প্রথমে কুমড়ার খোসা প্রভৃতি ছাড়াইয়া, ঘণ্টের উপযুক্ত আকারে [illegible]বে। যে কোন তরকারি কুটিয়া-ই জলে ধুইয়া লইবে। এখন হাঁড়িতে তৈল চড়াইয়া, পাকাইয়া লইবে। এই তৈলে কুমড়াগুলি ঢালিয়া দিবে; এবং মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। অল্পক্ষণ পরে তাহাতে লবণ ছড়াই[illegible]া, আর একবার নাড়িয়া হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া দিবে। খানিকক্ষণ এইরূপ অবস্থায় থাকিলে, কুমড়া হইতে জল বাহির হইয়া, সেই জলে-ই উহা সিদ্ধ হইয়া যাইবে। অনন্তর চিনি, ময়দা, জীরা-মরীচ-বাটা দুধে গুলিয়া, উহাতে ঢালিয়া দিবে। দরকার বুঝিয়া এই সময় সামান্য জল-ও ব্যঞ্জনে দিতে পার। জ্বালের অবস্থায় মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। যখন দেখিবে, ঘণ্ট বেশ থক-থকে গোছের হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহা নামাইয়া, ঘৃতে তেজপাত ও জীরা ফোড়ন দিয়া সম্বরা দিবে। সম্বরা দিয়া, একবার নাড়িয়া দিবে। অনন্তর, বড়ি ভাজা ও নারিকেল-কুরা ঘণ্টের উপর ছড়াইয়া দিয়া, দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, নামাইয়া লইবে।

---

* কুষ্মাণ্ডকং পিত্তহরং বালং মধ্যং কফাপহং।
পক্কং লঘূষ্ণং সক্ষারং দীপনং বস্তিশোধনং।
সর্ব্বদোষহরং হৃদ্যং পথ্যং চেতোবিকারিণাং।

নারিকেলদুধে কচুশাক পাক।

সোলা-কচুর ডাঁটা দ্বারা ছেঁচকি, ঘণ্ট প্রভৃতি কয়েক প্রকার ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। রুচি অনুসারে সামিষ ও নিরামিষ দুই প্রকারে কচুশাক রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। ভাল করিয়া রাঁধিতে পারিলে, কচুশাকের উত্তম তরকারি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বর্ষাকাল হইতে-ই এই তরকারি খাদ্যে ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

প্রথমে কচুর ডাঁটা লম্বা আকারে কুটিয়া, তাহার আঁশ ছাড়াইয়া ফেলিবে। এখন তাহা জলে ধুইয়া, ভাল জলে সিদ্ধ করিতে চড়াইবে। জ্বালে সুসিদ্ধ হইলে, নামাইয়া, শাকের জল গালিয়া ফেলিবে।

এখন হাঁড়িতে তৈল দিয়া জ্বালে চড়াইবে। তৈল পাকিয়া আসিলে, তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, জীরামরীচ-বাটা, সরিষা-বাটা এবং রাঁধুনি অল্প জলে গুলিয়া, ঢালিয়া দিবে। জ্বালে উহা ফুটিতে থাকিবে। মধ্যে মধ্যে এক একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। একটু পরে-ই লবণ ও নারিকেল-দুধ ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। অল্পক্ষণ পরে আবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। এখন হইতে আর পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে না। কারণ, কচুর শাক পূর্ব্বে একবার সিদ্ধ করিয়া লইয়াছ, সুতরাং এখন আর অধিকক্ষণ জ্বালে রাখার প্রয়োজন হইবে না। যখন দেখিবে, ব্যঞ্জন বেশ থক-থকে হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহা নামাইয়া লইবে।

আলুর নারিকেলী চপ।

এই নিরামিষ চপ অত্যন্ত সুখাদ্য। ইহাতে মাছ বা মাংস কিছু-ই ব্যবহার হয় না। নিরামিষ-ভোজীর পক্ষে আলুর নারিকেলী চপ অতি আদরের খাদ্য।

প্রথমে ঝুনা নারিকেল বাটিয়া রাখিবে। নারিকেলের ন্যায় ছোলার ডা'ল ভিজাইয়া, পরে তাহা বাটিয়া লইবে। এখন জ্বালে ঘৃত চড়াইবে। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাতা, লঙ্কা ফোড়ন দিবে। পরে তাহাতে দা'ল-বাটা ঢালিয়া, দিয়া অনবরত নাড়িতে থাকিবে। এখন নারিকেল-বাটা,

আদা-বাটা, ধনে-বাটা, লবণ, এবং কিস্‌মিসের কুচি দিয়া ভাজিতে থাকিবে। ঘৃতে সমুদয়গুলি কসা হইলে, নামাইয়া রাখিবে। রুচি অনুসারে ভাজিবার সময় উহাতে পিয়াজ-বাটা-ও দিতে পার। কিন্তু না দিলে ক্ষতি নাই।

এদিকে, আলু জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহার খোসা ছাড়াইয়া, বাটিয়া লইবে। পরে তাহা ঘৃতে কসিতে থাকিবে। কসিবার সময় আলুতে পরিমাণ মত লবণ, লঙ্কা-ও-আদা-বাটা দিবে। আলু কসা হইলে, উহা নামাইয়া রাখিবে। ঠাণ্ডা হইলে, তদ্দ্বারা এক একখানি চপ গড়াইবে। পূর্ব্বে যে দা'ল নারিকেল কসিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতে লেবুর রস ও কিঞ্চিৎ চিনি দিয়া, একবার চট্‌কাইয়া লইবে। কেহ কেহ আবার উহার সহিত ভাজা ডেলা ক্ষীর-ও অল্প পরিমাণে মিশাইয়া থাকেন। এখন, এক একটি চপের ভিতর এই পূর পূরিয়া চপ তৈয়ার করিয়া রাখিবে। এইরূপে সমুদয়গুলি প্রস্তুত করিবে। চপের ভিতর পূর অধিক দিলে, তাহা অত্যন্ত সুখাদ্য হইয়া থাকে, তাহা মনে রাখিবে।

চপের পরিমাণ অনুসারে, দুধে সামান্য ময়দা ও একটু লবণ মিশাইয়া ফেটাইবে। এখন, এক একটি চপে আরারুট বা বিস্কুটের গুঁড়া মাখাইয়া ঝাড়িয়া রাখিবে। এইরূপে সমুদয়গুলি ঠিক হইলে, তাহার এক একটি আবার দুগ্ধ গোলাতে ডুবাইয়া তুলিয়া, পুনর্ব্বার বিস্কুটের গুঁড়া মাখাইয়া ঝাড়িয়া লইবে। এখন, উহা ঘৃতে বাদামী ধরণে ভাজিয়া লইবে। এই চপ ভোক্তাদিগকে গরম গরম খাইতে দিবে।

পুরিণ।

ইহা-ও চপ-শ্রেণীর অন্তর্গত এক প্রকার খাদ্য। ইহা নিরামিষ ও সামিষ দুই প্রকারে পাক করা যাইতে পারে। পুরিণ গরম গরম অবস্থায় অতি উপাদেয় খাদ্য। ভোক্তাগণ ইচ্ছা করিলে, পিয়াজ পরিত্যাগ করিয়া-ও প্রস্তুত করিতে পারেন। কিন্তু পিয়াজের পরিবর্ত্তে, আদার পমিাণ একটু বেশী করিয়া দিলে চলিতে পারে।

শীতকালে দেশী আলু, এবং বর্ষাকালে নাইনিতাল আলু দ্বারা পুরিণ প্রস্তুত করিলে ভাল হয়।

প্রথমে আলু জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহার খোসা ছাড়াইয়া, মোলায়েম করিয়া বাটিবে। এই সময় পুরিণের অন্যান্য উপকরণগুলি, অর্থাৎ তিল, আদা, লঙ্কা, বাদাম, নারিকেল, পিয়াজ এবং পুদিনাশাক পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বাটিয়া রাখিবে। কিস্‌মিস্ না বাটিয়া, কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া রাখিবে। আর গোলমরীচ এবং গরম-মসলার গুঁড়া করিয়া লইবে।

এখন, আলুবাটাতে পরিমাণ মত লবণ, আদা, লঙ্কা, গরম-মসলা ও মরীচের গুঁড়া মাখিয়া, একবার ঘৃতে কসিয়া রাখ। আলু কসা হইলে, তাহা নামাইয়া, সেই পাত্রে সামান্য ঘৃতে, পিয়াজ ও কিস্‌মিসের কুচি ঢালিয়া দিয়া, ভাজিয়া নামাও। নামাইবার সময় তাহাতে বাদাম, নারিকেল, পুদিনা, লঙ্কা প্রভৃতি বাটা এবং লবণ ও গরম-মসলার গুঁড়া মিশাইয়া দাও। এই মিশ্রিত পদার্থ পূরের জন্য রাখ।

এদিকে, দুধে অল্প পরিমাণে ময়দা ও লবণ গুলিয়া, গোলা প্রস্তুত কর। এখন, সুজির চারিখানি চাকৃতি তৈয়ার কর এবং দুই খানিতে পূর দিয়া, অপর দুই খানি চাকৃতি দ্বারা তাহা ঢাকিয়া দিয়া, যোড়-মুখ জল-হাতে টিপিয়া দাও। এই গঠিত পদার্থকে পুরিণ কহে। এখন এক একখানি পুরিণ গোলায় ডুবাইয়া, ঘৃতে কিংবা তৈলে ভাজিয়া লও।

কাঁচকলার চপ।

এই চপ কাঁচকলার দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিরামিষ আহারে ইহা একটি উপাদেয় খাদ্য। যে নিয়মে চপ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা পাঠ কর।

প্রথমে, পুষ্ট অথচ টাট্‌কা কাঁচকলার খোসা ছাড়াইয়া, তাহা চিরিয়া, জলে ফেল এই সময় ফুল-ডুমুর অর্থাৎ কচি ডুমুর দুখানি করিয়া চিরিয়া, জলে রাখ। এখন এই ধৌত কলা ও ডুমুরগুলি জলে সিদ্ধ কর। বেশ সুসিদ্ধ হইলে, নামাইয়া রাখ। পরে সিদ্ধ ডুমুর খিচ-শূন্য করিয়া বাটিয়া রাখ। অনন্তর, ডুমুর-বাটাতে আদা ও পিয়াজ-বাটা মাখিয়া রাখ। রুচি অনুসারে এককালে পিয়াজ ত্যাগ করিতে-ও পার।

এদিকে পাক-পাত্রে ঘৃত জ্বালে চড়াও ; এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাতা ও পিয়াজ-ছেঁচা ফেলিয়া দাও। নাড়িতে নাড়িতে যখন দেখিবে,

উহা ভাজা ভাজা হইয়াছে, তখন তাহাতে সামান্য ময়দা দিয়া নাড়িতে থাক, এবং উহা লাল্‌ছে বর্ণের হইলে, তাহাতে ডুমুর-বাটা ও পরিমিত লবণ ঢালিয়া দাও। অল্পক্ষণ নাড়িতে নাড়িতে উহা কসা হইলে, তাহাতে গোলমরীচের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া নামাও। পরে, তাহাতে কাঁচা লঙ্কার কুচি ও লেবুর রস মিশাইয়া, স্বতন্ত্র পাত্রে ঢাকিয়া রাখ।

এখন চপের পরিমাণ বুঝিয়া, সুজিতে লবণ ও ময়ান মাখ। অনন্তর, কাঁচ-কলা বাটিয়া, সুজি ও সফেদার সহিত মাখিয়া লও; এবং ইহা হইতে চপ্ গড়। অর্থাৎ কচুরির আকারে একখানি চাকৃতি প্রস্তুত করিয়া, তাহার উপর ডুমুরের পূর দিয়া, আর একখানি চাকৃতি দ্বারা ঢাকিয়া দিয়া, যোড়-মুখ আঁটিয়া দাও। এদিকে একটি পাত্রে দৈ রাখিয়া, তাহাতে সামান্য ময়দা, একটু লবণ আর লঙ্কা-বাটা গুলিয়া ফেটাও; এখন এক একটি চপ এই গোলাতে ডুবাইয়া তুলিয়া, তাহাতে সুজি মাখাও। এইরূপে সমুদয় চপে সুজি মাখান হইলে, তাহা ভাসা ঘৃতে ভাজিয়া লও; কাঁচকলার চপ প্রস্তুত হইল। ইচ্ছা হইলে, [illegible] চপের উপর গরম-মসলার গুঁড়া ছড়াইয়া লইলে, উহা আর-ও সুখাদ্য হইয়া থাকে।

আলুর নারিকেলী কোপ্তা।

আলু ও নারিকেল দ্বারা প্রস্তুত হয় বলিয়া, ইহাকে আলুর নারি-কেলী কোপ্তা কহিয়া থাকে। নিরামিষ আহারে ইহা অতি উপাদেয় খাদ্য। ইহা অন্ন, খেচরান্ন, পলান্ন এবং লুচির সহিত আহার করিতে পারা যায়।

চপের আলুর ন্যায়, খোসা-সহ আলু জলে সিদ্ধ করিয়া লও। ঠাণ্ডা হইলে, তাহা খিচ-শূন্য করিয়া বাটিয়া রাখ। এদিকে নারিকেল, আদা, লঙ্কা উত্তমরূপে পিষিয়া লও। এখন উহাতে কাগজি কিংবা পাতি লেবুর রস, পরিমাণ মত লবণ, গোলমরীচের গুঁড়া, এবং গরম মসলার গুঁড়া মিশ্রিত কর। অনন্তর, আলুর সহিত এই সকল উপকরণ এক সঙ্গে চট্‌কাইয়া লও; এবং এক একটি লেচি কাটিয়া কোপ্তা গড়াও। এদিকে, ছোলার বেসনে সামান্য লবণ মিশাইয়া, জলে গুলিয়া, ঘন গোলা প্রস্তুত কর। এখন, এই গোলাতে এক একটি কোপ্তা ডুবাইয়া, ঘৃত কিংবা তৈলে লাল্‌ছে ধরণে ভাজিয়া লও, নারিকেলী কোপ্তা ভাজা হইল।

নারিকেলের তিলে বড়া।

ঝুনা নারিকেল দ্বারা বড়া প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে খিচ-শূন্য করিয়া, নারিকেল বাটিয়া লইবে। নারিকেলের ন্যায় ধৌত তিল-ও বাটিয়া রাখিবে। এখন নারিকেল, তিল, লবণ, লঙ্কার গুঁড়া বা বাটা এবং সফেদা এক-সঙ্গে মিশাইয়া, দুই একবার ফেটাইয়া, ঘৃত কিংবা তৈলে বড়া ছাড়িয়া, ভাজিয়া লইবে।

প্রকারান্তর।—প্রথমে আতপ চাউল ভিজাইয়া বাটিয়া লইবে। পরে তাহাতে তিল, নারিকেল-কুরা, লবণ এবং লঙ্কা-বাটা মিশাইয়া ফেটাইবে। প্রয়োজন হইলে, উহাতে অল্প পরিমাণে জলের ছিটা দিয়া, ফেটাইয়া লইবে। এখন উহা এক একটি বড়ার আকারে ঘৃত বা তৈলের উপর ছাড়িয়া ভাজিয়া লইবে। ভাজিবার সময় উনানে মৃদু জ্বাল দিতে থাকিবে। ভাজা কিংবা পোড়ার সময় মৃদু আঁচ রহিলে, উহা পুড়িয়া বা চুঁওয়াইয়া যাইবে না। পোড়া জিনিষ, খাইতে ভাল লাগে না এবং দেখিতে-ও সুন্দর হয় না। বড়া ভাজা হইলে, গরম গরম পরিবেষণ করিবে। নিরামিষ আহারে এই সকল খাদ্য অতি উপাদেয়। নারিকেল অত্যন্ত পুষ্টি-কর খাদ্য।

নিরামিষ পিশপাশ।

সামিষ ও নিরামিষ ভেদে পিশপাশ দুই-প্রকার। সামিষ পিশপাশ মাংসের সহিত পাক করিতে হয়। নিরামিষ পিশপাশে পিয়াজ ব্যবহার করা, ভোক্তাদিগের রুচির উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

একটি পাক-পাত্রে ঘৃত জ্বালে চড়াইবে। সচরাচর এক সের চাউলে এক পোয়া ঘৃত লাগিয়া থাকে। ঘৃত পাকিয়া আসিলে, পিয়াজের লম্বা লম্বা (যদি ইচ্ছা হয়) কুঁচি লাল্‌ছে ধরণে ভাজিয়া, তুলিয়া রাখিবে। এখন, এই ঘৃতে লবঙ্গ, দারচিনির কুচি, ছোট এলাচের দানা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। মসলাগুলি ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে আদার চাকা, চাউল এবং পরিমাণ মত লবণ ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। জ্বালে উহা খড়খড়ে হইলে, তাহাতে

নারিকেল-দুধ এবং তেজপাত দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে।

এইরূপ অবস্থায় জ্বাল পাইলে, ভাত ফুটিয়া উঠিবে। এই সময় হইতে আগুনের আঁচ কমাইয়া দিবে। যখন দেখিবে, ভাত সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন উহা খুব নাড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে, দানাগুলি ভাঙ্গিয়া, ফেন্সা ভাতের ন্যায় হইয়া আসিবে। তখন আর আঁচে না রাখিয়া, পাত্রটি নামাইবে। পূর্ব্বে যে পিয়াজ ভাজিয়া রাখা হইয়াছে, এখন তাহা অল্প গুঁড়া করিয়া, ভাতের উপর ছড়াইয়া দিবে। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, নিরামিষ পিশপাশ প্রস্তুত হইল। ইহা খাইতে বেশ সুখাদ্য। নারিকেল-দুধে রাঁধা হয় বলিয়া, কেহ কেহ আবার ইহাকে মালাই পিশপাশ-ও কহিয়া থাকেন।

মিঠে ভাত।

প্রথমে, ভাত রাঁধার নিয়মে অন্ন পাক করিবে। সরু বাঁকতুলসী, চিনি শর্কর, দাদখানি কিংবা ভাল বালাম প্রভৃতি চাউলের অন্ন হইলে আহারে সুখ-বোধ হইয়া থাকে। ভাত এরূপ নিয়মে রাঁধিবে, যেন কাদা কাদা না হইয়া, ঝরঝরে হয়।

এদিকে, চিনির রস প্রস্তুত করিবে। এক সের ভাত হইলে, আধ সের চিনির রস প্রস্তুত করিবে। * রস প্রস্তুত হইলে, তাহা একটি পাত্রে রাখিবে। এই সময় কিস্‌মিসের বোঁটা ছাড়াইয়া, ও বাদাম জলে ভিজাইয়া, তাহার খোসা ফেলিয়া পরিষ্কৃত করিবে। কেহ কেহ খোসা ছাড়ান আস্ত বাদাম ব্যবহার না করিয়া, উহা লম্বাভাবে পাতলা পাতলা করিয়া, চিরিয়া লইয়া-ও থাকেন।

এখন, একটি পাক-পাত্র আগুনের আঁচে বসাইবে। এবং তাহাতে ঘৃত ঢালিয়া দিবে। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে দারচিনির কুচি, লবঙ্গ এবং ছোট এলাচের দানা ফেলিয়া দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। মসলাগুলি ভাজা ভাজা হইলে, উনান হইতে পাত্রটি নামাইবে। এখন, এই ঘৃত একটি পাত্রে ঢালিয়া রাখিবে।

* চিনির রস প্রস্তুত করিবার নিয়ম নূতন সংস্করণ "পাক-প্রণালী" দেখ।

অনন্তর, একটি পোলাওয়ের হাঁড়ি লইয়া, তাহার ভিতর পূর্ব্ব-রক্ষিত ঘৃত একটু ছড়াইয়া দিয়া, তাহার উপর অল্প ভাত ছড়াইয়া দিবে। এখন, এই ভাতের উপর বাদাম ও কিস্‌মিস্ ছড়াইয়া দিয়া, অল্প পরিমাণে চিনির রস ছড়াইয়া দিবে। এইরূপে পর পর সাজাইবে। ঘৃত, ভাত, বাদাম, কিস্-মিস্ এবং রস, লিখিত নিয়মে সাজাইয়া, অবশেষে পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া, পাত্রটি মৃদু আগুনের দমে বসাইবে। এইরূপ অবস্থায় অল্পক্ষণ দমে থাকিলে, ভাতের মধ্যে ঘি ও রস প্রবেশ করিয়া, উহার অতি উপাদেয় আস্বাদ করিয়া তুলিবে। দম হইতে পাক-পাত্রটি নামাইয়া, ভাতের উপর গোলাপ জল ছিটা-ইয়া দিয়া, হাঁড়ির ভাত উল্টাইয়া দিবে। এইরূপে ভাতগুলি উল্টাইয়া দিলে, সমুদয় ভাতে গোলাপ জল লাগিবে। এখন উহা পরিবেষণ করিবে। এই মিঠা-অন্ন, পোলাওয়ের স্থায়, রসনার অত্যন্ত তৃপ্তি-জনক বোধ হইবে।

ছানার কোপ্তা।

মাছ মাংস খাইতে যাঁহাদের রুচি নাই, তাঁহাদের পক্ষে ছানার কোপ্তা উপাদেয় খাদ্য। ভাল রকম টাট্‌কা ছানার জল নিঙ্গড়াইয়া, তাহা চন্দ-নের মত করিয়া বাটিবে। এখন, তাহাতে পরিমাণ মত লবণ, গোলমরীচের গুঁড়া, গরম-মসলার গুঁড়া, লঙ্কা-বাটা, আদা-বাটা, পিয়াজ-বাটা (রুচি অনু-সারে ত্যাগ করিতে-ও পার) এবং ছোলার ছাতু মিশাইয়া, বেশ করিয়া চট্-কাইয়া লইবে। ছাতু মাখিলে, ছানা শক্ত গোছের হইবে। আপত্তি না থাকিলে, ছানাতে ডিমের তরলাংশ মিশাইতে পারা যায়। ডিম ব্যবহার করিলে, ভাল রকম ফুলিয়া উঠে, এবং বেশ মোচক হয়। সে যাহা হউক, এখন এই ছানার এক একটি গুছি কাটিয়া, তাহা পাকাইয়া কোপ্তা গড়িবে। কোপ্তা-গুলি প্রস্তুত হইলে, তাহার উপর ময়দা ছড়াইয়া দিবে। ময়দা মাখাইলে, গায়ে গায়ে লাগিয়া যাইবে না।

এদিকে, একখানি কড়াতে ঘৃত জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে কোপ্তাগুলি ভাজিয়া লইবে।

প্রকারান্তর।—পূর্ব্বের ন্যায় কোপ্তা প্রস্তুত করিয়া, অর্থাৎ ভাজিবার পূর্ব্বে,

কোপ্তাগুলি ডিমের তরলাংশে ডুবাইয়া তুলিয়া, তাহাতে বিস্কুটের গুঁড়া মাখাইয়া, ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। কোপ্তা গরম গরম উত্তম সুখাদ্য। পোলাও কিংবা খিচুড়ির সহিত মিলন হইলে, রসনার তৃপ্তি-জনক হইয়া থাকে।

কাঁকুড়-বেসনী।

কাঁচা কাঁকুড় রন্ধনে এবং পাকা কাঁকুড় জলপানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাঁকুড়-বেসনী, কাঁচা কাঁকুড়ে পাক করিতে হয়। প্রথমে কাঁকুড়ের খোসা ও বিচি ছাড়াইয়া ফেলিবে। অনন্তর, পটোলের মত লম্বা করিয়া এক এক খণ্ড কুটিবে। কুটিয়া, জলে ধুইয়া লইবে।

এদিকে, কাঁকুড়ের পরিমাণ বুঝিয়া, সফেদা ও বেসন জলে গুলিবে। এই গোলাতে লঙ্কা-বাটা বা গুঁড়া এবং লবণ মিশাইয়া, ভাল করিয়া ফেটাইয়া লইবে। গোলা প্রস্তুত করিয়া, উনানে ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, গোলাতে এক একখানি কাঁকুড়ের ফালি ডুবাইয়া, বেগুণির ন্যায় ভাজিয়া লইবে। ভাজিবার সময়, দুই পিঠ উল্টাইয়া দিবে। এইরূপে সমুদয়গুলি ভাজা হইলে, গরম গরম পরিবেষণ করিবে।

বেসন ভিন্ন, শুধু কাঁকুড় ভাজায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাঁকুড় ডুমা ডুমা কবিয়া কুটিয়া, তাহাতে লবণ ও হরিদ্রা মাখাইয়া, কুমড়া ভাজার ন্যায় ভাজিয়া লইবে।

বেসন-সহ তরকারি-ভাজা।

সচরাচর তরকারি দুই-প্রকার নিয়মে ভাজা হইয়া থাকে; অর্থাৎ সাদা ভাজা ও বেসন-সহ ভাজা। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভাজিলে, বিভিন্ন রকম আস্বাদ হইয়া থাকে। ভাজা মাত্রে-ই, ভাসা ঘৃত বা তৈলে ভাজিলে, ভাল হয়। ভাসা তৈল-ঘৃতে ভাজিলে, ভাজিবার সময় তরকারিতে জলের ছিটা দিতে হয় না; কিন্তু অল্প তৈলাদিতে ভাজিতে হইলে, কোন কোন তরকারিতে অল্প পরিমাণে জল না দিলে, উহা সুসিদ্ধ হয় না।

যে সকল তরকারি বেসন-সহ ভাজিতে হয়, তৎসমুদয় ভাজিবার সময়, গোলা প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। গোলা প্রস্তুত করিতে হইলে, তরকারির পরিমাণ বুঝিয়া, জলে বেসন, সফেদা, লঙ্কার গুঁড়া এবং লবণ এক-সঙ্গে গুলিয়া, ফেটাইয়া লইলে-ই, গোলা তৈয়ার হইল। আবার কোন কোন গোলাতে সফেদা আদৌ ব্যবহার হয় না কেহ কেহ আবার, সফেদার পরিবর্ত্তে, ময়দা মিশাইয়া-ও থাকেন। কোন কোন গোলাতে আবার, তিল ও পোস্ত মাখা হইয়া থাকে। তিল কিংবা পোস্ত-সংযোগে ভাজিলে, তরকারি সমধিক সুস্বাদু হইয়া থাকে। ভাজা মাত্রে-ই, গরম গরম আহার করিলে, অত্যন্ত সুখ-ভোগ্য বোধ হয়। ভাত ও খিচুড়ি-সহ, ভাজা বড়-ই মুখ-প্রিয় হইয়া থাকে।

পটোল, ফুলকপি, বেগুন, কুমড়া-ফুল, বিলাতি-কুমড়া প্রভৃতি, গোলায় ডুবাইয়া ভাজিলে, বেশ সুখাদ্য হইয়া থাকে। ভাজা মাত্রে-ই, ভাজিয়া, উনানের নিকট অর্থাৎ আগুনের আঁচে না রাখিলে, তাহা চিমসিয়া যায়। ঠাণ্ডা ভাজা বড়-ই অপ্রিয় খাদ্য।

আমলকী-ভর্ত্তা।

বৈদ্য-শাস্ত্রে আমলকীর বিস্তর গুণ বর্ণিত আছে। উহা কষায়, অম্ল, মধুর, শীতল, লঘু, রসায়ন এবং দাহ, পিত্ত, বমি, মেহ ও শোষ-নাশক। *

আমলকী ভাতে ভিন্ন, উহা দ্বারা মোরব্বা প্রস্তুত হইয়া থাকে। † আমলকীর মোরব্বা রোগীর পথ্যে ব্যবহার হয়। পূরন্ত আমলকী বাছিয়া লইবে। এখন, তাহা জলে ধুইয়া, ভাতে দিবে। যে সময় হাঁড়িতে চাউল ঢালিয়া দিবে, সেই-সঙ্গে আমলকী-ও জলে ফেলিয়া দিবে। কারণ, প্রথম হইতে সিদ্ধ করিতে না দিলে, উহা সিদ্ধ হইবে না। ভাত নামাইয়া, ফেন ঝাড়িবার পরে-ও, কিছু-ক্ষণ উহা গরম ভাতের ভিতর রাখিলে ভাল হয়; অর্থাৎ ভাতের ভাপে ফল মোলায়েম হইয়া উঠে। অনন্তর, ভাত হইতে আমলকী বাহির করিয়া, তাহাতে ঘৃত বা তৈল, লবণ এবং কাঁচা লঙ্কা (রুচি-অনুসারে) মাখিয়া পরিবেষণ করিবে।

* কষায়াম্লমধুরা শীতলা লঘু-দাহ-পিত্ত-বমি-মেহ-শোষঘ্নীরসায়নী চ।

† মৎপ্রণীত "মিষ্টান্ন-পাক" নামক পুস্তকে মোরব্বা পাকের নিয়ম দেখ।

মিঠা খিচুড়ি।

প্রথমে, একটি পাক-পাত্রে সমুদয় ঘৃত জ্বালে পাকাইয়া লইবে। পরে, তাহাতে লবঙ্গ, ছোট এলাচ, জৈত্রী, তেজপাত, এবং দারচিনির কুচি দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। মসলাগুলি ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে চাউল ও দাইল ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। এবং ঘৃতে উহা ফুটিতে আরম্ভ করিলে, পরিমাণ মত জল ঢালিয়া দিবে। যখন দেখিবে, জল উথলিয়া ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন তাহাতে হরিদ্রা দিবে। আলু দিতে ইচ্ছা করিলে, এই সময় তাহার খোসা ছাড়াইয়া, উহাতে ফেলিয়া দিবে।

এইরূপ অবস্থায় জ্বালে থাকিলে, যখন দেখিবে, চাউল সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে চিনি ও জীরামরীচ-বাটা গুলিয়া দিবে। এই সময় হইতে খুব সতর্ক হইবে; অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে ভাল করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া না দিলে, উহা ধরিয়া বা আঁকিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

খিচুড়ি নামাইয়া, তাহাতে গরম-মসলার গুঁড়া ও আদা-বাটা দিয়া, একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। অনন্তর, ভোক্তাদিগকে উহা গরম গরম পরিবেষণ করিবে।

গলা-খিচুড়ি।

দাইল ও চাউল সমান পরিমাণে লইবে। এখন, তাহা উত্তমরূপে ঝাড়িয়া বাছিয়া লইবে। এদিকে, ঘৃত জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত, ছোট এলাচ, দারচিনির কুচি এবং লঙ্কা সম্বরা দিবে; পরে তাহাতে চাউল ও দাইল ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। দুই একটি চাউল ফুটিতে আরম্ভ হইলে, তাহাতে পরিমাণমত হরিদ্রা দিবে। এই-রূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ জ্বাল পাইলে, চাউল ও দাইল ফুটিতে আরম্ভ করিবে। এই সময় হইতে উহা নাড়িয়া দিবে। যখন দেখিবে, চাউল সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে আদা-বাটা, পিয়াজ-বাটা (রুচি অনুসারে) এবং লবণ দিবে। অল্প-ক্ষণ পরে, খিচুড়িতে জীরামরীচ-বাটা দিয়া, আর একবার নাড়িয়া দিবে। এই সময় হইতে অধিক জ্বাল না দিয়া, মৃদু আঁচে উহা পাক করিতে থাকিবে।

ইচ্ছা করিলে, খিচুড়ি চড়াইবার সময় উহাতে খোসা-ছাড়ান আলু দিতে পার। খিচুড়ির সহিত আলু পাক করিলে, তাহা উত্তম সুখাদ্য হইয়া থাকে। যখন দেখিবে, খিচুড়ি বেশ গলিয়া আসিয়াছে, তখন তাহা নামাইয়া লইবে।

প্রথমে সমুদয় ঘৃত চড়াইয়া রাঁধিলে, পরে আর ঘৃত দিতে হয় না। কেহ কেহ আবার, খিচুড়ি দমে রাখিবার অবস্থায়, উহাতে কিছু ঘৃত দিয়া-ও থাকেন। সকল প্রকার খিচুড়িতে, ঘৃত এক নিয়মে ব্যবহৃত হয় না। ভাল করিয়া রাঁধিতে হইলে, সের প্রতি আধ সের পর্য্যন্ত ঘৃত-ও ব্যবহার করিতে পারা যায়। ফলতঃ, ভোক্তার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ঘৃত ব্যবহার করা-ই ভাল।

নারিকেল-দুধের খিচুড়ি।

এই খিচুড়ি জলে পাক না করিয়া, নারিকেল-দুধে রাঁধিতে হয়। এই জন্য উহাকে মালাই খিচুড়ি-ও কহিয়া থাকে। নারিকেল-দুধে পাক করিলে, খিচুড়ির অপেক্ষাকৃত মিষ্ট আস্বাদ হয়। যে পরিমাণ চা'ল-ডা'ল লইয়া খিচুড়ি রাঁধিবে, তদুপযুক্ত নারিকেল-দুধ, পাক-পাত্রে জ্বালে চড়াইবে। অনন্তর, তাহাতে চা'ল-ডা'ল, হরিদ্রা, লঙ্কা ও আদা-বাটা এবং আস্ত-লবঙ্গ, ছোট-এলাচ আর দারচিনির কুচি দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। যখন দেখিবে, জ্বালে খিচুড়ি টগবগ করিয়া ফুটিতেছে, তখন তাহাতে লবণ দিয়া, একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। চা'ল সিদ্ধ হইয়া আসিলে, বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিবে। এইরূপ নাড়িলে, খিচুড়ি লপেট গোছ হইয়া আসিবে। এখন, উহা জ্বাল হইতে নামাইবে।

এ দিকে, অপর একটি পাক-পাত্রে ঘৃত দিয়া, জ্বালে চড়াইবে। জ্বালে ঘৃতের ফেনা মরিয়া আসিলে, তাহাতে জীরা ও আদা-বাটা অল্প দধিতে গুলিয়া, ঢালিয়া দিবে। ঢালিয়া দিয়া-ই, অনবরত নাড়িতে থাকিবে। অনন্তর, তাহাতে খিচুড়ি ঢালিয়া সম্বরা দিবে। জ্বালে দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, খিচুড়ি নামাইয়া লইবে। কেহ কেহ আবার, ঘৃতে শুল্‌ফ শাক ভাজিয়া, খিচুড়িতে মিশাইয়া, পরে সাঁতলাইয়া থাকেন। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, নারিকেল-দুধের খিচুড়ি রাঁধা হইল।

আনারসের মেরিন।

প্রথমে, সুপক্ক আনারস বা আনারসির খোসা ও চোক প্রভৃতি ছাড়াইয়া ফেলিবে। পরে, লম্বা অথচ সরু করিয়া কুটিবে। এখন, তাহাতে লবণ, চিনি এবং লেবুর রস মাখিয়া, রাখিয়া দিবে।

এ দিকে আনারসের পরিমাণ বুঝিয়া, খাসা-ময়দায় ঘৃতের ময়ান মাখিবে। যে নিয়মে খাস্তার লুচি, কচুরি প্রভৃতিতে ময়ান দিতে হয়, সেই নিয়মে ময়ান দিবে। কারণ, ময়ান কম হইলে, মেরিন তত সুখাদ্য হইবে না, একটু শক্ত হইবে। এখন, এই ময়দা দুধে গুলিয়া, গোলা প্রস্তুত করিবে। যাঁহাদের ডিম আহারে আপত্তি নাই, তাঁহারা গোলায়, পরিমাণ মত দুই একটি ডিমের তরলাংশ মিশাইতে পারেন। ডিম মিশাইলে, ময়ান অল্প হইলে-ও, তত ক্ষতি হয় না; কারণ, ডিম মিশাইলে, মেরিন অতি মোলায়েম অথচ মোচক হইবে। এইরূপে গোলা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে।

এখন, কড়াতে ঘৃত জ্বালে বসাইবে। ঘৃত পাকিয়া আসিলে, পূর্ব্ব-প্রস্তুত আনারসের জল নিংড়াইয়া, তাহার দুই এক ফালি বা খণ্ড লইয়া, গোলায় ডুবাইয়া, বেগুনি ভাজার নিয়মে ভাজিয়া লইবে। এইরূপে সমুদয় ভাজা হইলে, চিনির পাকা-রস তৈয়ার করিয়া, অর্থাৎ যেরূপ রস দ্বারা গজা প্রস্তুত করিতে হয়, সেইরূপ রস ভাজা আনারসের উপর মাখাইবে। অনন্তর, অল্প পরিমাণে চিনিতে দুই এক ফোটা গোলাপী আতর মাখিয়া, মেরিনের উপর ছড়াইয়া দিবে। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, আনারসের মেরিন প্রস্তুত হইল।

ন্যাসপাতির চাটনি।

এই চাটনি অত্যন্ত মুখ-রোচক। পোলাও প্রভৃতি ঘৃত-পক্ক দ্রব্য আহারের সময়, মধ্যে মধ্যে ইহা খাইলে, জিহ্বার জড়তা ঘুচিয়া, পুনরায় আহারে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। ন্যাসপাতির ঝালদার ও মিষ্ট দুই প্রকার চাটনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রথমে ন্যাসপাতির খোসা ছাড়াইয়া, ডুমা ডুমা কিংবা চাকা চাকা করিয়া কুটিয়া, জলে ফেলিয়া রাখিবে। পরে, জল হইতে তুলিয়া, পুনর্ব্বার জলে ফেলিয়া

আগুনে সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে, উনান হইতে নামাইয়া, জল গালিয়া, রাখিয়া দিবে।

এখন, জ্বালে তৈল চড়াইবে এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে সরিষা ও পাঁচফোড়ন সম্বরা দিয়া, আসপাতিগুলি ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। অল্প কসা হইলে, তাহার উপর তেঁতুল-গোলা ঢালিয়া দিবে। দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, লবণ, সামান্য চিনি ও হরিদ্রা দিবে। কাঁচা তেঁতুলের মাড়ি হইলে, চাটনি দেখিতে সুন্দর হয়; পাকা তেঁতুলের মাড়ি দ্বারা পাক করিলে, উহার ময়লা রঙ্ হইয়া থাকে। যাহা হউক, অল্প ঝোল থাকিতে থাকিতে, উনান হইতে চাটনি নামাইবে।

অনন্তর, খাঁটি সরিষার তৈলে রাইসরিষা-(সাদা সরিষা) বাটা মিশাইয়া, খানিকক্ষণ ফেটাইবে। ফেটান হইলে, চাটনির উপর তাহা ঢালিয়া দিয়া, একবার বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিয়া পরিবেষণ করিবে। এই সময় যদি আম-আদার রস চাটনিতে দিতে পার, তবে আহারের সময় ভোক্তাদের কাঁচা আমের অথবা কাসুন্দির আচারের অম্ল বলিয়া ভ্রম হইবে।

মিষ্ট চাটনি প্রস্তুত করিতে হইলে, চিনির পরিমাণ বেশী করিয়া দিতে হয়। এবং তৈল-সহ সরিষা-বাটা আদৌ ব্যবহার করিবে না। ঝোল-অম্বল রাঁধিতে হইলে, জলের পরিমাণ একটু অধিক দিবে। ঝোল গাঢ় অর্থাৎ ঘন করিতে হইলে, একটু ময়দা জলে গুলিয়া, অম্বলে ঢালিয়া দিবে। ঝোল মধুর ন্যায় ঘন হইলে, জানিবে অম্বল রাঁধা শেষ হইয়াছে। অনন্তর, তাহা আর উনানে রাখিবে না। ময়দা দেওয়া হইলে, দুই একবার ফুটিয়া আসিলে-ই নামাইবে; কারণ, এ অবস্থায় অধিকক্ষণ জ্বালে রাখিলে, উহা অত্যন্ত ঘন হইয়া উঠিবে।

অম্বল বা চাটনি উনান হইতে নামাইয়া, ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে, তাহাতে দুই এক ফোটা গোলাপী আতর দিবে, আহারের সময় সৌগন্ধ্যে ভোক্তাদিগের মন বিমোহিত হইয়া উঠিবে।

পোস্তের টক ঝুরি।

ইহা অতি মুখ-রোচক চাটনি-বিশেষ। এই ঝুরি লেবুর রস, কিংবা কাঁচা আম ছেঁচিয়া, তাহার রস দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়।

প্রথমে, পোস্তগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া লইবে। বেশী জলে পানাইয়া পানাইয়া ধুইয়া লইলে, কাঁকর আদি থাকিবে না। এখন, এই ধৌত দানাগুলি চন্দনের মত করিয়া বাটিবে। অনন্তর, হাঁড়িতে তৈল চড়াইয়া, পাকাইয়া লইবে। এই তৈলে লঙ্কা ও মেতি ফোড়ন দিয়া, পোস্ত-বাটা ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। ভাজা ভাজা হইলে, কাগজি কিংবা পাতি লেবুর রসে চিনি, লঙ্কা-বাটা এবং লবণ মিশাইয়া তাহাতে ঢালিয়া দিবে। জ্বালে জল মরিয়া আসিলে, নামাইয়া লইবে। এখন জীরা, সরিষা, মেতি, মৌরী এবং কালজীরা ভাজার গুঁড় পোস্তের উপর ছড়াইয়া দিবে। যদি কাঁচা আমের পরিবর্ত্তে লেবুর রস দ্বারা পাক করিতে হয়, তবে ভাজা মসলার গুঁড়া দেওয়ার সময় উহাতে পরিমাণ মত আম-আদার রস দিবে, আহারের সময় আমের গন্ধে ভোক্তার রসনা লোলুপ হইয়া আসিবে।

কামরাঙ্গার জেরবেরিয়ান।

কামরাঙ্গার জেরবেরিয়ান পাক করিতে হইলে, ডাঁসা ফল বাছিয়া লইবে। ফলগুলি যেন বেশ পুষ্ট হয়। এইরূপ ফল বাছিয়া লইয়া, তাহা একটি মাটির বা কলাই-করা পাত্রে রাখিবে। এখন, জলে অল্প পরিমাণে লবণ গুলিয়া, তাহা কামরাঙ্গার উপর ঢালিয়া দিবে। এবং মধ্যে মধ্যে এক একবার নাড়িয়া দিবে। এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ রাখিবে।

অনন্তর, লবণ-জল হইতে কামারঙ্গা তুলিয়া, সামান্য চূণের জলে অল্পক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ভাল জলে তাহা উত্তমরূপ ধুইয়া, দধি-মিশ্রিত জলে অল্পক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে। পুনর্ব্বার তাহা ভাসা-জলে ধুইয়া, দধি দ্বারা সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে, নামাইয়া, দধি হইতে ফলগুলি তুলিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে।

এখন, চিনির রসে লেবুর রস মিশাইয়া, তাহা জ্বালে বসাইবে। ফুটিয়া আসিলে, তাহাতে কামরাঙ্গাগুলি ঢালিয়া দিবে। জ্বালে রস ঘন হইলে, নামাইয়া লইলে-ই, কামরাঙ্গার জেরবেরিয়ান পাক হইল।

ভাবপ্রকাশ-মতে কামরাঙ্গা শীতল, মল-বদ্ধ-কর, স্বাদু, অম্ল, কফঘ্ন এবং বাত-নাশক।

মোচার চাট্‌নি।

এই চাট্‌নি অত্যন্ত মুখ-রোচক। পাকের গুণে উহা এতদূর মুখ-প্রিয় হয় যে, একবার, আহার করিলে আর ভুলিতে পারা যায় না।

সকল-জাতীয় কলার মোচা যে সুখাদ্য নহে, তাহা অনেকে-ই অবগত আছেন। এজন্য ভাল কলার টাট্‌কা মোচা হইলে-ই ভাল হয়। প্রথমে মোচা কুটিয়া, জলে সুসিদ্ধ করিয়া, জল ঝরিতে দিবে। *

এদিকে হাঁড়িতে তৈল জ্বালে চড়াও, এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে মোচাগুলি ফেলিয়া দিয়া নাড়িতে থাক। ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে তেঁতুল-গোলা, লবণ, হরিদ্রা এবং লঙ্কা-বাটা ঢালিয়া দিবে। কাঁচা তেঁতুল সিদ্ধ করিয়া, তাহার মাড়ি জলে গুলিয়া লইলে-ই ভাল হয়। পাকা তেঁতুলের মাড়িতে রাঁধিলে, দেখিতে ময়লা হইয়া থাকে। অনন্তর মোচা পাক হইলে, তাহা নামাইয়া রাখিবে।

এখন, আর একটি হাঁড়িতে তৈল চড়াইয়া, পাকাইয়া লইবে। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে লঙ্কা, সরিষা এবং পাঁচফোড়ন ফেলিয়া দিবে। পরে, তাহাতে পূর্ব্ব-রক্ষিত মোচা ঢালিয়া দিয়া, বেশ করিয়া একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। জ্বালে জল মরিয়া আসিলে, তাহাতে ভাজা জীরা ও পাঁচফোড়নের গুঁড়া এবং খিচশূন্য আম-আদা-বাটা ঢালিয়া দিয়া, আর একবার নাড়িয়া চাড়িয়া লইলে-ই, মোচার চাট্‌নি-পাক শেষ হইল।

বৈদ্যক-মতে মোচা মুখ-প্রিয়, কফ-নাশক, অগ্ন্যুদ্দীপক ; ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্লীহা ও জ্বর-নাশক এবং বস্তি-শোধক।

স্পেনিশ্ সিদ্ধ বাদাম।

পঞ্চাশটি বাদাম লইয়া, উপরের খোলাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেল ; পরে পাক-পাত্রে জল-সহ তাহা সিদ্ধ কর। জ্বালের অবস্থায়, বাদামের গায়ের লাল লাল খোসাগুলি ছাড়িয়া গেলে, পাক-পাত্র হইতে তাহা তুলিয়া, শীতল জলে

* কদলী-মোচকং হৃদ্যং কফঘ্নং ক্রিমিনাশনং।
কুষ্ঠপ্লীহাজ্বরহরং দীপনং বস্তিশোধনং॥ (রাজবল্লভ।)

ফেল। এখন, এই জল হইতে বাদামগুলি তুলিয়া শুষ্ক কাপড়ে এরূপে পুঁছিবে, যেন উহার গায়ে একটু-ও জল না থাকে।

এদিকে, একটি পাক-পাত্রে মাংসের আখ্‌নি, পরিমিত লবণ এবং কিছু গরম-মসলার গুঁড়া দিয়া, জ্বালে চড়াও। জল ফুটিয়া আসিলে, বাদামগুলি আস্তে আস্তে তাহাতে ছাড়িয়া দাও। জলের পরিমাণ যেন অধিক না হয়; অর্থাৎ কেবল-মাত্র বাদাম গুলি ডুব ডুব হয়। কারণ, জল অধিক হইলে, স্বাদ ভাল হয় না।

যখন দেখিবে, জল মরিয়া আসিয়াছে, তখন তাহা নামাইয়া লইবে। কিন্তু এই রন্ধনে একটি কথা মনে রাখিবে; বাদাম আখ্‌নির জলে পাক করিবার পূর্ব্বে, সিদ্ধ বাদাম মাখনে সামান্যরূপ ভাজিয়া লইলে ভাল হয়। আর আখ্‌নির জলে পাতি কিংবা কাগজি লেবুর একটু রস দিলে, আস্বাদ-ও মধুর হয়।

দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে কিংবা যাঁহারা অত্যন্ত চিন্তাশীল তাঁহা-দিগের পক্ষে, ইহা অত্যন্ত বল-কারক।

ইংলিশ্‌ গোলক।

দাগী কিংবা পচা না হয়, এরূপ কতকগুলি আলু খোসা-সহ সিদ্ধ কর। সুসিদ্ধ হইলে, জল হইতে তাহা তুলিয়া, খোসা ছাড়াও। এখন, এই আলুগুলি উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া, তাহাতে পরিমাণ মত লবণ ও শাজীরার গুঁড়া মিশাও। মনে কর, যদি আধসের পরিমিত আলু-সিদ্ধ লইয়া থাক, তবে তাহাতে আধ ছটাক মাখন ও এক ছটাক সর (দুধের) মাখিয়া, আঁচে নাড়িতে থাক। যখন বুঝিবে, আলুতে মাখন বেশ টানিয়া লইয়াছে, অর্থাৎ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তখন জ্বাল হইতে তাহা নামাইয়া রাখ। আলু ঠাণ্ডা হইলে, তাহা হইতে এক একটি দলা লইয়া, বাঁটুল অথবা তাহা অপেক্ষা বড় করিয়া পাকাও।

এদিকে, ডিমের তরলাংশের সহিত বিস্কুটের গুঁড়া মিশাইয়া, বেগুনি ভাজার গোলার ন্যায় প্রস্তুত কর। এখন, ঐ গোলকগুলি গোলাতে ডুবাইয়া, মাখন কিংবা ঘৃতে বাদামী ধরণে ভাজিয়া লও, ইংলিশ্‌ গোলক প্রস্তুত হইল। গরম গরম এই গোলক উত্তম সুখাদ্য।

আইরিশ্-ষ্টু।

আয়ার্লণ্ডের লোকেরা সচরাচর মটন (মেষমাংস) দ্বারা ষ্টু রাঁধিয়া থাকে। ষ্টুতে আলু ব্যবহৃত হয়। এক সের পরিমিত পুরু মাংস লইবে; এবং উহার হাড় ও চর্ব্বি ফেলিয়া, কুটিয়া লইবে। চর্ব্বি-সহ ষ্টু রাঁধিলে, উহা অত্যন্ত গুরু-পাক হইয়া থাকে। তবে শীতকালে চর্ব্বি ব্যবহার করিলে, তত অনিষ্ট হয় না। এদেশে গ্রীষ্মকালে চর্ব্বি আহার না করা-ই ভাল। আলুগুলির খোসা ছাড়াইয়া, প্রত্যেকটি দুই খণ্ড করিয়া কুটিবে। দাগী কিংবা পচা আলু আদৌ ব্যবহার করিবে না। এক সের মাংসে দুই সের আলু কুটিয়া দিবে।

এখন, একটি পাক-পাত্রে আলুর একটি স্তর সাজাইবে। মাংসেতে আদার রস, পিয়াজের রস, এবং মরীচের গুঁড়া মাখিয়া, আলুর স্তরের উপর সাজাইয়া দিবে। এরূপ নিয়মে সাজাইতে আরম্ভ করিবে, যেন মাংস ও আলুতে দুই তিনটি স্তর হইতে পারে, এবং সর্ব্বশেষের স্তরে কেবলমাত্র আলু থাকিবে। অনন্তর, পরিমাণ মত লবণ ও জল উহার উপর ঢালিয়া দিয়া, জ্বাল দিতে থাকিবে। মৃদু আঁচে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত জ্বাল দিলে-ই, ষ্টু প্রস্তুত হইবে।

আইরিশ্-ষ্টুতে, অর্দ্ধেক আলু গলিয়া, ঝোলের সহিত মিশিয়া যায়। একটু অধিক জ্বালে থাকিলে, আলু গলিয়া যাইবে। রুচি-অনুসারে উহাতে গরম-মসলা ও ঘৃত সম্বরা দিতে পারা যায়। কারণ, এদেশের লোকের রসনায়, খাটি আইরিশ্-ষ্টু, তত সুখাদ্য হয় না। এই ষ্টু অত্যন্ত বল-কারক। মেষ-মাংসের অভাবে খাসি-মাংস দ্বারা-ও ষ্টু প্রস্তুত হইতে পারে।

মিঠে জর্দ্দা।

মিঠে জর্দ্দা এক প্রকার পোলাও বিশেষ। অন্যান্য পোলাওয়ে যে সকল মসলা ব্যবহার করিতে হয়, ইহাতে প্রায় সে সকলের প্রয়োজন হয় না। ভোজনের শেষ অবস্থায়, মিঠে জর্দ্দা পরিবেষণ করিতে হয়। ইহার পাকের নিয়ম অতি সহজ।

প্রথমে, পোলাওয়ের চাউল ভাল করিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া লইবে। পরে, অন্ন-পাকের জন্য উনানে জল চড়াইবে। জল খুব ফুটিতে আরম্ভ করিলে, তাহাতে ধৌত চাউলগুলি ঢালিয়া দিবে। যখন দেখিবে, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে, তখন এরূপ নিয়মে ফেন গালিবে, যেন উহা বেশ ঝর্‌ঝরে হয়। ফেন গালিবার সময় ভাতগুলি একটি কোঞ্চির ঝোড়ায় ঢালিয়া দিলে, অথবা ভাতের হাঁড়ির মুখে পাতলা কাপড় বাঁধিয়া উপুড় করিয়া দিলে, এককালে সমুদয় ফেন পড়িয়া যাইবে।

এখন, পাক-পাত্রে মাখন দিয়া জ্বালে বসাইবে। জ্বালে উহা পাকিয়া আসিলে, অর্থাৎ ঘৃত কল্‌কল্‌ করিয়া ফুটিত থাকিলে, তাহাতে জয়িত্রী ও জায়ফল ফেলিয়া দিবে। উহা ভাজা হইলে, তুলিয়া ফেলিবে। এদিকে, পোলাও রাঁধিবার পাক-পাত্রে ফেন-ঝাড়া ভাতগুলি তুলিয়া রাখিবে। এই ভাতের উপর উনান-স্থিত ঘৃত ঢালিয়া দিবে। পূর্ব্ব হইতে, গোলাপ জলে জাফরাণ ভিজাইয়া রাখিবে। এই সময়, সেই জাফরাণ চট্‌কাইয়া, তাহাতে চিনি মিশাইবে। এই চিনি-মিশান জল অন্নের উপর ছড়াইয়া দিয়া-ই, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। অনন্তর, পাত্রটি আগুনের সামান্য আঁচে দমে বসাইবে। অল্পক্ষণ দমে থাকিলে, আগুনের আঁচে জল শুষ্ক হইয়া যাইবে। অতঃপর উহা পরিবেষণ করিবে।

পাচক ও পাচিকাগণ, মিঠে-জর্দ্দা রাঁধিবার সময়, এক সের চাউলে জাফরাণ চব্বিশ রতি, মাখন বা ভাল ঘৃত এক পোয়া, চিনি বার কাঁচ্চা, এবং সামান্য জয়িত্রী ও জায়ফল এই হিসাবে উপকরণগুলি ব্যবহার করিবেন।

মিঠে পটলি।

ইহা একপ্রকার মিষ্ট-খাদ্য-দ্রব্য। পটোল কেবলমাত্র যে, ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়, তাহা নহে; উহা দ্বারা চাট্‌নি এবং উপাদেয় মিঠে খাদ্য-ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। পটোল অত্যন্ত উপকারী তরকারি, উহা রোগীর পথ্যে-ও ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

পুরন্ত অথচ লম্বা লম্বা টাট্কা পটোল বাছিয়া লইবে। এখন, প্রত্যেক পটোলের খোসা চাঁচিয়া ফেলিবে। পটোলের দোল্মা প্রস্তুত করিতে যেরূপ নিয়মে উহার মুখ কাটিয়া, ভিতরের বিচি ও শাঁস বাহির করিয়া ফেলিতে হয়, সেইরূপ নিয়মে ভিতর পরিষ্কৃত করিবে। পটোলের যে মুখ কাটিবে, তাহা ফেলিয়া দিবে না, উহা রাখিয়া দিবে। এখন, সরু কাটি কিংবা ছুরির সরু দিক্ দিয়া, পটোলের গায়ে দুই চারিটি ছিদ্র করিয়া দিবে। অনন্তর, বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্ এবং ডেলা ক্ষীর, ছোট এলাচের দানা, জাফরাণ এক-সঙ্গে চট্‌কাইয়া মাখিবে। এই মিশ্রিত পদার্থের কিছু কিছু লইয়া, পটোলের ভিতর পূর দিবে। পূর্ব্বে যে পটোলের মুখ কাটিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা ময়দা গুলিয়া, প্রত্যেক পটোলের কাটা-মুখে আঁটিয়া দিবে।

এখন, জ্বালে ঘৃত চড়াইবে ; এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে পটোল-গুলি ভাজিয়া, চিনির রসে ডুবাইয়া, তুলিয়া লইবে। রসে দুই এক ফোটা গোলাপী আতর মিশাইয়া লইলে, পট্‌লি আর-ও উপাদেয় হইবে।

বিপ্র-ভোগ।

ভাল টাট্কা ছানা কাপড়ে নিংড়াইয়া, তাহার জল গালিয়া ফেলিবে। এখন, তাহাতে খাসা ময়দা কিংবা আরারুটের বাঁধন দিয়া, ভাল করিয়া চট্‌কাইবে। এদিকে পেস্তার খোসা ছাড়াইয়া, তাহা বাটিয়া রাখিবে।

বিপ্র-ভোগে খাঁটি দুগ্ধ ব্যবহার করিতে হয়। দুধ জ্বালে গাঢ় হইলে, অর্থাৎ পাতলা ক্ষীরের আকারে পরিণত হইলে, তাহাতে পরিমাণ মত ভাল চিনি দিবে। কাশীর দো-বোরা হইলে-ই ভাল হয়। ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, উনানের পাশে রাখিয়া দিবে।

এখন, ছানার এক্ একটি লেচি কাটিবে ; লেচিগুলি যেন বড় হয়। এই লেচি পাকাইয়া গোল করিবে, এবং কচুরির ভিতর যেমন দাইলের পূর দিয়া থাকে, সেইরূপ বাটা-পেস্তা ও মোটা সন্দেশ অর্থাৎ যাহাতে প্রায়ই ছানা ব্যবহার হয় না, যাহা নৈবেদ্যে ব্যবহৃত হয়, সেই সন্দেশের পূর দিবে। এইরূপ সন্দে-শের পূর দিলে, উহার ভিতর রস প্রবিষ্ট হইলে, সন্দেশ গলিয়া সেই স্থানে

রসে পূর্ণ হইয়া যাইবে। পেস্তার পূরের সহিত সামান্য জয়িত্রী ও ছোট এলাচের গুঁড়া এবং জাফরাণ দিবে। রসগোল্লার ভিতর যে, রাশি-সন্দেশের পূর দেওয়া হয়, তাহা-ও এই রস-সঞ্চারের জন্য। সে যাহা হউক, ছানায় পূর দেওয়া হইলে, তাহা কচুরির মত চেপ্টা করিয়া, ঘৃতে ভাজিবে। ঘৃত যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট হইবে, বিপ্র-ভোগ-ও যে, সেই পরিমাণে উপাদেয় হইবে, তাহা যেন মনে থাকে। ভাজিবার সময়, পাক-পাত্র মধ্যে মধ্যে উনান হইতে নামাইয়া, মাটিতে রাখিবে; কারণ, ক্রমাগত জ্বালের উপর থাকিলে, ভালরূপ সুপক্ব হয় না। অল্পক্ষণ নামাইয়া রাখিলে, গরম ঘৃতের দমে উহা উত্তমরূপ সুসিদ্ধ হয়। এইরূপ এক এক খোলা ভাজা হইলে, ঝাঁঝরা হাতা করিয়া, তাহা তুলিয়া, পূর্ব্ব-রক্ষিত ক্ষীরে ডুবাইয়া দিবে। এইরূপে সমুদয়গুলি ভাজিয়া, ক্ষীরে ডুবাইবে। অনন্তর, অল্প পরিমিত চিনিতে দুই চারি ফোটা গোলাপী আতর মিশাইয়া, ক্ষীরে ছড়াইয়া দিবে। এই সময় ধীরে ধীরে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিলে ভাল হয়; কারণ, আতর উত্তমরূপ মিশ্রিত হইতে পারে। এইরূপ, পূরের সহিত-ও আতর ব্যবহার করিতে পারা যায়। যাঁহাদের আতর ব্যবহারে আপত্তি থাকে, তাঁহারা উহার পরিবর্ত্তে, পরিমাণ বুঝিয়া, কর্পূর ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু, আতর কিংবা কর্পূরের পরিমাণ অধিক দিলে, উহার তিক্ত আস্বাদ হইবে। যে ক্ষীরে বিপ্র-ভোগ ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে, ইচ্ছা হইলে, তাহাতে সরু সরু আকারে কাটিয়া, বাদাম ও পেস্তার কুঁচি-ও দিতে পারা যায়।

বিপ্র-ভোগ অতি পবিত্র মিষ্ট দ্রব্য। ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিলে, উহার আস্বাদ সহসা ভুলিতে পারা যায় না।
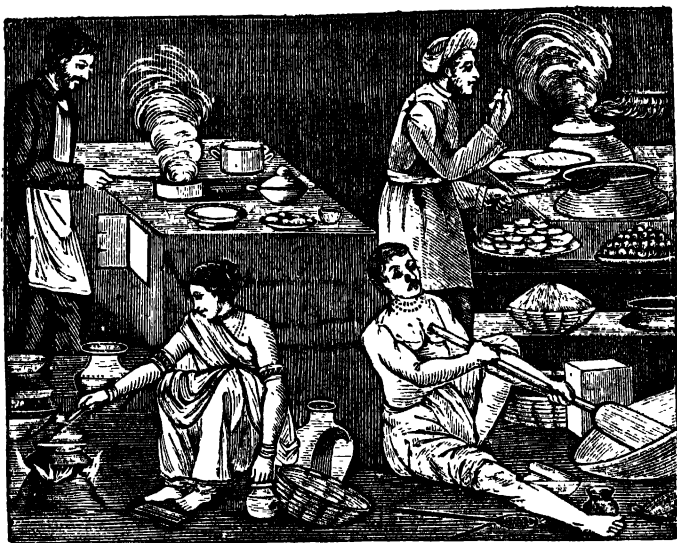
পাক-প্রণালী।

মিষ্টান্ন

আজকাল যত রোগের সৃষ্টি হইতেছে, পূর্ব্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। কেবলমাত্র, যে, জল-বায়ুর দোষে রোগের অধিকার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা নহে; দূষিত খাদ্য আহার, তাহার একটি অন্যতম কারণ। পূর্ব্বে সুলভ মূল্যে খাদ্য-দ্রব্য পাওয়া যাইত, সুতরাং তাহাতে কোন প্রকার ভেজাল চালাইতে লোকের প্রবৃত্তি হইত না। এখন দ্রব্যের মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভেজাল-ও বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং বিশুদ্ধ খাদ্য এক-প্রকার দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে বলিলে-ও অত্যুক্তি হয় না।

এদেশে দুগ্ধ ও ঘৃতজাত মিষ্টান্ন লোকে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে; দুঃখের বিষয় এই যে, এই পবিত্র খাদ্য দিন দিন যেরূপ বিদূষিত ও অস্বাস্থ্য-কর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে দেশের স্বাস্থ্য যে, বিনষ্ট হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এ সম্বন্ধে স্বাস্থ্য-পত্র যথার্থ-ই বলিয়াছেন। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় প্রস্তাব নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মিঠাই প্রভৃতি মিষ্টান্ন না পাইলে, ছেলেরা ছাড়ে না, কাঁদিয়া পিতা-মাতা আত্মীয়বর্গকে অস্থির করে। শুদ্ধ ছেলেদের দোষ দিলে-ই বা চলিবে কেন? আমাদের-ও দোকানের খাবার না খাইলে চলে না। অথচ দোকানের খাবার খাইয়া-ই, আমরা অনেক রোগকে ডাকিয়া আনি। অম্লের পীড়া ত বাজারের খাবার খাইয়াই হয়। সহরের বার আনা লোকের অম্লের পীড়া, ইহা ত সকলে-ই দেখিতেছেন। কিন্তু তাহার প্রতিবিধানের উপায় কি? কয়জন লোক, গৃহে মিঠাই প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া, রসনা তৃপ্ত করিতে পারেন? ঘৃত, চিনি ও ময়দা একত্র পাক করিয়া-ই অধিকাংশ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। এই তিন দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে অধিক পরিমাণে আহার করিলে-ও কোন পীড়া জন্মে না। কিন্তু, যখন-ই তিনে এক হইয়া, পাক হয়, তখন-ই তাহা গুরু-পাক হইয়া উঠে, সহজে আর হজম হইতে চাহে না।

একে ত মিঠাই প্রভৃতি সহজে গুরু-পাক, তাহার উপর যদি ঐ সকল দ্রব্য বিশুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ত সোণায় সোহাগা হইল। সহরে বা মফস্বলে, যত মিঠাইকার দেখিবে, সকলের-ই পুঁজি অল্প। কাজে-ই দু'টাকা লাভ করিবার জন্য, তাহারা খুঁজিয়া খুঁজিয়া, যত জঘন্য ঘৃত, চিনি ও ময়দা অল্প মূল্যে খরিদ করিয়া, খাদ্য প্রস্তুত করে। ইহাতে-ও যদি পীড়া না হইবে, তবে হইবে কিসে? তাহার উপর রাস্তার যত ধূলা উড়িয়া, মিঠাই আদির কলেবর পুষ্ট করে!

দোকানের কড়াই প্রভৃতি মিষ্টান্ন-প্রস্তুতের আধারগুলি যিনি স্বচক্ষে মনোযোগের সহিত দেখিয়াছেন, তিনি-ই জানেন, ঐগুলি কিরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন! ভেজাল দেওয়া ঘৃত ব্যবহার করিলে, আইনানুসারে দণ্ড হয় সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সেরূপ দৃষ্টি আছে কি? হেল্‌থ অফিসারের এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। আর আমাদের বাবুরা-ই বা কি করিতেছেন? তাঁহারা দরজিকুল উদ্ধার করিয়াছেন। মুসলমান দরজির দোকান

ত আর দেখা যায় না। কাপড়ের দোকান-ও অনেকে করিয়াছেন। ভাল-রকম মিষ্টান্নের দোকান করিলে কি চলে না? ভাল মাল মসলা ব্যবহার করিয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে মিঠাইয়ের দোকান করিলে, না চলিবার কোন কারণ দেখা যায় না। গ্লাসকেসের ভিতর জ্যাকেট, বডি, ফুলদার শাটী রাখিয়া, যদি ব্যবসা চলে, তবে গ্লাসকেসে ভাল ভাল মিঠাই প্রভৃতি মিষ্টান্ন রাখিয়া, রাস্তার ধূলার হাত হইতে সেগুলিকে রক্ষা করিয়া, ব্যবসা করিলে, নিশ্চয়-ই লাভ হইতে পারে। দশ পনর টাকা বেতনে সামান্য চাকরী করা অপেক্ষা, এরূপ কার্য্যে লাভ ও সম্ভ্রম আছে বলিয়া-ই আমাদের বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে স্বজনগণের স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়েও সহায়তা করা হয়।”

আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষিত লোক খাদ্যের ব্যবসা করিলে, দেশের প্রভূত উপকার হইবার কথা। অশিক্ষিত ব্যবসায়িগণ মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়া, কোন প্রকার খাদ্যাদির আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা পুরুষানুক্রমে যে যে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে, তাহা-ই লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছে। লোকের স্বাস্থ্য ও রুচি বুঝিয়া, তাহারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে না; এই জন্য-ই মিষ্টান্নের কোন প্রকার উন্নতি দেখা যায় না।

মুগের ঘণ্ট।

মুগের ডাইলের ন্যায় মুগের ঘণ্ট একটি উপাদেয় ব্যঞ্জন। সামিষ ও নিরামিষ-ভেদে মুগের ঘণ্ট দুই-প্রকার। ভোক্তাগণ ইচ্ছা-অনুসারে উভয় প্রকার নিয়মে-ই রন্ধন করিতে পারেন।

প্রথমে আস্ত মুগ ঝাড়িয়া বাছিয়া, ভাসা জলে ভিজাইয়া রাখিবে। মুগ জলে উত্তমরূপ ভিজিয়া আসিলে, জল হইতে তুলিয়া, তাহা পুনর্ব্বার জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে। এখন, উহা একটি চুবড়ি অথবা অন্য কোন পাত্রে এরূপ ভাবে রাখিবে, যেন উহার জল ঝড়িয়া পড়ে।

এদিকে, মুগের পরিমাণ বুঝিয়া, আলুর খোসা ছাড়াইয়া, ডুমো ডুমো করিয়া কুটিয়া রাখিবে। আলু কুটিয়া যে, জলে ধুইয়া রাখিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে।

এখন পাক-পাত্রে ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে আলুগুলি কসিয়া রাখিবে। আলু কসা হইলে, তাহা নামাইয়া রাখিয়া, পাক-পাত্রে পুনর্ব্বার ঘৃত কিংবা তৈল দিবে। এই ঘৃত বা তৈলে মুগ কসিয়া লইবে। অনন্তর, মুগ নামাইয়া, পাক-পাত্রে ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে বসাইবে। পুনর্ব্বার যদি সম্বরা দেওয়ার ইচ্ছা না কর, তবে ঘৃতাদি পাকিয়া আসিলে, তাহাতে লঙ্কা, তেজপাত ফোড়ন দিয়া, হরিদ্রা-বাটা, আদা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, ধনে-বাটা, এবং জীরামরীচ-বাটা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। মসলা-গুলি ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে পরিমাণ-মত জল ঢালিয়া দিবে। জ্বালে জল ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে মুগ ও আলুগুলি ঢালিয়া দিবে। এবং অল্পক্ষণ পরে উহাতে সামান্য চিনি, বাতাসা অথবা গুড় ও পরিমাণ-মত লবণ দিয়া, একবার ভাল করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। কিছুক্ষণ জ্বালে থাকিলে, আলু সুসিদ্ধ হইয়া, ব্যঞ্জন বেশ থক্-থকে হইয়া আসিবে। এই সময় উহা জ্বাল হইতে নামাইবে। নামাইয়া উহাতে গরম-মসলা বাটা কিংবা গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে।

পূর্ব্বে যদি সম্বরা না দিয়া, রাঁধিতে ইচ্ছা কর, তবে যখন দেখিবে, মুগ ও আলু সুসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, অথচ অধিক ঝোল নাই, সেই সময় সম্বরা দিবে।

সামিষ ঘণ্ট রাঁধিতে হইলে, মুড়ি-ঘণ্ট রাঁধিবার ন্যায়, উহার সহিত মাছের মুড় তৈলে ভাজিয়া, উহাতে ভাঙ্গিয়া দিবে। সামিষ মুগের ঘণ্ট যার-পর-নাই মুখরোচক, কিন্তু গুরু-পাক।

দুধে-খিচুড়ি।

এই খিচুড়িতে দুধ ব্যবহৃত হয় বলিয়া, ইহাকে দুধে-খিচুড়ি কহিয়া থাকে। দুধে-খিচুড়ি রাঁধিবার পক্ষে খাঁড়ি মসুরের দাইল হইলে-ই ভাল হয়; তদভাবে সোণা মুগ দ্বারা রাঁধিলে চলিতে পারে।

দুধে-খিচুড়ির চাল-ডাল ঘৃতে কসিয়া না লইলে-ও চলিতে পারে। চাল-ডালের পরিমাণ বুঝিয়া, পাক-পাত্রে জল দিয়া, জ্বালে বসাইবে। জল গরম হইলে, তাহাতে চাল-ডাল, হরিদ্রা, লঙ্কা, আদা, তেজপাত, দারচিনি, লবঙ্গ,

ছোট এলাচ প্রভৃতি মসলা ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। পিয়াজ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহা-ও এই সঙ্গে দিতে পার।

যখন দেখিবে, খিচুড়ি খুব ফুটিতেছে, অর্থাৎ ভাত নরম হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে দুধ ও লবণ ঢালিয়া দিয়া, একবার বেশ করিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে।

এখন, ঘৃতে তেজপাত, লঙ্কা, লবঙ্গ এবং ছোট এলাচের দানা ফোড়ন দিয়া, খিচুড়ি সম্বরা দিবে। ইচ্ছা করিলে, এই সঙ্গে পিয়াজের কুচি-ও দিতে পার। সম্বরার পর অধিকক্ষণ খিচুড়ি জ্বালে রাখিবার প্রয়োজন হয় না।

কলাই শুঁটির গলা খিচুড়ি।

এই খিচুড়িতে দাউল অপেক্ষা চাউলের পরিমাণ কম লইতে হয়; অর্থাৎ যে পরিমাণ চাউল, তাহার তিন ভাগ দাউল লইবে। ঘৃত-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম মনে রাখিবে যে, সের প্রতি আধ পোয়া হইতে আধ সের পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। আর কলাই শুঁটি-ও সের প্রতি তিন পোয়া হিসাবে খিচুড়ি রাঁধিবে।

প্রথমে কলাই শুঁটি ছাড়াইয়া, তাহার খোসা পরিষ্কৃত করিবে। কলাই শুঁটিতে একটু লবণ মাখিয়া রাখিবে, পরে তাহা দলিলে, সহজে-ই খোসা ছাড়িয়া যাইবে। এখন, উহা ভাসা জলে ধুইয়া রাখিবে।

চাল-ডাল-ও হাত-বাছা করিয়া লইবে। এখন, খিচুড়ির ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া, পাকাইয়া লইবে। যদি খিচুড়িতে পিয়াজ দিতে ইচ্ছা কর, তবে এই সময় তাহা, লাল্‌ছে ধরণে ভাজিয়া, তুলিয়া রাখিবে। অনন্তর, ঘৃতে তেজপাত, লঙ্কা, এবং গরম-মসলা ফোড়ন দিয়া, তাহাতে চাল-ডাল ঢালিয়া দিবে। দুই একটি দানা ফুটিতে আরম্ভ করিলে-ই, তাহাতে গরম জল ঢালিয়া দিবে।

জ্বালে খিচুড়ি ফুটিতে আরম্ভ করিলে, হরিদ্রা ও লঙ্কা-বাটা দিবে। এই সময় হইতে মধ্যে মধ্যে খিচুড়ি নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। অনন্তর, কলাই শুঁটি, পিয়াজ এবং লবণ খিচুড়িতে ঢালিয়া দিয়া, ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। এখন হইতে উনানে জ্বালের আঁচ কমাইয়া দিবে। যখন দেখিবে, খিচুড়ি বেশ থক্‌-থকে হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহা উনান হইতে নামাইবে।

পটোল ঘণ্ট।

পটোল দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জন পাক হইয়া থাকে। পোড়া হইতে চাটনি পর্য্যন্ত সকল প্রকার খাদ্যে পটোল ব্যবহার করিতে পারা যায়। বেশ পুরন্ত পটোল বাছিয়া লইয়া, তাহার খোসা ছাড়াইবে। পটোল যদি পাকা গোছের হয়, তবে একটু বাধাইয়া, খোসা ফেলিবে। পটোলের ন্যায় আলুর-ও খোসা ছাড়াইবে। আলুগুলি ছোট ডুমা এবং পটোল কুচি কুচি করিয়া কুটিয়া, জলে ধুইয়া লইবে।

এদিকে, উনানে পাক-পাত্রে ঘৃত কিংবা তৈল চড়াইয়া, পাকাইয়া লইবে। এখন, তাহাতে আলু-পটোলগুলি ঢালিয়া দিবে, এবং মধ্যে মধ্যে একবার নাড়িবে। জ্বালে উহা, বেশ খড়-খড়ে গোছের ভাজা ভাজা হইলে, হরিদ্রা, লবণ, জীরামরীচ-বাটা এবং ধনে-বাটা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। অনেকে ব্যঞ্জন-রন্ধনে বাটা মসলা প্রায়-ই জলে গুলিয়া দিয়া থাকেন; কিন্তু তাহাতে মসলার একটা কাঁচা গন্ধ থাকিবার সম্ভাবনা। এজন্য, তরকারি কসিবার অবস্থায় অর্থাৎ তরকারি যখন বার আনা গোছের কসা হইয়াছে, তখন বাটা মসলা জলে না গুলিয়া, ঘৃত কিংবা তৈলে ভাজিয়া, পরে জল দিবে, ব্যঞ্জন অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু হইয়া থাকে। যাহা হউক, তরকারি ও মসলা কসা হইলে, তাহাতে পরিমিত জল ঢালিয়া দিবে। অনন্তর আদা-বাটা, দুধ ও চিনি ব্যঞ্জনে ঢালিয়া দিয়া, একবার উত্তমরূপ নাড়িয়া চাড়িয়া, উনান হইতে নামাইবে।

অতঃপর, পাক-পাত্রে ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে চড়াইয়া, তাহাতে তেজপাত ও জীরা ফোড়ন দিয়া, ব্যঞ্জন ঢালিয়া দিবে। অল্পক্ষণ ফুটিয়া আসিলে, তাহা নামা-ইয়া লইবে, পটোল ঘণ্ট পাক হইল।

কদমফুলের কোর্ম্মা।

কদমফুলের কুঁড়ির অবস্থায় কোর্ম্মা রাঁধিতে হয়। ফুল সম্পূর্ণ ফুটিয়া গেলে, তাহাতে কোর্ম্মা ভাল হয় না। কদমফুলের উত্তম অম্বল-ও পাক হইয়া থাকে।

প্রথমে, ফুলের কুঁড়িগুলি বাছিয়া, ভাসা জলে ধুইয়া লইবে। পরে, তাহা জলে

একবার ভাপাইয়া লইবে। এখন ঘৃত অথবা তৈল জ্বালে চড়াইয়া, তাহাতে তেজপাত, দারচিনির কুচি, লবঙ্গ, আদার কুচি, পিঁয়াজের (রুচি হইলে) কুচি ফেলিয়া দিবে। মসলা সকল ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে ফুলের কুঁড়িগুলি ঢালিয়া দিয়া, সামান্যরূপ ভাজিয়া বা কসিয়া লইবে। এখন, হরিদ্রা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, আদা-বাটা, ধনে-বাটা এবং সামান্য চিনি ও দৈ ঢালিয়া দিবে। দুই একবার ফুটিয়া উঠিলে, প্রয়োজন বুঝিয়া, অল্প জল ও পরিমাণ-মত লবণ দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। যখন দেখিবে, জ্বালে জল মরিয়া গা-মাখা গোছের হইয়া আসিয়াছে, তখন উনান হইতে পাক-পাত্র নামাইয়া, কোর্ম্মাতে অল্প পরিমাণে গরম মসলার গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে-ই, কদমফুলের কোর্ম্মা পাক শেষ হইল।

ইচ্ছা করিলে, আলু ডুমা ডুমা করিয়া কুটিয়া, কোর্ম্মাতে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

মুগ বেগুনি।

মুগের দাইল দ্বারা পাক করিতে হয় বলিয়া, ইহাকে মুগবেগুনি কহিয়া থাকে। মুগের কাঁচা দাইল, জলে ভিজাইয়া, তাহার খোসা তুলিবে। পরে, তাহা চন্দনের মত করিয়া বাটিবে। এই ডাইল-বাটাতে তিল, লবণ, কিছু সফেদা এবং লঙ্কা-বাটা মিশাইয়া, খুব ফেনাইবে।

এখন, পাক-পাত্র জ্বালে চড়াইয়া, তাহাতে ঘৃত অথবা তৈল দিবে। জ্বালে উহা পাকিয়া আসিলে, এক একখানি বেগুনের ফালি, গোলাতে ডুবাইয়া, ঘৃতে ছাড়িবে। এক পিঠ ভাজা হইলে, উল্টাইয়া দিবে। এইরূপে দুই পিঠ ভাজা হইলে, তুলিয়া লইবে। গরম গরম এই বেগুনি উত্তম সুখাদ্য।

বেগুনের ন্যায় পটোল, বিলাতি কুমড়া প্রভৃতি তরকারীর লম্বা ফালি করিয়া, এইরূপ নিয়মে ভাজিয়া লইতে পারা যায়। মুগের ন্যায় কাঁচা কলাই-দাইলের-ও লিখিত নিয়মে বেগুনি ভাজিয়া লইতে পারা যায়। খিচুড়ির সহিত বেগুনি বেশ সুখাদ্য হইয়া থাকে।

থোড়ের ছেঁচ্‌কি।

থোড় মাত্রে-ই সুখাদ্য নহে। কচি থোড় দ্বারা নানাবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে থোড় কুটিয়া, তাহাতে একটু লবণ মাখিয়া রাখিবে। পরে তাহা নিংড়াইয়া লইবে। এরূপ করিলে, থোড়ের জল বাহির হইবে, অথচ উহা বেশ মোলায়েম হইয়া আসিবে। আর যদি প্রথমে লবণ না মাখাও, তবে কোটা থোড় জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে। এবং ঠাণ্ডা হইলে, উহা নিংড়াইয়া রাখিবে।

এদিকে, তৈল জ্বালে বসাইয়া, তাহাতে লঙ্কা ও সরিষা ফোড়ন দিবে। পরে, তাহাতে থোড় ঢালিয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। একটু ভাজা ভাজা হইলে, লবণ, লঙ্কা-বাটা এবং নারিকেলের কুচি থোড়ের উপর ঢালিয়া দিবে। এবং মধ্যে মধ্যে নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে, ভাজা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে সরিষাবাটা দিয়া, নাড়িয়া দিবে। অনন্তর, উহা উনান হইতে নামাইয়া লইলে-ই, থোড়ের ছেঁচ্‌কি পাক হইল। এই ছেঁচ্‌কি বেশ মুখ-রোচক।

ফুলকপির রোষ্ট।

একটি ফুলকপির পাপড়িগুলি ডুমা ডুমা করিয়া কুটিয়া, জলে ধুইয়া রাখ। এখন, মাখন কিংবা ঘৃত পাক-পাত্রে দিয়া, জ্বালে চড়াও। ঘৃতাদি পাকিয়া আসিলে, তাহাতে কপিগুলি ছাড়িয়া দিবে। ভাজা হইলে-ই, তুলিয়া লইবে। কিন্তু, কোন কোন দেশে কপিগুলি এরূপ নিয়মে না ভাজিয়া, প্রথমে গরম জলের তাপে অল্প সিদ্ধ করিয়া, পরে ভাজিয়া থাকেন। অনন্তর, পরিমাণ-মত মাখন অথবা ঘৃত, লবণ এবং ছোট এলাচের গুঁড়া একত্রে গুলিয়া, ঐ কপিতে মাখিয়া লইয়া, আহার করিতে হয়।

আলুর বোমা।

দাগী ও পচা না হয়, এরূপ আলু খোসা-সহ জলে সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে, জ্বাল হইতে নামাইয়া, আলুর খোসা ছাড়াইয়া, উহা চট্‌কাইবে।

চপের আলুর ন্যায়, উহা খিচ-শূন্য করিয়া চট্‌কাইবে না। এখন, তাহাতে কাঁচা-লঙ্কার কুচি ও লবণ এবং আদা-বাটা মিশাইয়া চট্‌কাইবে। পরে, তাহা গোল করিয়া পাকাইবে।

এদিকে, মটর ডা'ল ভিজাইয়া, তাহা চন্দনের মত করিয়া বাটিবে। এই ডা'ল-বাটা অল্প জলে গুলিয়া, গোলা প্রস্তুত করিবে। গোলাতে পরিমাণ-মত লবণ মিশাইয়া, বেশ করিয়া, ফেটাইয়া লইবে। এখন, এই গোলাতে এক একটি আলুর বোমা ডুবাইয়া, ঘৃত কিংবা খাঁটি সরিষার তৈলে ভাজিয়া, তুলিয়া লইলে-ই, আলুর বোমা পাক হইল। নিরামিষ আহারে এই বোমা বেশ মুখ-রোচক সুখাদ্য।

যাঁহারা পিয়াজ আহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা পিয়াজের কুচা ঘৃতে ভাজিয়া, আলুর সহিত মাখিয়া, বোমা প্রস্তুত করিবেন। পিয়াজ না ভাজিয়া, কাঁচা পিয়াজ বাটিয়া-ও, ব্যবহার করিতে পারা যায়।

পূরদার করলা।

নিরামিষ আহারে পূরদার করলা একটি উপাদেয় খাদ্য। প্রথমে, বড় বড় কচি করলা বাছিয়া লইবে। এখন, এক দিকের মুখ গোলভাবে কাটিবে। কাটিয়া, ভিতরের শাঁস ও বিচি বাহির করিয়া ফেলিবে। বিচি ও শাঁস বাহির করিলে, করলার খোল প্রস্তুত হইবে।

এদিকে, আম-আদা, কাঁচা-লঙ্কা এবং মৌরী অল্প থেঁত করিয়া, তাহাতে লবণ মাখাইয়া, পূর প্রস্তুত করিবে। এখন, এই পূর করলার ভিতর পূরিয়া দিবে। পূর দেওয়া হইলে, পূর্ব্ব-কর্ত্তিত মুখ বা চাক্তি ময়দা (একটু ঘন) জলে গুলিয়া, অথবা মিহি মটর ডা'ল-বাটাতে যোড়-মুখ আঁটিয়া দিবে। অনন্তর, ঘৃতে কিংবা তৈলে ভাজিয়া লইবে। এই ভাজা করলাকে পূরদার করলা কহে। ইহা অত্যন্ত মুখ-প্রিয়, এমন কি, অরুচির রুচি করে।

চিত্ত-তোষ।

বড় বড় আলু বাছিয়া লইবে। পরে তাহার খোসা ছাড়াইয়া,

তিন ভাগ রাখিয়া, একভাগ কাটিবে। এখন বড় খণ্ডটির ভিতর ছুরি দ্বারা কুরিয়া, একটী বাটীর মত করিবে।

এদিকে ভাল টাট্‌কা ছানার জল নিংড়াইয়া, তাহা চট্‌কাইবে। পরে তাহাতে লবণ, হরিদ্রা, আদা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, পিয়াজ-বাটা (ইচ্ছা করিলে ত্যাগ করিতে পার) চট্‌কাইয়া মাখিবে। এখন এই ছানা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে।

পূর্ব্বে আলুর যে খোল বা বাটী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ, এখন তাহার মধ্যে ছানা ভাজা পূরিয়া দিবে। আলুর যে, একখানি চাকৃতি বা খণ্ড কাটিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা আলুর কাটা-মুখে যুড়িয়া দিবে। ময়দা একটু ঘন করিয়া জলে গুলিয়া, যোড়-মুখে দিলে, আঁটিয়া যাইবে। এই আলু ঘৃতে ভাজিয়া, নামাইয়া লইবে।

আলু ভাজা হইলে, অবশিষ্ট যে ঘৃত থাকিবে, তাহাতে লঙ্কা-বাটা, আদা-বাটা, হরিদ্রা-বাটা, পিয়াজ-বাটা (রুচি হইলে), ধনে-বাটা দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। দুই একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহাতে দধি ঢালিয়া দিয়া, পুনর্ব্বার নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে, ঘৃতে মসলাদির বেশ রঙ্‌ হইয়াছে, এবং গন্ধে ঘর ভর্‌ ভর্‌ করিতেছে, তখন তাহাতে অল্প (আলুর পরিমাণ বুঝিয়া) জল ঢালিয়া দিবে। জ্বালে উহা ফুটিতে থাকিলে, তাহাতে আলু-ভাজা আস্তে আস্তে ছাড়িবে। জল মরিয়া, গা-মাখা গা-মাখা গোছের ঝোল থাকিতে থাকিতে, পাক-পাত্র উনান হইতে নামাইবে। এবং গরম-মসলার গুঁড়া আলুর উপর ছড়াইয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, আলুর চিত্ত-তোষ পাক হইল।

সামিষ ও নিরামিষ ভেদে চিত্ত-তোষ দুই প্রকার ; অর্থাৎ ছানা ও খোয়া ক্ষীর প্রভৃতির পুর দিয়া পাক করিলে, নিরামিষ চিত্ত-তোষ প্রস্তুত হইবে, আর মাছ কিংবা মাংসের পুর দিয়া রাঁধিলে, আমিষ চিত্ত-তোষ তৈয়ার হইবে।

মাছ কিংবা মাংসের কিমা প্রস্তুত করিয়া, (যেরূপ নিয়মে চপ তৈয়ার করিতে হয়, সেইরূপ নিয়মে কিমা প্রস্তুত করিবে) এবং আলুর ভিতর ছানার পুর না দিয়া, মাছ অথবা মাংসের কিমা দ্বারা পুর দিবে। পুরের পরিমাণ একটু বেশী করিয়া দিবে। কারণ, পুর যত অধিক হইবে, উহা খাইতে তত-ই সুখাদ্য বোধ হইবে।

গল্‌দাচিংড়ির খমীরা।

প্রথমে চিংড়ির খোলা ছাড়াইয়া, মাথা বাদ দিয়া, মাছটি টুকরা টুকরা করিয়া, জলে সিদ্ধ কর; অনন্তর, ময়দা দুধে গুলিয়া জ্বালে চড়াও এবং কাটির দ্বারা নাড়িতে থাক। গাঢ় হইয়া আসিলে, তাহাতে পরিমিত মাখন ঢালিয়া দাও; পুনরায় নাড়িতে থাক। যখন দেখিবে, বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে, তখন নামাইয়া, ডিমের হরিদ্রাংশ উহার সহিত মিশাও। তার পর, উহাতে পরিমাণ-মত গরম-মসলার গুঁড়া এবং আদা ও পিয়াজের রস, উত্তমরূপে মিশাইয়া, জ্বাল হইতে নামাইয়া রাখ।

ঠাণ্ডা হইলে, ঐ ময়দার এক একটি ছোট লেচি প্রস্তুত কর, এই লেচির মধ্যে এক এক টুকরা সিদ্ধ মাছের পূর দিয়া, গোল গোল করিয়া পাকাইয়া রাখ; এইবার মাখন কিংবা ঘৃতে ভাজিয়া লও।

কেহ কেহ আবার সিদ্ধ মাছ, বাটিয়া কিংবা চট্‌কাইয়া, ঘৃতে কসিয়া লইয়া থাকেন। কসিবার সময় যে, মাছে লবণ ও লঙ্কা প্রভৃতি মসলা দিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। আবার গোলকগুলি ঘৃতে ভাজিবার সময় চপের ন্যায় ডিমে ডুবাইয়া, বিস্কুটের গুঁড়া মাখাইয়া লইলে, উহা আর-ও উপাদেয় হইয়া থাকে। ভোক্তাগণ উভয়বিধ নিয়মে এই খমীরা পাক করিয়া রসনার তৃপ্তি-সাধন করিতে পারেন।

মাছের চম্‌চম্।

রুই, কাৎলা কিংবা মৃগেল প্রভৃতি মাছের নিকাঁটা অংশ, কুটিয়া ধুইয়া, তৈলে ঈষৎ ভাজিয়া লও। এ দিকে, মাছের পরিমাণ বুঝিয়া, আলু সিদ্ধ করিয়া, খোসা চাড়াইয়া, চট্‌কাইয়া বা বাটিয়া লও। ভাজা মাছের কাঁটা বাছিয়া, তাহার সহিত আলু মিশ্রিত কর, এবং উহাতে অল্প দুধ, পিয়াজ-বাটা, আদা-বাটা, পাঁউ-রুটির শাঁস, * এবং পরিমাণ মত লবণ মিশাইয়া, উত্তমরূপ চট্‌কাইয়া, বেশ আটা গোছের করিয়া লও; পরে মাছের পরিমাণ-মত দুই একটী ডিমের

* রুচি অনুসারে পিয়াজ ও পাঁউরুটী ত্যাগ করিতে পার; এবং ঘৃতের পরিবর্তে খাঁটি সরিষার তৈলে-ও ভাজিতে পারা যায়।

তরলাংশ ফেনাইয়া, উক্ত মিশ্রিত পদার্থে মাখাও। অনন্তর, উহা দ্বারা এক একটি চম্‌চম্ গড়াইয়া, ঘৃতে বাদামী ধরণে ভাজিয়া লইবে। এই চম্‌চম্ কুসুম কুসুম গরম অবস্থায় অত্যন্ত মুখ-রোচক।

ডিম-মাছ-ভাজা।

পাকা মাছের আধ সের আন্দাজ পেটী লইয়া, লম্বা লম্বা তিন চারি খণ্ড কর। পরে ডিমের তরলাংশের সহিত আদা-বাটা, পিয়াজ-বাটা, পাঁউরুটির শাঁস, মরীচের গুঁড়া ও লবণ মিশাইয়া, একটি পাত্রে রাখ। এখন মাছগুলি উহাতে ডুবাইয়া, মাখন কিংবা ঘৃতে ভাজিয়া লও। গরম গরম উহা বেশ সুখাদ্য। পোলাও কিংবা খিচুড়ির সহিত এই ভাজা খাইতে হয়।

পাঁটার ফড়া কাবাব।

পাঁটার পশ্চাৎ দিকের ফড়া লইয়া, পরিমাণ মত আদা, হরিদ্রা ও পিয়াজ বাটা এবং দধি একটি পাত্রে রাখিবে। এখন, একটি লোহার সুঁচল খোঁচা লইয়া, ঐ ফড়াটির এ-পিঠ ও-পিঠ ক্রমাগত খোঁচাইতে থাকিবে। অনন্তর, তিন ঘণ্টাকাল ঐ মসলায় ফেলিয়া রাখিয়া, মধ্যে মধ্যে খোঁচাইতে থাকিবে। পরে উহা ঘৃতে বাদামী রংএ ভাজিয়া লইবে। অনন্তর, জ্বালে ঘৃত চড়াইয়া, আদা, পিয়াজ ও লঙ্কা বাটা ঢালিয়া দিয়া, নাড়া-চাড়া করিতে থাকিবে। জ্বালে থাকিয়া, মাংস লাল্‌ছে বর্ণ হইয়া আসিলে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে দধি-মিশান মসলার ছিটা মারিতে থাকিবে। অনন্তর সুপক্ক হইলে, নামাইয়া লইবে। পরিবেষণকালে, ছুরি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া, ভোক্তাদিগের পাতে দিবে।

পাঁটার মেটে-ভাজা।

উপকরণ ও পরিমাণ—যত ওজনে মেটে হইবে, সেই পরিমাণে পিয়াজ, মাখন, ডিম, ছোট, এলাচ দারুচিনি-বাটা জিরামরীচ-বাটা, লবণ এবং সামান্য ময়দা।

প্রথমে মৃদু জ্বালে পাক-পাত্রে মাখন চড়াইয়া, মেটেগুলিতে লবণ, ময়দা,

পিয়াজ এবং মসলা-বাটা মাখাইয়া ভাজিতে থাক। এক পিঠ ভাজা হইলে, অপর পিট ভাজিয়া লও; এবং ময়দা ও মাখন অল্প জলে গুলিয়া, উহাতে ঢালিয়া দাও। এই সময় অল্প অল্প জ্বাল দিতে থাক, জল শুকাইলে নামাইয়া লও।

মাংস-ভাজা।

উপকরণ ও পরিমাণ—সাঁতলান মাংস আধসের, আলু চট্‌কান আধ পোয়া, মাখন আধ পোয়া, পরিমাণ মত গোলমরীচ-চূর্ণ, সরিষা-চূর্ণ, লবণ এবং পাঁউরুটির ছিল্‌কা।

প্রথমে মাংস সিদ্ধ কর এবং আলুর সহিত মিশাও; অনন্তর উহা লবণ, গোল-মরীচ এবং সরিষার গুঁড়া দিয়া মাখিয়া লও। এখন উহার উপর রুটির ছিল্‌কা দিয়া, মাখনে ভাজিয়া লইলে-ই, মাংস-ভাজা প্রস্তুত হইল।

মেষ-মাংসের মোরব্বা।

মেষের পাছার মাংস এক সের এবং পরিমাণ মত মাখন, ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে বাটা, লবণ ও পাতিলেবুর রস।

প্রথমে মাংসের খণ্ডগুলি পরিমিত জলে, মৃদু জ্বালে উত্তমরূপে সিদ্ধ কর। অনন্তর, জ্বাল হইতে নামাইয়া, ঠাণ্ডা হইলে, হাড়গুলি বাছিয়া ফেল; এখন মাংসের সহিত সমুদয় মসলা ও লবণ মিশ্রিত করিয়া, মাখনের সহিত জ্বালে চড়াও। যখন দেখিবে, চুঁই চুঁই শব্দ হইতেছে, তখন উহাতে পরিমিত গরম জল ঢালিয়া দাও। এখন হইতে ক্রমাগত মাংস নাড়িতে থাক। যখন দেখিবে, জল মরিয়া কাদার মত হইয়াছে, তখন লেবুর রস দিয়া নামাইয়া লও।

কেশরান্ন।

ইহা একপ্রকার পোলাও বিশেষ। কেশরান্ন আহারে যেরূপ সুখাদ্য, আবার দেখিতে-ও সেইরূপ সুদৃশ্য। কেশরান্ন পাকের নিয়ম অতি সহজ। যে সকল চাউলে পোলাও পাক হইয়া থাকে, অর্থাৎ পুরাতন, দানাদার পেশোয়ারী, অমৃতসরী, চিনি-শর্কর, খাড়াবেড়ে অথবা মুচিরাম প্রভৃতি যে কোন চাউলে কেশরান্ন পাক করা যাইতে পারে।

প্রথমে চাউলগুলি উত্তমরূপ ঝাড়িয়া বাছিয়া, পরিষ্কৃত করিবে; পরে তাহা ভাসা জলে দুই তিনবার ধুইয়া, ভিজাইয়া রাখিবে। এদিকে জ্বালে জল চড়াইবে। যখন দেখিবে, জল খুব গরম হইয়া ফুটিতেছে, তখন তাহাতে চাউলগুলি ঢালিয়া দিয়া, ভাত রাঁধিবে। ভাত সামান্য শক্ত থাকিতে থাকিতে জ্বাল হইতে নামাইয়া, হাঁড়ির মুখে কাপড় বাঁধিয়া, ফেন ঝাড়িবে। এরূপ নিয়মে ফেন ঝাড়িবে, যেন হাঁড়িতে আদৌ জল না থাকে। এখন হাঁড়িটী একটী বিঁড়ায় বসাইয়া, মুখের কাপড় খুলিয়া ফেলিবে। এবং ভাতের পরিমাণ বুঝিয়া তাহাতে লবণ, চিনি এবং ছোট এলাচ, জয়িত্রী ও জায়ফলের গুঁড়া ছড়াইয়া দিবে। এই সময় বাদাম, পেস্তা এবং কিস্‌মিস্ (ঘৃতে ভাজিয়া) উহাতে ঢালিয়া দিয়া, হাঁড়িটী ঝাঁকাইয়া, সমুদয় উপকরণ গুলি ভাতের সহিত মিশাইবে। কিন্তু সর্ব্বদা পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। এদিকে ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া পাকাইতে থাকিবে। এই সময় জয়িত্রী, ছোট এলাচ এবং জায়ফল ঘৃতে ভাজিয়া তুলিয়া ফেলিবে। এই সকল মসলা দ্বারা দাগ করিয়া লইলে, ঘৃতে সুগন্ধ হইবে। যখন দেখিবে, ঘৃত কল-কল করিয়া ফুটিতেছে, তখন সেই ঘৃত পূর্ব্ব-প্রস্তুত অন্নের উপর ঢালিয়া দিবে। ঢালিয়া দিয়া-ই, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। অনন্তর, জাফরাণ-বাটা সামান্য কুসুম-ফুলের সহিত জলে গুলিয়া (কেহ কেহ কুসুম-ফুলের পরিবর্ত্তে নটকান ব্যবহার করিয়া-ও থাকেন) অন্নের উপর গোলভাবে ঢালিয়া দিবে, অর্থাৎ এরূপ নিয়মে ঢালিবে, যেন সমুদয় অন্নে রঙ্ না মাখা হয়; একটী গোল লাইন করিয়া ঢালিয়া দিবে। রঙ্ দেওয়া হইলে, পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। অনন্তর, পাক-পাত্রের নিম্নে চারি ধারে ও আচ্ছাদন-পাত্রের উপর কয়লা বা গুলের আগুন ছড়াইয়া দিবে। অল্পক্ষণ এইরূপ দমে থাকিলে, অন্ন সুসিদ্ধ হইবে এবং জলীয় অংশ শুষ্ক হইয়া, ভাতগুলি ঝর্-ঝরে হইবে। ভাত যাহাতে কাদা কাদা না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পরিবেষণের সময় পাক-পাত্রের মুখ খুলিয়া, উৎকৃষ্ট কেওড়া অন্নের উপর ছিটাইয়া দিবে। কেওড়ার ছিটা এরূপ নিয়মে দিবে, যেন নীচে উপর সমুদয় ভাতে লাগিতে পায়। এখন এক পাশ হইতে অন্ন তুলিয়া ভোক্তাদিগের পাতে দিবে। কেশরান্ন পরিবেষণ করিলে, ভোজন-স্থলের অপূর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে; অর্থাৎ কতক অন্ন মল্লিকা ফুলের ন্যায় সাদা ধব্-ধব্ করিতেছে, আবার কতক অন্ন হইতে বেদানার রোয়ার ন্যায়

লাল আভা নির্গত হইতেছে, এদিকে আবার কেওড়ার সুগন্ধে নাসিকা বিভোর হইতেছে! ফলতঃ কেশরান্ন কেবলমাত্র যে, নয়নের শোভা-বর্দ্ধন করে, তাহা নহে, উহা রসনায় সংযোগ হইলে, কি-প্রকার তৃপ্তি জন্মে, তাহা একবার পরীক্ষা না করিলে, বুঝিতে পারা যায় না।

নিরামিষ-ভোজীর পক্ষে কেশরান্ন অতি পবিত্র খাদ্য।

মাছের সোমশা।

রুই, কাতলা এবং মৃগেল প্রভৃতি বড় বড় মাছে সোমশা পাক করিলে, উহা যেরূপ সুখাদ্য হয়, কচি মাছে সেরূপ হয় না। বিশেষতঃ, কচি মাছে অধিক কাঁটা থাকে, কাঁটা থাকিলে তাহা আহারের সময় অত্যন্ত বিরক্তি-কর হইয়া উঠে।

উপরিউক্ত মাছের মধ্যে যে-কোন মাছ লইয়া, তাহা পরিষ্কার করিবে; অনন্তর গাদার মাছ বাদ দিয়া, অন্যান্য অংশের মাছ লইয়া জলে সিদ্ধ করিবে। কুটিবার সময় মাছের টুকরা টুকরা না করিয়া, লম্বা লম্বা এক এক খণ্ড কুটিয়া লইবে। জ্বালে মাছ সুসিদ্ধ হইলে, জল গালিয়া ফেলিবে।

যখন দেখিবে, মাছ ঠাণ্ডা হইয়াছে, তখন তাহার কাঁটা ছাড়াইয়া, সমুদয় মাছ বেশ করিয়া চট্কাইবে। এই সময় মাছের পরিমাণ বুঝিয়া, তাহাতে আদা-বাটা পিয়াজ (রুচি হইলে)-বাটা, কাঁচা-লঙ্কা-বাটা বা কুচি এবং লবণ মাখিয়া লইবে। মাছের পরিমাণ বুঝিয়া, অর্থাৎ সের প্রতি তিন চারিটী, ডিমের তরলাংশ উহাতে ঢালিয়া দিয়া, চট্কাইয়া লইবে। এখন, একখানি কানা-উঁচু পিতলের থালায় অল্প ঘৃত মাখাইয়া, তাহাতে মাছ ঢালিয়া দিয়া, সমান করিয়া দিবে। পরে আর একখানি থালা মাছের উপর ঢাকিয়া দিবে। এইরূপে মাছ ঢাকা হইলে, বরফির ন্যায় মাছ জমিয়া যাইবে। তখন থালা খুলিয়া, বরফি কাটার ন্যায় ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা দাগ দিয়া, লম্বা কিংবা চৌকা যে কোন আকারে কাটিয়া তুলিয়া লইবে।

এদিকে, কড়াতে ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে চড়াইবে। এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে মাছগুলি ভাজিয়া লইবে। এই ভাজা-মাছ দ্বারা পোলাও রাঁধিলে, অতি উপাদেয় মাছী-পোলাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। সচরাচর পোলাওয়ে

যে মাছ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা তত সুখাদ্য হয় না। পোলাও ভিন্ন, মাছের সোমশা দ্বারা অত্যন্ত তৃপ্তি-কর কালিয়া, মালাই-কারি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেহ কেহ আবার খিচুড়ী অথবা পোলাওয়ের সহিত, ভাজা অবস্থায়, সোমশা আহার করিয়া থাকেন। ফলতঃ, যে কয়েকটী নিয়মে সোমশা ব্যবহারের কথা লিখিত হইল, ভোক্তাগণ স্ব স্ব রুচি অনুসারে যেরূপে ইচ্ছা সোমশা আহার করিতে পারেন।

গল্দাচিংড়ির বড়া।

চিংড়ির দাড়া, মাথা ও পেট স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে রাখিবে। পরে পেটের খোলা ছাড়াইয়া, বেশ করিয়া বাটিয়া লইবে; এই মাছ-বাটার সহিত মাথার ঘি ও দাড়া ছেঁচিয়া রস মিশ্রিত করিবে। অনন্তর, উত্তমরূপ চট্কাইয়া, উহার সহিত আদার রস, পরিমিত লবণ এবং কিঞ্চিৎ খাঁটি সরিষার তৈল মিশ্রিত করিয়া, ফেনাইয়া লইবে।

এদিকে, কড়ায় তৈল দিয়া, জ্বালে চড়াইবে। তৈল পাকিয়া কল-কল করিলে, তাহাতে এক একটী বড়া ছাড়িতে থাকিবে। লাল্‌ছে ধরণে ভাজা হইলে, তুলিয়া লইবে। এই বড়া এরূপ সুমিষ্ট ও মোলায়েম যে, দন্ত-হীন বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আহার করিয়া, পরিতোষ লাভ করিবেন।

পায়রার কারি।

উপকরণ ও পরিমাণ।—মাংস আধ সের, ঘৃত দেড় ছটাক, লবঙ্গ-গুঁড়া আধ আনা, দারচিনির গুঁড়া এক আনা, পাঁচটি ছোট এলাচের গুঁড়া, হরিদ্রা বাটা আধ কাঁচ্চা, গোটা লবঙ্গ এক তোলা, নারিকেল-দুধ অথবা জল দেড় পোয়া।

পাক-পাত্রে সমুদয় ঘৃত জ্বালে চড়াও। ঘৃত পাকিয়া আসিলে, এলাচের গুঁড়া ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদয় মসলা উহাতে দিয়া, নাড়িতে থাক। পরে মসলার উপর মাংস ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে চাড়িতে থাক। ইচ্ছা হইলে, পিয়াজ ও আদা-বাটা-ও উহাতে দিতে পার। কিছুক্ষণ জ্বালে থাকিলে, মাংস আধ ভাজা

হইয়া আসিবে। এখন নারিকেল-দুধ কিংবা জল এবং পরিমিত লবণ ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখ।

জ্বালে মাংস সুসিদ্ধ হইলে এবং অল্প ঝোল থাকিতে থাকিতে, পাক-পাত্র নামাইয়া, মাংসে এলাচের গুঁড়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখ। অনন্তর, দশ পনর মিনিট পরে তাহা পরিবেষণ কর।

বাঁধা কপি সিদ্ধ।

ডমহেড ও নারিকুলী প্রভৃতি বাঁধা কপি বেশ সুখাদ্য। শীতকালে যখন নূতন কপি উঠে, সেই সময় উহা অতি উপাদেয় হইয়া থাকে। রৌদ্র প্রবল হইলে, অর্থাৎ ফাল্গুন মাস হইতে, কপি খাইতে তত সুখাদ্য নহে; কারণ, ঐ সময় কপিতে পোকা ধরে ও পাতা পাকিয়া উঠে।

একটী বাঁধা কপির উপরিভাগের পাকা পাতা, অর্থাৎ যে কয়েকটী পাতা সবুজ রঙের, সেই পাতাগুলি খুলিয়া ফেলিয়া দিবে। পাতা ছাড়াইয়া ফেলিতে ফেলিতে যখন দেখিবে, তালের গায়ে সাদা পাতা বাহির হইয়াছে, তখন তাহা আর খুলিয়া ফেলিবে না। এখন, আস্ত কপিটী এরূপ ভাবে চিরিবে, উহা যেন আস্ত থাকে, অথচ চিরা হইবে। অনন্তর, কপিটী জলে ধুইয়া, একটী হাঁড়িতে জল দিয়া, সিদ্ধ করিবার জন্য জ্বালে বসাইবে। কেবল মাত্র জলে সিদ্ধ করিলে, উহা তত সুখাদ্য হয় না; এজন্য জলে সামান্য চাউল ফেলিয়া দিবে। এখন উহা সিদ্ধ করিতে থাকিবে। যখন দেখিবে, কপিটী উত্তমরূপ সুসিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহা জ্বাল হইতে নামাইয়া, জল হইতে কপি তুলিয়া লইবে। এই সময়, হাতা প্রভৃতি কোন পাত্র দ্বারা কপি টিপিয়া ধরিয়া, ভিতরের জল গালিয়া ফেলিবে। কারণ, যে কোন ভাতে দেওয়া তরকারিতে জল থাকিলে, উহা জল-সপ্‌সপে হইবে, খাইতে পান্‌সে লাগিবে।

এখন, কপি চট্‌কাইয়া, তাহাতে পরিমাণ-মত খাঁটি সরিষার তৈল, লবণ-কাঁচা লঙ্কা-বাটা, * রাই সরিষা বাটা মাখিয়া লইবে। এই সকল মসলা-মাখা

* যে কোন ভাতে কিংবা পোড়াতে কাঁচা লঙ্কা ও খাঁটি সরিষার তৈল মাখাইয়া লইলে, বেশ মুখ-রোচক হইয়া থাকে।

হইলে, কপি-সিদ্ধ খাদ্যের উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। ভাতে কিংবা পোড়া, গরম ভাতের সহিত খাইতে, সুস্বাদু হইয়া থাকে। খিচুড়ীর সহিত-ও এই কপি-সিদ্ধ আহারে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

লিখিত নিয়মে ফুল কপি-ও ভাতে দিয়া আহার করিতে পারা যায়। কপির আস্ত ফুলটী অল্প চিরিয়া লইতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। ভাতে ও পোড়া প্রস্তুত করিতে সামান্য ব্যয় এবং অতি সহজ উপায়ে হইয়া থাকে, অথচ অনেক-প্রকার ব্যঞ্জন অপেক্ষা উহা অতি উপাদেয় মুখ-রোচক খাদ্য। খাদ্য-দ্রব্য-সমূহ নিত্য এক নিয়মে পাক না করিয়া, মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত করিলে, খাদ্যে রুচি জন্মে, এবং তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে-ও অনুকূল হইয়া থাকে।

দাইল-বেগুণ-ভর্ত্তা।

বেগুণ পোড়া, ভাতে, ভাজা এবং ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাকা বেগুণ এক-প্রকার অখাদ্য বলিলে-ও হয়। তবে কেহ কেহ ফাল্গুন মাসে, নিমপাতার সহিত উহা ভাজিয়া খাইয়া থাকেন। ফলকথা বেগুণ, অপক্ক অবস্থায়-ই উত্তম সুখাদ্য। নিম্ন-লিখিত নিয়মে দাইল-বেগুণ-ভর্ত্তা প্রস্তুত করিবে।

প্রথমে বেগুণ পোড়াইয়া লইবে। কাঠ কয়লার মৃদু তাপে যে, বেগুণ পোড়াইতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। অধিক তাপে বেগুণ পোড়াইলে, অম্ল-আস্বাদের হইয়া থাকে। বেগুণ পোড়া হইলে, তাহার পোড়া খোসা বেশ করিয়া ছাড়াইয়া ফেলিবে, তখন উহা চট্‌কাইবে। চট্‌কাইবার সময়, মটর কিংবা বুটের সুসিদ্ধ দাইল (বেগুণের পরিমাণ অনুসারে) উহার সহিত চট্‌কাইবে, এবং উহাতে পরিমাণ মত লবণ, লেবুর রস, কাঁচা-লঙ্কার কুচি মাখিবে।

এদিকে একটী পাক-পাত্রে সামান্য ঘৃত জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তেজপাত ফোড়ন দিবে। পরে, তাহাতে চট্‌কান বেগুণ ঢালিয়া দিয়া, দুই একবার নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া লইলে-ই, দাইল-বেগুণ-ভর্ত্তা প্রস্তুত হইল। ফেন্‌সা-ভাত, খিচুড়ী কিংবা গরম ভাতের সহিত এই ভর্ত্তা বেশ মুখ-রোচক। কেহ কেহ আবার সখ করিয়া, কড়-কড়ে ভাতের সহিত-ও উহা আহার করিয়া থাকেন।

কই-মৌরী।

প্রথমে, গোটা গোটা কই মাছগুলির আঁস পোঁটা ফেলিয়া, বেশ পরিষ্কার করিরা ধুইয়া, লুণ হলুদ মাখাইয়া লও। পরে, ভাসা তৈলে মাছগুলি ভাল করিয়া ভাজিয়া লও। এখন, একটী পাত্রে একটু বেশী তৈল ঢালিয়া দিয়া, উহা জ্বালে বসাও। তৈল পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত, লঙ্কা এবং মৌরী-বাটা, জীরা-মরীচ-বাটা, হরিদ্রা-বাটা, ধনে-বাটা ও পাঁচ ফোড়ন দিয়া, নাড়িতে থাক। নাড়িতে নাড়িতে যখন দেখিবে, উহার বাদামী রং হইয়া আসিয়াছে, তখন উহার উপর গরম জল ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দাও। জ্বালে জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে, পাক-পাত্রের ঢাকা খুলিয়া, মাছগুলি ও লবণ দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া চড়িয়া দাও। যখন দেখিবে, জ্বালে জল মরিয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে ছোট এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ এবং তেজপাত-বাটা ঘৃতে গুলিয়া, ব্যঞ্জনে ঢালিয়া দিয়া, জ্বাল হইতে পাক-পাত্রটী নামাইয়া, পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখ। একটু পরে পরিবেষণ করিবে। এই ব্যঞ্জনে মৌরী-বাটা ও তৈলে একটু অধিক পরিমাণে দিতে হয়। যশুরে কই অপেক্ষা, দেশী বড় বড় কই মাছে, ব্যঞ্জন অত্যন্ত সুস্বাদু হইয়া থাকে। কই-মৌরী বড়-ই মুখ-রোচক ব্যঞ্জন। উহা এক-প্রকার তেল-ঝোল বলিলে-ই হয়; কারণ, ব্যঞ্জন রাঁধা হইলে, মাছগুলি তেলের উপর খক্-খক্ করিতে থাকে।

মসলাদার কাঁকড়া।

কতকগুলি মাদি কাঁকড়ার পেটের চাক্তি ফেলিয়া দাও। উপরের আবরণের মধ্য-স্থলে, একটী গোল ছিদ্র করিয়া, তাহার ময়লা বাহির করিয়া ফেল; অর্থাৎ দাড়া-সমেত কাঁকড়া গোটা রাখিতে হইবে। এখন, কাঁকড়াগুলি ভাল করিয়া ধুইয়া, আঘাত করিয়া, দাড়া ফাটাইয়া দাও। দাড়া ফাটাইলে, ভিতরে মসলা প্রবেশ করিতে পারিবে। অনন্তর, পরিমাণ-মত আদা-বাটা, হরিদ্রা-বাটা, পিয়াজ-বাটা (ইচ্ছা করিলে ত্যাগ করিতে পার) লঙ্কা-বাটা এবং জীরা-মরীচ-বাটা কাঁকড়া গুলির গায়ে বেশ করিয়া মাখাইবে। ময়লা বাহির করিবার জন্য যে স্থানে ছিদ্র করিয়াছ, সেই স্থানে-ও কতকটা মসলা-বাটা ঢুকাইয়া দিবে।

এদিকে, কড়াতে তৈল জ্বালে চড়াইয়া, পাকাইয়া লইবে। ভাসা তৈলে যে কাঁকড়া ভাজিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। অনন্তর, তৈলে কাঁকড়াগুলি বেশ করিয়া ভাজিয়া লইবে। এইরূপ নিয়মে ভাজিয়া লইলে-ই, মসলাদার কাঁকড়া পাক শেষ হইল।

রুচি-অনুসারে কেহ কেহ উহাতে লঙ্কা ও পিয়াজের পরিমাণ অধিক করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। শীতকালে বড় বড় কাঁকড়া উত্তম সুখাদ্য, বর্ষাকালের কাঁকড়া সুখাদ্য নহে; সে সময় অনেক কাঁকড়ার ভিতরে জল থাকে, তেমন শাঁস কিংবা ঘি থাকে না।

আনন্দ-ভোগ।

ভাটকা রুই, কাতলা কিংবা মৃগেল প্রভৃতি পাকা মাছের নি-কাঁটা অংশ কুটিয়া, সামান্য রূপ ভাজিয়া লইবে। এখন, মাছের পরিমাণ বুঝিয়া, আলু সিদ্ধ করিয়া, তাহার খোসা ছাড়াইয়া চট্‌কাইয়া লইবে, এরূপ নিয়মে চট্‌কাইবে, যেন কোন রকম খিচ না থাকে।

এদিকে, ভাজা মাছের কাঁটা বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া, মাছের ঝুরিগুলি আলুর সহিত মিশাইবে। অনন্তর, তাহাতে পরিমাণ মত দুধ, আদা ও পিয়াজ-বাটা, পাঁউরুটীর শাঁস এবং লবণ দিয়া, আর একবার উত্তমরূপ চট্‌কাইবে। চট্‌কাইলে, উহা আটা গোছের হইবে। এখন, দুই একটী ডিমের ভিতরের তরলাংশ ফেনাইয়া, উহাতে মাখিবে। পরে, উহাকে যে কোন পিষ্টকের আকারে গড়াইয়া, ঘৃতে ভাজিয়া লইলে-ই, আনন্দ-ভোগ প্রস্তুত হইবে।

সর কালিয়া।

উপকরণ ও পরিমাণ।—দুগ্ধের সর এক পোয়া, ঘৃত আধ পোয়া, মাংস একসের, হরিদ্রা বাটা দুই তোলা, দারচিনি এক আনা, ছোট এলাচ এক আনা, আদা-বাটা তিন তোলা, ভাজা বাদাম-বাটা আধ পোয়া, ধনে-বাটা তিন তোলা, জীরামরীচ-বাটা দুই আনা, পিয়াজ এক ছটাক, লঙ্কা-বাটা এক আনা, এবং লবণ তিন তোলা।

অর্দ্ধেক ঘৃতে সমুদয় পিয়াজের সহিত বাদামী ধরণে মাংসগুলি ভাজিবে। পরে, তাহাতে অর্দ্ধেক গন্ধ-মসলা, ধনে, আদা, জীরামরীচ, হরিদ্রা, লঙ্কা এবং লবণ দিয়া, পরিমাণ-মত গরম জল ঢালিয়া দিবে। জল দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া, মৃদু জ্বালে পাক করিবে। মাংস সিদ্ধ হইলে, জ্বাল হইতে নামাইবে; এবং অবশিষ্ট ঘৃতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া, এক সঙ্গে সাঁতালাইবে। ফুটিয়া আসিলে, বাদাম-বাটা ও সর ঢালিয়া দিয়া, ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। পরে, অবশিষ্ট মসলাদির চূর্ণ দিয়া, জ্বাল হইতে পাক-পাত্রটী নামাইয়া, মুখ ঢাকিয়া রাখিবে।

সোহন কাবাব।

এক সের আন্দাজ খুব থোড়া মাংস লইয়া, লবণ, জল ও লঙ্কা-বাটার সহিত মিশাইয়া, সিদ্ধ করিয়া লইবে। পরে, সিদ্ধ মাংস বাটিয়া, পাত্রান্তরে রাখিবে। অনন্তর, আদা-বাটা, লবঙ্গ-বাটা, ছোট এলাচ-বাটা, দারুচিনি-বাটা এবং পুদিনা শাকের কুচি ও কিঞ্চিৎ লেবুর রসে ঐ মাংস মাখিয়া, এক এক একটী আমড়ার ন্যায় প্রস্তুত করিবে।

এদিকে, তিন চারিটী ডিমের হরিদ্রাংশ একটী পাত্রে এবং কিছু সুজি কিংবা বিস্কুটের গুঁড় অপর একটী পাত্রে রাখিয়া, পূর্ব্ব-প্রস্তুত মাংসের গোলকগুলির মধ্য হইতে এক একটী লইয়া, একবার ডিমের হরিদ্রাংশে ডুবাইয়া, তাহাতে মাখাইবে; পুনরায় ডিমের হরিদ্রাংশে ডুবাইয়া, আবার সুজি মাখাইবে; এইবার ঐ গুলিকে ঘৃতে ভাজিয়া লইলে-ই, সোহন কাবাব প্রস্তুত হইল।

কলাই শুঁটির বড়া।

প্রথমে কলাই-শুঁটির দানাগুলি ছাড়াইবে। শুঁটি পাকিয়া আসিলে, তাহার দানায় বড়া বা ফুলরি ভাল সুখাদ্য হয় না; এজন্য কাঁচা শুঁটির দানা ছাড়াইয়া লইবে। অনন্তর তাহা বাটিয়া লইবে। এখন শুঁটি-বাটার পরিমাণ বুঝিয়া, তাহাতে লবণ এবং লঙ্কা-বাটা (কাঁচা হইলে, ভাল হয়) মিশাইয়া, উত্তমরূপে ফেটাইবে।

এদিকে কড়াতে ঘৃত বা খাঁটি সরিষার তৈল জ্বালে চড়াইবে। জ্বালে উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে ফেটান-গুঁটির এক একটী বড়া ছাড়িতে থাকিবে। একবারে অধিক ছাড়িবে না; কারণ বড়াগুলি গায়ে গায়ে জড়াইয়া যাইতে পারে। ভাজার অবস্থায় দুই একবার উল্টাইয়া দিবে। বেশ খড়-খড়ে গোছের ভাজা হইলে, তাহা তৈল হইতে তুলিয়া লইবে।

ফুলকপির রায়তা।

যে ফুল সম্পূর্ণ ফুটিয়া না যায়, আর যাহার, উপর কাল কাল দাগ না পড়ে, সেই কপি-ই উত্তম সুখাদ্য। রায়তার জন্য ফুলকপি কুটিবার সময়, উহা টুকরা টুকরা করিয়া কুচাইবে না। ফুলের এক একটি পাপড়ি আস্ত রাখিবে। এইরূপ নিয়মে ফুলকপি কুটিয়া, তাহা জলে ধুইয়া লইবে।

এখন একটু অধিক জলে, ফুলকপি সিদ্ধ করিবে। যখন দেখিবে, উহা বেশ সুসিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ আস্ত আস্ত পাপড়িগুলি বেশ মোলায়েম হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহা জ্বাল হইতে নামাইবে। অনন্তর, জল গালিয়া, কপিগুলি একটী প্রশস্ত (পরিমাণ বুঝিয়া) মাটীর, পাথর অথবা কলাই করা পাত্রে ঢালিবে।

এদিকে কপির পরিমাণ অনুসারে, তাহাতে দধি, লবণ, চিনি, রাইসরিষা-বাটা এবং খাঁটি সরিষার তৈল ঢালিয়া দিয়া, বেশ করিয়া মাখিয়া লইবে। অম্ল কম হইলে, কাঁচা তেঁতুল সিদ্ধ করিয়া, তাহার মাড়ি দধির সহিত মিশাইয়া লইবে *। দধি প্রভৃতি উপকরণ সকল মাখা হইলে, উহা আর জ্বালে বসাইতে হইবে না। রায়তাতে যেন অল্প ঝোল থাকে। উপকরণগুলি এরূপ নিয়মে মিশাইবে, যেন রায়তা খাইতে অম্ল-মধুর এবং সামান্য ঝাল আস্বাদের হয়। এই রায়তা অতি সুখাদ্য; পরিবেষণের সময় ভোক্তাদিগের বোধ হইবে, যেন

* পুরাতন তেঁতুলের গোলা মিশাইলে, দেখিতে একটু ময়লা হইবে। তেঁতুলের পরিবর্ত্তে লেবুর রস দিলে, আর-ও সুখাদ্য হইয়া থাকে।

কাঁচা কপির এক একটী পাপড়ি পাতে দিয়াছে। কিন্তু আহারের সময় সহজে মুখে মিশাইয়া যাইবে।

আনারস ভাজা।

অম্ল-মধুর আস্বাদ জন্য আনারস অতি উপাদেয় মুখ-প্রিয় ফল। আনারস জলপানে, সরবতে, চাট্‌নিতে এবং পোলাও প্রভৃতি রন্ধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আনারস নানা জাতীয়; তন্মধ্যে দুই এক জাতীয় আনারস অত্যন্ত সুখাদ্য।

প্রথমে আনারসের খোলা ও চোক ছাড়াইয়া পরিষ্কৃত করিবে। অনন্তর, ভিতরের বুকো ফেলিয়া দিয়া, ডুম ডুম করিয়া লইবে। এখন উহাতে সামান্য লবণ মাখাইয়া, জলে ধুইয়া ফেলিবে।

এখন আনারসের পরিমাণ বুঝিয়া, জ্বালে ঘৃত চড়াইবে। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে দালচিনি ও লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া, আনারসগুলি লালূছে ধরণে ভাজিয়া লইবে। রুচি অনুসারে এই ভর্জ্জিত আনারসে চিনি মাখাইয়া-ও ব্যবহার করিতে পার। কৃমি-রোগে আনারস ও উহার পাতার রস অত্যন্ত উপকারী। আনারস এ দেশের ফল নহে, চীনদেশ হইতে এই ফল আনীত হইয়া, এদেশে উহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে।

কয়েৎবেল্লের চাট্‌নি।

এই চাট্‌নি অত্যন্ত মুখ-প্রিয়। কয়েৎবেলের কাঁচা ও পাকা দুই অবস্থায় চাট্‌নি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু কাঁচা অপেক্ষা পাকা কয়েৎবেলের চাট্‌নি অত্যন্ত রুচি-কর।

উপকরণ ও পরিমাণ।—কয়েৎবেলের (পাকা) শাঁস দুই ছটাক, দধি দুই ছটাক, চিনি এক ছটাক, কিস্‌মিস এক ছটাক, ঘৃত চারি আনা ওজন, হরিদ্রা-বাটা দুই আনা, সরিষা-বাটা চারি আনা, গোটা সরিষা সামান্য, ছোট এলাচের দানা আধ আনা, লবণ আধ তোলা এবং জল আধ পোয়া।

পাকা কয়েৎবেল ভাঙ্গিয়া, ভিতরের শাঁস বাহির কর। পরে তাহার বিচি ফেলিয়া দিয়া, তাহাতে জল, দধি, লবণ, হরিদ্রা এবং চিনি মিশাইয়া, পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লও। এখন পাক-পাত্র জ্বালে বসাও। ঘৃতটুকু তাহাতে ঢালিয়া দিয়া, পাকাইয়া লও। এখন গোটা সরিষা ফোড়ন দিয়া-ই হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া দাও। চুড়-চুড় শব্দ বন্ধ হইলে; তাহাতে কয়েৎবেল ঢালিয়া দাও। এখন অবশিষ্ট উপকরণগুলি উহাতে ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখ। কিছুক্ষণ ফুটিবার পর; উনান হইতে পাক-পাত্র নামাইয়া লও। ঠাণ্ডা হইলে পরিবেষণ কর।

কলার রুটি।

কলার রুটি খাইতে যেমন সুখাদ্য, সেইরূপ আবার পুষ্টি-কর। উহা আলু অপেক্ষা কম পুষ্টি-কর নহে। মাদ্রাজে কোন কোন গৃহস্থ কলার আটা বা ময়দায় রুটি প্রস্তুত করিয়া, আহার করিয়া থাকেন। এ দেশে-ও উহার ব্যবহার করিলে, বিস্তর উপকার হইবার কথা।

প্রথমে কলার খোসা ছাড়াইবে। পরে পাতলা আকারে কাটিয়া রৌদ্রে দিবে। রৌদ্রে শুষ্ক করিবার সময়, পাতলা কাপড়ে ঢাকিয়া দিলে ভাল হয়, কারণ ধূলা প্রভৃতি কোন প্রকার রোগ-জনক পদার্থ পড়িতে পায় না। কলার চাকাগুলি উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে, পিশিয়া তদ্দ্বারা ময়দা প্রস্তুত করিবে। ময়দা প্রস্তুত হইলে, তাহা পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এই ময়দা সিপি-আঁটা বোতল বা তদ্রূপ কোন পাত্রে রাখিবে। কারণ বাতাস লাগিলে, উহা গলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। প্রয়োজন হইলে, বোতল হইতে ময়দা বাহির করিয়া, রুটি প্রস্তুত করিবে। ময়দার রুটির ন্যায় উহার-ও রুটি তৈয়ার করিতে হয়। কলার রুটি মিষ্ট আস্বাদের হইয়া থাকে। এই রুটি কিছুদিন আহার করিলে, শরীর মোটা হইয়া উঠে। শিশুকে পর্য্যন্ত কলার ময়দা আহারে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।
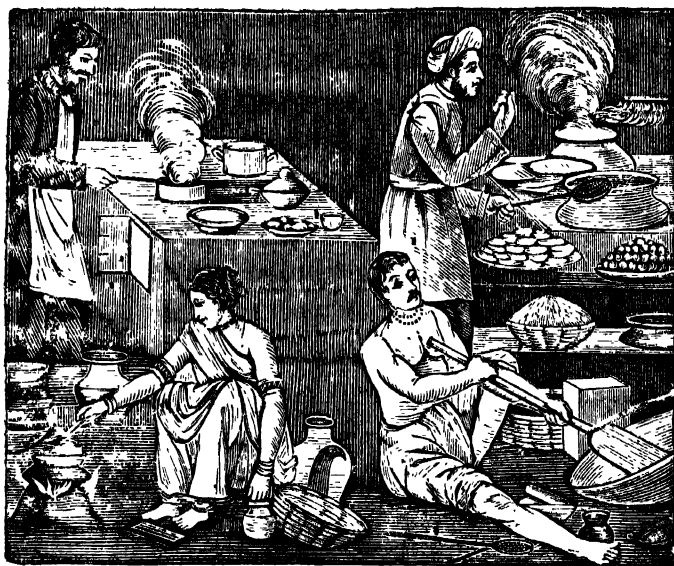
পাক-প্রণালী।

রন্ধন-বিষয়ে ব্যবস্থা।

ঞ্জন আ-ঢাকা কিংবা বাসি রাখা ভাল নহে; কারণ, বাতাস লাগিয়া, পক্ক বা রাঁধা তরকারি পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। যদি একবেলা রাঁধিয়া, দুই-বেলা আহার করিতে ইচ্ছা কর, তবে শেষ-বেলার জন্য পৃথক্ পাত্রে ঢালিয়া রাখিবে; উহাতে কদাচ হাত দিও না, অর্থাৎ কোন রকমে ঘাঁটা-ঘাঁটি করিবে না, ঠাণ্ডা হইলে, ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। এরূপ ভাবে ঢাকিবে, যেন উহাতে বাতাস লাগিতে না পায়। রাঁধা দ্রব্যে

বাতাস ও হাত লাগিয়া, ঘাঁটা-ঘোঁটা হইলে-ই, উহা পচিয়া যাইবে। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, বিশেষরূপ যত্ন করিয়া না রাখিলে, ব্যঞ্জনাদি নিশ্চয়-ই পচিয়া যাইবে। মধ্যাহ্নের ব্যঞ্জন রাত্রে খাইতে হইলে, আহারের পূর্ব্বে গরম করিয়া লইবে। ঠাণ্ডা ব্যঞ্জনাদি তত সুখাদ্য নহে এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে-ও অপকারী।

ভুলক্রমে অধিক অন্ন রাঁধা হইয়াছে, অথবা ক্ষুধা কম বলিয়া, রাত্রে ভাত খাইলে না, এরূপ ঘটিলে, জলে একটু তেঁতুল গুলিয়া কিংবা লেবুর রস জলে মিশাইয়া, ভাতগুলি ভিজাইয়া, ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিলে, উহা পচিবে না, নতুবা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এরূপ বাসি ভাত খাইলে রোগ জন্মে। পাথর-বাটী কিংবা পাথরের খোরাতে ভাত ভিজাইয়া রাখিবে। ধাতু-পাত্রে রাখিবে না।

উনানের আগুন নিবিয়া গিয়াছে, অথচ মাছ ভাজা হয় নাই, এরূপ ঘটিলে, মাছগুলি বাছিয়া বা কুটিয়া, একটু তৈল, হরিদ্রা ও লবণ মাখাইয়া রাখিয়া দিবে, নষ্ট হইবে না।

ঘৃত ও নারিকেল তৈল প্রভৃতি ভাল করিয়া ঢাকিয়া না রাখিলে, বাতাসে পচিয়া যাইবে। ঘৃত প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্য কখন-ই আ-ঢাকা রাখিবে না। ঘৃত বাতাসে থাকিলে, উহাতে দুর্গন্ধ হইবে।

ভিজা জিনিষ বা মাটীতে কোন খাদ্য-দ্রব্য খোলা রাখিলে, বাতাস লাগিয়া, তাহা নষ্ট হইবে বা পচিয়া যাইবে। খাবার জিনিষ, উত্তমরূপে বায়ুরোধ করিয়া, শিকায় বা বাঁশের মাচা কিংবা তক্তার উপর রাখিবে, মাটীতে রাখিও না।

দুধ অধিক ঘন করিয়া জ্বাল দিবে না। পাতলা জ্বাল-দেওয়া দুধ-ই উপকারী। তবে সর তুলিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিতে হইলে, দুধ একটু ঘন করিয়া, আগুনের উপর কড়া-সুদ্ধ রাখিয়া দিলে-ই, দুধের উপর সর পড়িবে।

দুধ জ্বাল দিয়া, দুধে সর না পড়িতে পড়িতে, নূতন পাকা তেঁতুল জলে গুলিয়া, কড়ার দুধে অল্প অল্প করিয়া ছিটা দিতে দিতে-ই, দুধ জমিয়া ছানা হইবে। ছানা খান্‌খান্ হইলে, দুধের যে জলীয় অংশ থাকে, তাহা ও তেঁতুল-গোলা-জল স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে। এখন কাপড়ে ঢালিয়া দিয়া, দু'হাতে

অল্প অল্প কাপড়টী নাড়িতে থাক, ছানা জমিয়া যাইবে। পরে ছানা ছাঁকিয়া লইলে-ই হইল। এই জল রাখিয়া দিতে পার; অন্য দিন ছানা করিতে, এই জল-ই উৎকৃষ্ট। ইহাকে-ই "ছানার জল" কহে। তেঁতুল কাঁচা হইলে, পোড়াইয়া বা জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ছানার জল জ্বাল দিয়া-ও আবার ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উনান নিকান হইলে, তাহার মুখে দুধের ভাড় বসাইয়া রাখিতে হয়। এরূপ না করিয়া, ঐ ভাঁড়ে আবার গাই দুয়াইলে বা দুধ রাখিলে, সে দুধ নষ্ট হইয়া যাইবে।

জলে ও বাতাসে অসংখ্য কীটাণু আছে; এজন্য জলের জালা ও কলসী প্রভৃতি নিত্য বা দুই তিন দিন অন্তর পরিষ্কার করা উচিত। জল অত্যন্ত পরিষ্কৃত দেখিয়া তুলিয়া রাখ, দশ বার দিন পরে চোকে দেখ, জলে পোকা হইয়াছে। অতএব জল পরিষ্কার রাখিবে, তাহা নিত্য নিত্য-ই পরিষ্কার করিবে এবং পরিষ্কৃত বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে।

ঘোলা জল পরিষ্কার করিতে হইলে, একটী পাথর বাটীতে অল্প জল লইয়া, একটী নির্ম্মালি ফল ঘসিয়া, কলসীর জলে দিয়া রাখিবে। পরে ঐ জল আস্তে আস্তে অন্য কলসীতে ঢালিয়া লইবে। নীচের শেষাস্তি জল ফেলিয়া দিবে। নির্ম্মালি রাত্রে দিয়া রাখিলে, তার পর দিন জল পরিষ্কার হয়। চারি পাঁচ কুঁচ ফটকিরি এক কলসী জলে, ঐ প্রক্রিয়ায় দিয়া লইলে-ও জল পরিষ্কার হয়।

আলু দীর্ঘকাল ভাল অবস্থায় রাখিবার দরকার হইলে, ঘরের ভিতর মাচা করিয়া, ঐ মাচার উপর অথবা ঘরের মেজেতে বালি পুরু করিয়া, ঘরের মেজেতে বিছাইয়া, আলু রাখিলে ভাল থাকে। মাচায় অন্য ফল রাখিলে-ও, অনেক দিন ভাল থাকে।

কাঁটালের বীচি, শুষ্ক বালি দিয়া কলসীতে পুরিয়া, কলসীর মুখ বায়ু-রোধ ভাবে বন্ধ রাখিলে, টাট্‌কা অবস্থায় অনেক দিন থাকে। বালি দ্বারায় অনেক জিনিষ বহুদিন থাকিতে পারে।

জল ও বাতাসের সংস্পর্শে-ই খাদ্য-দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়। অতএব যে জিনিষে জলীয় ভাগ আছে, সে খাদ্য একেবারে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত

করিবে না। আবশ্যকের অতিরিক্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিলে, পচিয়া বা ছাতা পড়িয়া যাইবে। যেমন লুচি, কচুরি, সন্দেশ এবং মিঠাই প্রভৃতি।

কতকটা তরকারি কুটিয়া, বাসি করিয়া রাখিবে না। তরকারিতে জলীয়াংশ আছে, সুতরাং পচিয়া যাইবে।

কলাই আদি দাইল, বৎসরের যে সময় নূতন ফসলের জিনিষ বাজারে আমদানি হয়, সেই সময় এক বৎসরের মত সংগ্রহ করিয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া ও ঝাড়িয়া, পরিষ্কার করিয়া, বায়ু-রোধ ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়া দিলে, ভাল থাকে। ইহাতে পোকায় নষ্ট করিতে পারে না। দুই তিন মাস অন্তর মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিয়া, ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া, ঐ নিয়মে পুনরায় রাখিতে হয়।

মসলাদি, বৎসরের যে সময়, নূতন ফসল জন্মিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আইসে, সেই সময়-ই খরিদ করিয়া রাখিবে। ইহা-ও রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

কুলচুর, আমচুর, তেঁতুল, আমসত্ব প্রভৃতি-ও মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করিয়া, রৌদ্রে দিবে।

খাদ্য-দ্রব্য-সমূহ খোলা রাখা কর্ত্তব্য নহে। সকল জিনিষ-ই ঢাকিয়া রাখিবে।

অম্ল-দ্রব্য খাইতে হইলে, পাথর-বাটী বা চিনা-মাটীর পাত্র-ই উৎকৃষ্ট।

মাটীর হাঁড়ি প্রভৃতিতে খাদ্য-দ্রব্য রাখিতে কিংবা রন্ধন করিতে হইলে, খড়-পাতা প্রভৃতি দ্বারায় উত্তমরূপ মাজিয়া, বালি ঝাড়িয়া লইতে হয়। অনন্তর দ্রব্য-বিশেষে ও রাঁধিবার জন্য, হাঁড়ির ভিতর একটু সরিষার তেল মাখাইয়া লওয়া উচিত।

ভাঁড়ার ঘর ও রন্ধন-শালার ভিতর, কতকটা অপরিষ্কার জঞ্জাল বা আবর্জ্জনা জড় করিয়া রাখিবে না। ঘরের ভিতর অপরিষ্কার করিয়া রাখিলে, সাপ, ব্যাঙ ও ইঁদুরের আবাস-স্থান হইবে। ঘর পরিষ্কার থাকিলে, কোন শত্রু-ই ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না।

ঘরে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য হইলে, তাহা নিবারণের জন্য, ইঁদুর-মারা কল পাতিয়া রাখিবে। কিংবা ইঁদুরের যাতায়াতের পথে ডাক্তারি ঔষধ "কার্ব্বলিক-এসিড" ছড়াইয়া দিলে-ও, ঐ ঔষধের গন্ধে ইঁদুর কেন, সাপ পর্য্যন্ত আসিতে পারিবে না।

কিন্তু সাবধানে ঢালিতে হইবে, "কার্ব্বলিক এসিড" হাতে বা গায়ে লাগিলে জ্বালা করিবে। যে স্থানে খাদ্য-দ্রব্য পড়িয়া থাকিতে পারে, তথায় যেন উহা দিও না। ইহা বিষাক্ত দ্রব্য।

ঘরের দেওয়াল ও কড়ি-কাঠের কোণগুলি মাসের মধ্যে একবার বেশ করিয়া ঝাড়িয়া দিবে। যেন মাকড়শা প্রভৃতির জাল ও ঝুল না পড়ে। খেজুর বা নারিকেলের ঝাঁটায় ঝুল ঝাড়া যাইতে পারে।

গৃহে বাসন প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ঘরের যে জিনিষটী যেখানে রাখিলে, মানায় বা ভাল দেখায়, সেই স্থানে সেই জিনিষটী গুছাইয়া সাজাইয়া রাখিবে। সাজান জিনিষগুলি নিত্য বা দুই তিন দিন অন্তর ঝাড়িয়া বা মাজিয়া পরিষ্কার করিবে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিবে। ঘর সাজাইতে গিয়া যেন, কাপড়ের আন্‌লায় বায়ুর গমনাগমনের পথ রোধ করিবে না। বাতাস আসা ও যাওয়ার পথ পরিষ্কার রাখিবে। যেন বাতাস আসিতে ও যাইতে বাধা না পায়।

অনেকে আলস্যবশতঃ ঘর, জানালা এরূপ করিয়া রাখেন যে, উইয়ে খাইয়া ফেলিতেছে অথচ গৃহিণী নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। এরূপ আলস্য, গৃহস্থের পক্ষে বড়-ই লজ্জার কথা! যিনি পাকা গৃহিণী, তিনি দ্বার জানালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন, উই ধরিতে দিবেন কেন? যদি-ই বা কোন কারণে উই লাগে, তবে দেখিবা-মাত্রই গরম জল দিয়া উইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া দিবেন, পরে কেরোসিন তেল আনিয়া, নেকড়া কবিয়া লাগাইয়া দিবেন, উই সবংশে নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে।

রাঁধা হইয়া গেলে, উনান টাট্‌কা গোময় দ্বারায় পরিষ্কার করা উচিত।

নিত্য প্রত্যূষে উঠিয়া উঠান প্রভৃতি স্থানে গোময়ের ছড়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, রাত্রের দূষিত বাষ্প গোময়ে নিবারিত হয়।

শীত ও গ্রীষ্মকালের জন্য উনানের ক্ষার সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। নতুবা বর্ষাকালে ক্ষার পাইতে কষ্ট হইবে।

বর্ষার অগ্রে-ই অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের শেষে-ই, জ্বালানি কাঠ পাতা প্রভৃতি শুষ্ক করিয়া, যে স্থানে বর্ষার জল থাকিতে না পারে, সেই স্থানে সাজাইয়া রাখিতে হইবে। কাঠ রাখিবার সময় মাচা করিয়া রাখিলে, উই লাগিতে পারে না।

যে গাছ অসার, যথা ভ্যারেণ্ডা, সজিনা প্রভৃতি কাঠ, রাঁধার পর ঐ কাঠের আগুন মালসা কিংবা হাঁড়ি ঢাকিয়া রাখিলে-ই, আগুন নিবিয়া গিয়া ফুল-কয়লা হয়।

ডাব, পেঁপে প্রভৃতি ফল গাছ হইতে পাড়িয়া-ই খাওয়া ভাল নহে। একদিন ঘরে রাখিয়া খাইলে, সুস্বাদ হয়। আবার পেয়ারা প্রভৃতি গাছ-পাকা ফল, গাছ হইতে পাড়িয়া-ই খাইতে ভাল লাগে। নারিকেলের ছোবড়া প্রভৃতি শুকাইয়া রাখিলে, উনান ধরাইবার পক্ষে বেশ সুবিধা হইয়া থাকে।

মধ্যাহ্ন কালের আহারাদির পর, বৃথা গল্প বা তাস খেলিয়া, সময় নষ্ট না করিয়া, যদি গৃহধর্ম্মের কাজ-কর্ম্ম করা যায়, তবে সংসারের ব্যয়ের অনেক আনুকূল্য হইতে পারে। সময় অমূল্য, একবার চলিয়া গেলে, আর ফিরিয়া আসিবে না। যে দিন চলিয়া অতীত হইল, সে দিন ত আর ফিরিয়া আসিবে না। এক দিন জীবনের কমিয়া গেল, এইরূপে আয়ুর শেষ হইতে থাকে। অতএব এমন অমূল্য সময় যাহাতে বৃথা না যায়, সে পক্ষে সকলের-ই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

৩

গোলাপী মিঠে জর্দ্দা।

হা এক-প্রকার সাদাসিদে নিরামিষ পোলাও। ইহার রন্ধন-প্রথা অতি সহজ। যে সকল চাউলে পোলাও রাঁধা হইয়া থাকে, সেই সকল চাউলের মধ্যে যে কোন চাউল দ্বারা জর্দ্দা পাক হইয়া থাকে।

প্রথমে চাউল উত্তমরূপ ঝাড়িয়া বাছিয়া, ধুইয়া রাখিবে। এদিকে পাক-পাত্রে জল জ্বালে চড়াইবে। যখন দেখিবে, জল ফুটিতেছে, তখন তাহাতে চাউল ঢালিয়া দিবে। এক ফুট শক্ত থাকিতে থাকিতে ভাত নামাইয়া, বেশ করিয়া ফেন ঝাড়িবে।

এদিকে, একটী পোলাওয়ের হাঁড়ি দমে বসাইবে, মাখন বা ঘৃত ঢালিয়া দিবে, এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে ছোট এলাচের দানা ফেলিয়া দিবে। দুই একবার নাড়াচাড়ার পর, ভাতগুলি ঘৃতের উপর ঢালিয়া দিবে। একটু পরে লবণ ও জাফরান-গোলা ভাতের উপর ঢালিয়া দিয়া, হাঁড়িটী ঝাঁকাইয়া, ঝাঁকাইয়া ভাতগুলি উল্‌টাইয়া দিবে। এরূপ নিয়মে ঝাঁকাইবে, যেন লবণ ও জাফরান, সমুদয় ভাতের গায়ে লাগিতে পায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভাতের গায়ে জল থাকিবে, ততক্ষণ উহা দমে রাখিবে। জল মরিয়া ভাত ঝর্‌ঝরে হইলে, নামাইবে। এবং পরিবেষণ করিবার পূর্ব্বে, ভাতের উপর গোলাপ-জলের ছিটা দিয়া লইবে। আহারের সময় গোলাপের গন্ধে উহা অতি উপাদেয় সুখ-ভোগ্য হইবে।

মিঠে মালাই ভুনি খিচুড়ি।

এই খিচুড়ি নারিকেল-দুধ দ্বারা রাঁধিতে হয়। অন্যান্য খিচুড়ি অপেক্ষা, মালাই ভুনি খিচুড়ি অতি উপাদেয় খাদ্য।

প্রথমে, চাউল ও দাইল পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ধুইয়া, পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে বাতাসে শুকাইতে দিবে। এদিকে, চাউলের পরিমাণ বুঝিয়া নারিকেল কুরিয়া, তাহাতে গরম জল দিয়া, নিঙ্গড়াইয়া তাহার দুধ বাহির করিয়া রাখিবে।

এখন ঘৃত জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে ছোট এলাচের দানা, লবঙ্গ এবং দারচিনি দিয়া নাড়িতে থাকিবে। মসলাগুলি ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে চাউল ও দাইল ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে আরম্ভ করিবে। যখন দেখিবে, দুই একটী চাউল ফুটিয়া উঠিতেছে, তখন তাহাতে নারিকেল-দুধ ঢালিয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। প্রথম হইতে মৃদু জ্বালে খিচুড়ি রাঁধিতে থাকিবে। যখন বুঝিবে, চাউল প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে লবণ, আদা-বাটা, জাফরান-গোলা, ধনে-বাটা, জীরামরীচ-বাটা এবং সামান্য চিনি ও পরিমাণ-মত বাদাম, পেস্তা, কিস্মিস্ দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। এই খিচুড়ি গলা না হইয়া, ঝর্-ঝরে হইয়া থাকে। সোণামুগের দাইল, রন্ধনে ব্যবহার করিবে। পরিবেষণ-কালে রুচি-অনুসারে পিয়াজ, লম্বা ধরণে সরু সরু আকারে কুটিয়া, ঘৃতে ভাজিয়া, খিচুড়ির উপর ছড়াইয়া দিবে। আধ পোয়া দাইলে দেড় পোয়া চাউল এবং আধ পোয়া ঘৃত ব্যবহার করিবে। অন্যান্য মসলা প্রভৃতি, চাউল ও দাইলের পরিমাণ বুঝিয়া, স্থির করিয়া লইবে।

তিলুয়া খিচুড়ি।

এই খিচুড়িতে তিল ব্যবহৃত হয় বলিয়া, ইহাকে তিলুয়া বা তিলে খিচুড়ি কহিয়া থাকে। অন্যান্য খিচুড়ির ন্যায় এই খিচুড়ি-ও বেশ সুখাদ্য।

প্রথমে তিলগুলি ধুইয়া, ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহা বাটিবে। এখন আদা, হরিদ্রা, ধনে এবং জীরামরীচ পৃথক্ পৃথক্ বাটিয়া রাখিবে। হিং শিলে পিষিয়া, তাহাতে অল্প জল দিয়া, শিল ধুইয়া একটী বাটীতে তুলিয়া রাখিবে। দুধ কিংবা জলে জাফরান ভিজাইয়া রাখিবে।

এখন পাক-পাত্র জ্বালে চড়াইবে। তাহাতে ঘৃত ঢালিয়া দিবে, এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে লঙ্কা, তেজপাত, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, দারচিনি ফেলিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। একটু ভাজা ভাজা হইলে, উহাতে তিল-বাটা দিয়া, আবার নাড়িতে আরম্ভ করিবে। অনন্তর তাহাতে চা'ল ডা'ল ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। উহা ভাজা ভাজা হইলে, হিং-পেষা জল উহার উপর ঢালিয়া দিয়া আবার নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে, জ্বালে জল মরিয়া আসিয়াছে, তখন জাফরান গুলিয়া তাহাতে দিবে। জ্বালে জল শুষ্ক হইয়া আসিলে, তাহাতে গরম জল ও লবণ ঢালিয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। খিচুড়ি ফুটিতে আরম্ভ করিলে, মৃদু আঁচে উহা রাঁধিবার ব্যবস্থা করিবে। মৃদু আঁচে খিচুড়ির জল মরিয়া আসিবে, অথচ উহা সুসিদ্ধ এবং ঝর্‌ঝরে হইবে। অনন্তর তাহা নামাইয়া লইলে-ই, তিলুয়া বা তিলে খিচুড়ি পাক শেষ হইবে।

যদি এক সের চাউলের খিচুড়ি রাঁধিতে ইচ্ছা কর, তবে মুগের দাইল দেড় পোয়া, তিল আধ পোয়া, আদা তিন তোলা, দারচিনি এক তোলা, ছোট এলাচ ষোলটী, লবঙ্গ ২০টী, হিং চারি রতি ও ঘৃত এক পোয়া এবং লবণ ও জল পরিমিত ব্যবহার করিবে।

খাড়া খিচুড়ি।

ইহা-ও এক-প্রকার মালাই খিচুড়ি। এই খিচুড়ি নারিকেল-দুগ্ধ দ্বারা রাঁধিতে হয়। খাড়া খিচুড়ির প্রধান উপকরণ চাউল, দাইল এবং কলাই শুঁটি। অনেকে পাঁচ ছটাক চাউলে, আধ পোয়া দাইল ও কলাই শুঁটির দানা আধ পোয়া এবং ঘৃত আধ পোয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। রুচি-অনুসারে পিয়াজ ব্যবহার করা চলিতে পারে। অন্যান্য উপকরণগুলি, পরিমাণ বুঝিয়া ব্যবহার করিবে।

প্রথমে চাউল ও দাইলগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া রাখিবে। পরে সমুদয় ঘৃত জ্বালে চড়াইবে। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত, লঙ্কা, পিয়াজ, লবঙ্গ, দারচিনি দিয়া, অনবরত নাড়িতে থাকিবে। মসলাগুলি

লাল বর্ণের হইলে, তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, ধনে-বাটা আদা-বাটা এবং লঙ্কা-বাটা দিয়া, পূর্ব্ববৎ নাড়িতে থাকিবে। মসলা ভাজার গন্ধ বাহির হইলে, তাহাতে চাউল, দাইল এবং কলাইশুঁটি দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। অল্পক্ষণ পরে, তাহাতে নারিকেল-দুধ ঢালিয়া দিবে, এবং একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে।

যখন দেখিবে, দাইল ও চাউল সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে লবণ দিবে। এই সময় হইতে আঁচ খুব কমাইয়া দিবে। একখানি কাঠের মৃদু জ্বালে অথবা আগুনের দমে, খিচুড়ি পাক করিতে থাকিবে ; আর মধ্যে মধ্যে নাড়িতে থাকিবে। কারণ, এই অবস্থায় বা এই সময়, ইহা ধরিয়া যাইবার বিশেষরূপ সম্ভাবনা। অনন্তর তাহা উনান হইতে নামাইয়া লইবে।

নারিকেল কোরার পাতুড়ি।

প্রথমে নারিকেল কুরিবে। পরে বেশ করিয়া বাটিবে। এখন তাহাতে লঙ্কা-বাটা, সরিষা-বাটা, তৈল এবং লবণ মিশাইবে। নারিকেল-বাটাতে মসলা মিশান হইলে, কচি কুমড়া পাতার এক পিঠে, তাহা পুরু করিয়া বসাইবে। পাতার যে দিকে নারিকেল দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভিতরে রাখিয়া, পাতাটী চারি ভাঁজ করিয়া, সরিষার তৈলে ভাজিয়া লইবে। এই পাতুড়ি উত্তম মুখ-রোচক।

আলুর বড়া।

যে পরিমাণ আলু, সেই পরিমাণ ছোলার দাইল লইয়া, সিদ্ধ করিবে। বেশ সু-সিদ্ধ হইলে নামাইবে। এবং ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, আদা-বাটা, আস্ত মৌরী, লবণ এবং সামান্য সফেদা (চাউলের গুঁড়) মিশাইয়া চটকাইবে। এই সবগুলি চটকান হইলে, ইচ্ছা-অনুসারে ছোট কিংবা বড় আকারে গোল গোল বড়া প্রস্তুত করিয়া, ঘৃত কিংবা তৈলে লালচে ধরণে ভাজিয়া লইবে। গরম গরম এই বড়া বেশ সুখাদ্য। খিচুড়ি কিংবা ভাতের সহিত উহা আহার করিতে পারা যায়।

বাঁধা কপির কোপ্তা-কারি।

প্রথমে কপির উপরিভাগের সবুজ বর্ণের পাকা পাতা ফেলিয়া দিবে। ডালের গায়ে যে কচি পাতা থাকে, তাহা খুলিয়া কুটিবে। কুটিয়া ভাসা জলে একবার ধুইয়া, উহা জলে সিদ্ধ করিবে। পাতাগুলি সুসিদ্ধ হইলে, জ্বাল হইতে নামাইয়া, জল গালিয়া ফেলিবে। হাত-সওয়া ঠাণ্ডা হইলে, তাহা উত্তমরূপে চট্‌কাইবে। এরূপ নিয়মে চট্‌কাইবে, যেন কাদার ন্যায় হয়। এখন কপির পরিমাণ বুঝিয়া, তাহাতে লবণ, লঙ্কা-বাটা, এবং সামান্য বেসন দিয়া মাখিয়া লইবে। পরে তাহার এক একটী কোপ্তা গড়িবে। কোপ্তাগুলি ইচ্ছানুসারে ছোট কিংবা বড়, যে কোন আকারে প্রস্তুত করিবে।

এদিকে ঘৃত অথবা তৈল জ্বালে চড়াইবে; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে এক একটী কোপ্তা ছাড়িতে থাকিবে। ফুলরি ভাজার ন্যায় উহা ভাজিয়া তুলিয়া লইবে। এইরূপ নিয়মে সমুদয় ভাজা হইলে, তদ্দ্বারা কোপ্তার কারি পাক করিবে। ইচ্ছা হইলে, এই কোপ্তা পোলাও, খিচুড়ি প্রভৃতির সহিত আহার করিতে পারা যায়।

এখন পাক-পাত্রে ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে চড়াইবে। এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত, লঙ্কা ফোড়ন দিয়া নাড়িতে থাকিবে। মসলা ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, আদা বাটা, ধনে-বাটা এবং জীরামরীচ-বাটা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। ইচ্ছা হইলে, ইহাতে সামান্য দধি-ও দিতে পারা যায়। মসলাগুলি উত্তমরূপে ভাজা ভাজা হইয়া, সুগন্ধ বিস্তার করিলে, তাহাতে পরিমাণ মত জল ঢালিয়া দিবে। জল ফুটিতে আরম্ভ হইলে, তাহাতে কোপ্তাগুলি ও লবণ দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। জ্বালে জল মরিয়া, ঘন হইয়া আসিলে, উনান হইতে পাক-পাত্র নামাইবে। এখন গরম মসলার গুঁড়া কোপ্তার উপর ছড়াইয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। অনন্তর তাহা পরিবেষণ করিবে।

কলাই শুঁটির কোপ্তা।

প্রথমে খোসা ছাড়াইয়া, দানাগুলি বাটিয়া লইবে। এদিকে শুঁটির

পরিমাণ বুঝিয়া, লঙ্কা, ধনে ও আদা খিচ-শূন্য করিয়া বাটিয়া রাখিবে। পরে ছোট এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ এবং জায়ফল গুঁড় করিয়া লইবে।

এখন শুঁটি-বাটাতে ছানা-বাটা এবং লঙ্কা, আদা, ধনে চট্‌কাইয়া মাখিবে। অনন্তর তাহাতে গরম মসলার গুঁড় ও লবণ মিশাইবে। এই সকল মিশান হইলে, উহাতে অল্প পরিমাণে সুজি কিংবা আরারুট মিশাইয়া, আর একবার ভাল করিয়া, চট্‌কাইয়া লইবে। এখন এই মিশ্রিত পিটিতে এক একটী কোপ্তা গড়াইয়া লইবে। গোল বা চেপ্টা যে কোন আকারে কোপ্তাগুলি প্রস্তুত করিবে।

এদিকে জ্বালে ঘৃত বা তৈল চড়াইয়া দিবে। এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে কোপ্তাগুলি লাল্‌ছে ধরণে ক্রমে ক্রমে ভাজিয়া লইবে। গরম গরম অবস্থায় কলাই শুঁটির কোপ্তা বেশ সুখাদ্য। লুচি, খিচুড়ি প্রভৃতির সহিত এই কোপ্তা আহার করিতে পারা যায়। আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ-ভোজীর পক্ষে কলাই শুঁটির কোপ্তা সমান আদরণীয়।

বেসনি-ফুলকপি।

বেসন দিয়া ভাজিতে হয় বলিয়া, ইহাকে বেসনী ফুলকপি কহিয়া থাকে। বেসনী ফুলকপি, উত্তম সুখাদ্য। ডা'ল-ভাত, খিচুড়ি এবং পোলাও প্রভৃতির সহিত উহা আহার করিতে হয়। গরম গরম অবস্থায়, বড়-ই মুখ-রোচক।

ফুলকপির এক একটী পাপড়ি কুটিয়া লইবে। ফুলের পরিমাণ বুঝিয়া, একটী পাত্রে সফেদা, বেসন, লঙ্কা বাটা বা গুঁড়, লবণ এবং জল এক সঙ্গে গুলিয়া, গোলা প্রস্তুত করিয়া লইবে। গোলা পাতলা কিংবা ঘন হইলে, ভাজা ভাল হইবে না। অর্থাৎ বেগুনি ভাজার ন্যায় গোলা করিবে।

এদিকে ঘৃত কিংবা তেল জ্বালে বসাইবে। যে কোন ভাজা ভাজিতে তেলের পরিমাণ যে, একটু অধিক দিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। কারণ, ভাসা তেলে, যে কোন ভাজা ভাজিলে, উহা বেশ ফুলিয়া উঠে। জ্বালে তেল পাকিয়া, কল কল করিতে থাকিলে, কপির এক একটী পাপড়ি পূর্ব্ব-প্রস্তুত গোলাতে

ডুবাইয়া, তেলে ছাড়িয়া দিবে। জ্বালে লাল্‌ছে বর্ণ হইলে, কপি তেল হইতে তুলিয়া লইবে। এইরূপ নিয়মে সমুদয় ফুলগুলি ক্রমে ক্রমে ভাজিয়া লইবে। ভাজা ফুলগুলি, উনানের পাশে অর্থাৎ আগুনের আঁচে রাখিবে। লিখিত নিয়মে ভাজিয়া লইলে-ই বেসনী ফুলকপি ভাজা হইল।

আলুসিদ্ধ।

আলু অত্যন্ত পুষ্টি-কর। কি দেশী কি গোল-আলু সকল প্রকার আলু-ই শীতল, ভার, মধুর, গুরু-পাক, মল-মূত্র কর, দুর্জ্জর, কফ-কর, বাত-প্রকোপ-কর, বল-পুষ্টি-কর, স্তন্য-বর্দ্ধক এবং রক্তপিত্তের শান্তি-কারক। *

সিদ্ধ করিবার পক্ষে বড় বড় আলু-ই উত্তম। প্রথমে আলুর খোসা একটু বাধাইয়া ছাড়াইবে। এখন অন্ততঃ আধ ঘণ্টা তাহা ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিবে। আলু জলে অধিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে, তাহার রং বেশ সাদা হইবে। পরে তাহা অধিক জলে সিদ্ধ করিতে চড়াইবে। সিদ্ধ করিবার সময় উহাতে সামান্য লবণ ফেলিয়া দিবে। যখন বুঝিবে, উহা উত্তমরূপে সুসিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহা জ্বাল হইতে নামাইয়া, জল গালিয়া ফেলিবে। জল গালিয়া, পাত্রটী উনানের আঁচে রাখিয়া দিবে। আগুনের আঁচে রাখিবার কারণ এই যে, আলুর গায়ের জল শুকাইয়া যাইবে। অনন্তর তাহা মষ্টার্ড-সহ অর্থাৎ মষ্টার্ড জলে গুলিয়া, তাহাতে একটু লবণ মিশাইয়া, আলুর সহিত আহার করিবে। অন্য প্রকারে খাইতে হইলে, আলুতে লবণ, কাঁচা-লঙ্কা, একটু আদা-ছেঁচা এবং ঘৃত কিংবা খাঁটি সরিষার তৈল মাখিয়া, আহার করিলে, উহা অতি মুখ-রোচক হইবে।

বহুমূত্র-রোগ-গ্রস্ত রোগীর পক্ষে কোন-প্রকার আলু-ই পথ্য নহে।

---

* আলুকং শীতলং সর্ব্বং বিষ্টম্ভি মধুরং গুরু।
সৃষ্টমূত্রমলং রুক্ষং দুর্জ্জরং রক্তপিত্তনুৎ।
কফানিলকরং বল্যং বৃষ্যং স্তন্যবিবর্দ্ধনম্‌॥

—ভাবপ্রকাশ।

ফুলকপির চচ্চড়ি।

ফুলকপি একসের ও আলু এক পোয়া কুটিয়া লও। কলাই শুঁটি এক পোয়া খোলা ছাড়াইয়া রাখ। পাক-পাত্রে তিন ছটাক সরিষার তৈল দিয়া, জ্বালে চড়াইয়া দাও; তৈল পাকিয়া আসিলে, ফুলবড়ি আধ পোয়া ভাজিয়া, স্বতন্ত্র-পাত্রে তুলিয়া রাখ। বড়ি ভাজা হইয়া যে তেল পাক-পাত্রে থাকিবে, সেই তেলে কপি, আলু এবং কলাই শুঁটি ভাজিয়া লও। এখন হরিদ্রা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, জীরামরীচ-বাটা, ধনে-বাটা, আধ পোয়া জলে গুলিয়া ঢালিয়া দাও। দুই এক-বার ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে লবণ দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখ। যখন দেখিবে, তরকারি প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে বড়ি-ভাজা ঢালিয়া দাও। অনন্তর পাক-পাত্রটী জ্বাল হইতে নামাইয়া, অপর পাত্রে এক তোলা ঘৃত দিয়া জ্বালে চড়াও; এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত, লঙ্কা ও পাঁচ-ফোড়ন ফেলিয়া দাও। পাঁচ-ফোড়ন ফুটিয়া আসিলে, তাহাতে তরকারি ঢালিয়া দিয়া, এক-বার নাড়িয়া চাড়িয়া দাও। সম্বরা দেওয়ার পর, ছোট এলাচ, দারচিনি ও লবঙ্গ বাটার সহিত এক তোলা ঘৃত মিশাইয়া ঢালিয়া দিয়া, এক-বার নাড়িয়া চাড়িয়া-ই, উনান হইতে পাক-পাত্র নামাইয়া লও।

সামিষ চচ্চড়ি রাঁধিতে হইলে, তরকারিতে লবণ দেওয়ার পূর্ব্বে ভাজা মাছ ঢালিয়া দিবে। গল্‌দা-চিংড়ি, দেশী কই কিংবা রুই প্রভৃতি উৎকৃষ্ট-জাতীয় মাছ হইলে-ই তরকারি অধিকতর সুমিষ্ট হইয়া থাকে।

ইঁচড়ের কোর্ম্মা।

ইঁচড়ের ডাল্‌না কালিয়া এবং কোর্ম্মা প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে ইঁচড়ের খোলা প্রভৃতি ছাড়াইয়া, বড় বড় ডুম ডুম করিয়া কুটিয়া লইবে। পরে তাহা ভাসা জলে ধুইয়া, জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে, জল গালিয়া ফেলিবে। পরে তাহা ঘৃত কিংবা তৈলে এক-বার কসিয়া নামাইয়া রাখিবে।

এ দিকে ঘৃত জ্বালে চড়াইবে; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজ-পাত, দারচিনি এবং ছোট এলাচের দানা ফেলিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। ঐ

সকল ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, ধনে-বাটা, লঙ্কা-বাটা আদা-বাটা এবং জীরামরীচ-বাটা দিয়া, অনবরত নাড়িতে থাকিবে। মসলা সকল আধ-ভাজা হইলে, তাহাতে দধি ও সামান্য মিষ্ট ঢালিয়া দিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় নাড়িবে। এইরূপ নাড়িতে নাড়িতে যখন দেখিবে, বেশ রঙ্ হইয়াছে, তখন তাহাতে ইঁচড়গুলি ঢালিয়া দিয়া, দুই একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। জল অধিক দিবে না, কারণ ইঁচড় পূর্ব্বে সিদ্ধ করা হইয়াছে, অধিক জল দিলে, অধিক জল থাকিবে, এবং ব্যঞ্জন পান্‌সে হইবে। এখন পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। দুই এক-বার ফুটিয়া আসিলে, ব্যঞ্জনে পরিমাণ মত লবণ দিবে। জ্বালে অল্পক্ষণ থাকিলে, কোর্ম্মা প্রস্তুত হইবে। তখন তাহা জ্বাল হইতে নামাইবে। অনন্তর ব্যঞ্জনের পরিমাণ বুঝিয়া, তাহাতে গরম মসলার গুঁড় ছড়াইয়া দিয়া, এক-বার নাড়িয়া চাড়িয়া কোর্ম্মা ঢাকিয়া রাখিবে। গরম মসলা অর্থাৎ ছোট-এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ প্রভৃতি আগুনে সামান্য গরম করিয়া, তাহা গুঁড় করিয়া লইবে। ইচ্ছা হইলে, কোর্ম্মাতে সামান্য কিস্‌মিস্ দিতে পারা যায়। এই কোর্ম্মা আহারের সময় মাংস বলিয়া ভ্রম জন্মিবে।

গল্‌দা চিংড়ির মালাইকারি।

গল্‌দা চিংড়ি স্বভাবতঃ-ই সুস্বাদু, কিন্তু উহাতে মালাইকারি রাঁধিলে, তাহা আরো সুখাদ্য হইয়া থাকে। মাছের পরিমাণ বুঝিয়া, দুই একটী ঝুনা নারিকেলের দুধ গালিয়া রাখিবে। নারিকেল-কুরাতে অল্প গরম জল দিয়া, কাপড়ে নিংড়াইয়া লইবে।

এ দিকে মাছ কুটিয়া বাছিয়া, তৈলে ভাজিয়া লইবে। মাছ ভাজা হইলে, একটী পাত্রে ঘৃত চড়াইবে, এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত, লঙ্কা-বাটা, হরিদ্রা-বাটা, আদা-বাটা, পিয়াজ (রুচি হইলে)-বাটা দিয়া নাড়িতে চাড়িতে থাকিবে। বেশ ভাজা-ভাজা হইলে, তাহাতে ভাজা মাছগুলি ঢালিয়া দিয়া, দুই এক-বার নাড়া-চাড়া করিবে। পরে তাহাতে নারিকেল-দুধ ও লবণ দিয়া, এক-বার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। যখন দেখিবে, ব্যঞ্জন বেশ রংদার এবং ঝোল ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহা জ্বাল

হইতে নামাইবে। নামাইয়া তাহাতে গরম মসলার গুঁড়া ছড়াইয়া দিবে। গরম মসলা কাঁচা অবস্থায় বাটিয়া দেওয়া অপেক্ষা, উহা কাট-খোলায় অল্প ভাজিয়া, গুঁড় করিয়া লইবে। সেই গুঁড় ব্যঞ্জনে ব্যবহার করিলে, সুগন্ধে ব্যঞ্জন ভর্-ভর্ করিতে থাকিবে। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, গল্দা চিংড়ির মালাইকারি প্রস্তুত হইল।

চিংড়িমাছের দো-পিয়াজা।

দো—পিয়াজা অর্থে দুইবার পিয়াজ। এই ব্যঞ্জনে অধিক পরিমাণে পিয়াজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বড় বড় গল্দা চিংড়ি-ই দো-পিয়াজার পক্ষে প্রশস্ত। এখন মাছগুলি ডুম ডুম করিয়া কুটিয়া বাছিয়া ধুইয়া লইবে। পরে তাহা তৈলে ভাজিয়া রাখিবে।

এ-দিকে মাছের পরিমাণ বুঝিয়া, ঘৃত জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে পিয়াজের কুচি লাল করিয়া ভাজিয়া পাত্রান্তরে তুলিয়া রাখিবে। পরে অবশিষ্ট ঘৃতে পিয়াজ-বাটা, হরিদ্রা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, আদা-বাটা, এবং এক-কোয়া (রুচি হইলে) রসুন-বাটা ঢালিয়া দিয়া ভাজিতে থাকিবে। মসলাগুলি ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে মাছের ডুমগুলি ভাজিবে। অনন্তর, তাহাতে সামান্য জল ঢালিয়া দিবে। দুই এক-বার ফুটিয়া আসিলে, মাছের পরিমাণ বুঝিয়া লবণ দিবে। দো-পিয়াজায় জল অধিক ব্যবহৃত হয় না। গা-মাখা গা-মাখা গোছের হইবে। যখন দেখিবে, জল মরিয়া আসিয়াছে, তখন তাহা নামাইবে, এবং পূর্ব্বে যে পিয়াজ ভাজিয়া রাখিয়াছ, তাহা গুঁড় করিয়া মাছের উপর ছড়াইয়া দিয়া, এক-বার নাড়িয়া চাড়িয়া লইলে-ই, দো-পিয়াজা পাক হইল। দো-পিয়াজা উত্তম সুখাদ্য।

পাত-ইলিস।

তৈলের ভাগ অধিক থাকে বলিয়া-ই, ইলিস মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু এবং মুখ-রোচক। নানা-প্রকার প্রণালীতে ইলিস মাছ রাঁধা হইয়া থাকে। পদ্মার ইলিস অপেক্ষা গঙ্গার টাট্কা মাছ-ই বিশেষরূপ সুস্বাদু। পাত-ইলিস রাঁধিবার নিয়ম অতি সহজ।

প্রথমে ইলিসের আঁইস প্রভৃতি পরিষ্কার করিবে। পরে তাহা ছোট ছোট টুকরা আকারে কুটিবে। এখন মাছের পরিমাণ মত হরিদ্রা-বাটা, পিয়াজ-বাটা, সরিষা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, লবণ এবং খাঁটি সরিষার তৈল, ঐ টুকরা মাছে বেশ করিয়া মাখাইবে। এখন কচি কুমড়া কিংবা লাউপাতায় মাছের টুকরা দিয়া, পাতাটি চারি ভাঁজ করিবে। এইরূপে সমুদয় মাছ পাতায় ভাঁজ বা মোড়া হইলে, তাহা তৈলে ভাজিয়া লইলে-ই, পাত-ইলিস প্রস্তুত হইল। পাত-ইলিস বেশ মুখ-রোচক। যাঁহাদের পিয়াজ আহারে প্রবৃত্তি না থাকে, তাঁহারা উহার পরিবর্ত্তে আদা-বাটা ব্যবহার করিতে পারেন। আর পাকা অর্থাৎ শুষ্ক লঙ্কার পরিবর্ত্তে কাঁচা লঙ্কা হইলে, উহা আর-ও উপাদেয় হইয়া থাকে।

কই-কপি।

প্রথমে বড় বড় দেশী কই মাছ কুটিয়া বাছিয়া ধুইবে। পরে তাহাতে লবণ-হরিদ্রা মাখিয়া তৈলে ভাজিয়া রাখিবে।

এ দিকে বাঁধা কপির ভিতরের পাতা একটু বড় বড় করিয়া, কুটিয়া লইবে। কপির পরিমাণ বুঝিয়া, আলু ডুম ডুম করিয়া কুটিবে এবং মটর শুঁটিগুলি ছাড়াইয়া রাখিবে।

এখন পাক-পাত্রে ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে চড়াইবে। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে আলু ও শুঁটিগুলি কসিয়া, পাত্রান্তরে তুলিয়া রাখিবে। পরে পাক-পাত্রে পুনর্ব্বার ঘৃত কিংবা তৈল পাকাইয়া লইয়া, তাহাতে কপি উত্তমরূপ কসিয়া নামাইবে। অনন্তর পাক-পাত্রে পুনর্ব্বার ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে চড়াইবে এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে লঙ্কা, তেজপাত দিয়া নাড়িতে থাকিবে। অল্প ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে পাঁচ-ফোড়ন ফেলিয়া দিবে। উহার চুড়-চুড় শব্দ কমিয়া আসিলে, তাহাতে হরিদ্রা, লঙ্কা, জীরামরীচ বাটা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। মসলাগুলি ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে পরিমাণ মত জল ঢালিয়া দিবে। যখন দেখিবে, জল ফুটিতেছে, তখন তাহাতে কপি, আলু, শুঁটি এবং মাছগুলি ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। অর্দ্ধেক জল মরিয়া আসিলে, ব্যঞ্জনে লবণ দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। কই-কপির অধিক

ঝোল রাখিবে না। গা-মাখা গোছের ঝোল রাখিবে। নামাইবার সময় ঘৃতে গরম মসলার গুঁড় গুলিয়া ব্যঞ্জনে ঢালিয়া দিয়া, এক-বার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, কই-কপি অতি উপাদেয় হইবে।

মিস-কারি।

কোমল মাংস দ্বারা এই কারি বা কালিয়া পাক করিতে হয়। প্রথমে হাড় হইতে মাংস পৃথক করিয়া লইবে। পরে মাংস খুব ছোট ছোট টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবে। মাংসের টুকরা যত ছোট হয়, তত-ই ভাল। বড় টুকরা আদৌ ব্যবহার করিবে না। মাংসের ন্যায় আলুর-ও ছোট ছোট ডুমো কুটিয়া রাখিবে। আর মাংসের পরিমাণ বুঝিয়া, ছোলা বা বড় বড় সাদা মটর জলে ভিজাইয়া রাখিবে।

এদিকে পাক-পাত্রে ঘৃত চড়াইবে, এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে আলু ও ছোলাগুলি কসিয়া রাখিবে।

এখন মাংসের পরিমাণ বুঝিয়া, তাহাতে জল দিয়া সিদ্ধ করিতে জ্বালে বসাইবে। এরূপ নিয়মে জল দিবে, মাংসে যেন অধিক জল না থাকে, অর্থাৎ মাংস প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিবে, অথচ জল-ও মরিয়া যাইবে। পরে, তাহাতে লবণ দিবে।

অনন্তর পাক-পাত্রে ঘৃত জ্বালে চড়াইবে, তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে লঙ্কা, লবঙ্গ, ছোট এলাচের দানা এবং তেজপাত ফোড়ন দিবে। পরে তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, আদা-বাটা, ধনে-বাটা, এবং সামান্য জীরা-মরীচ-বাটা দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। একটু পরে উহাতে দধি দিয়া নাড়িতে থাকিবে। এবং মধ্যে মধ্যে জলের ছিটা মারিতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে যখন বুঝিবে, মসলার গন্ধে ভর্‌-ভর্‌ করিতেছে, আর ঘৃতের উত্তম রং হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে মাংসগুলি ঢালিয়া দিবে। এবং অল্পক্ষণ নাড়া-চাড়ার পর, মাংসে গরম জল ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। দুই একবার ফুটিয়া উঠিলে, আলু ও ছোলা এবং লবণ দিয়া, মৃদু জ্বাল দিতে থাকিবে।

জ্বালে যখন দেখিবে, মাংস বেশ সুসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন উহা আর জ্বালে না রাখিয়া, পাক-পাত্র জ্বাল হইতে নামাইবে। এখন গরম মসলার গুঁড়া, এবং রুচি হইলে, ঘৃতে ভাজা পিয়াজের চূর্ণ উহাতে দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিলে-ই মিস্-কারি পাক হইল।

পথ্যে গাঁদাল পাতা ভাজা।

উদরাময় রোগীর পথ্যে গাঁদাল পাতার ঝোল ও পাতা ভাজা অত্যন্ত উপকারী। গাঁদাল পাতার ন্যায় পল্‌তা এবং নাল্‌তা-ও সুপথ্য; এমন কি, ঔষধের গুণ-কারক।

গাঁদাল এক-জাতীয় লতা; এই লতার পাতা-ই পথ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাঁদালের সতেজ পাতাগুলি ডাঁটা হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া, ভাল জলে ভাল করিয়া ধুইবে। জল ঝরিয়া গেলে, পাতায় লবণ মাখাইয়া রাখিবে।

এদিকে পাতার পরিমাণ বুঝিয়া, কড়াতে তৈল জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তদুপরি ফোড়ন দিয়া, পাতাগুলি ফেলিয়া দিবে। যদি পূর্ব্বে পাতায় লবণ মাখা না হয়, তবে এই সময় উহাতে লবণ দিতে পার। পাতাগুলি মুচ্‌মুচে হইলে, নামাইয়া আহার করিবে। ইহা অত্যন্ত সুপথ্য। রোগীর জন্য যে সকল ভাজা ব্যবহৃত হইবে, তাহাতে অধিক তৈল কিংবা ঘৃত আদৌ ব্যবহার করিবে না। কারণ, তদ্দারা পেটের অসুখ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আর তৈলাদি খাঁটি হওয়া আবশ্যক।

হিঞ্চে সিদ্ধ।

হিঞ্চে শাক অত্যন্ত উপকারী। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে লিখিত আছে—হিঞ্চে শাক সারক, তিক্ত রসযুক্ত, কুষ্ঠ-নাশক আর শ্লেষ্মা ও পিত্ত-নাশক।*

হিঞ্চে ভাতে ও ঘণ্ট রন্ধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শাক ভাতে দিয়া, সিদ্ধ করিলে, ভাতের রঙ্‌ ময়লা হইয়া থাকে, এজন্য ভাতে না দিয়া, স্বতন্ত্র সিদ্ধ করিয়া লইলে ভাল হয়।

* হিলমোচী সরা তিক্তা কুষ্ঠঘ্নী শ্লেষ্মপিত্তনুৎ।

টাট্‌কা শাকের কচি পাতা ও ডাঁটা-ই খাদ্যের উপযুক্ত। শক্ত ডাঁটা ও পাকা পাতা সুখাদ্য নহে, এবং পীড়া-দায়ক। হিঞ্চের কচি ডগা পাতা-সহ বাছিয়া লইবে; পরে তাহা ভাসা জলে ভাল করিয়া ধুইবে। এখন তাহা সিদ্ধ করিবে। যদি ভাতে সিদ্ধ করিতে হয়, তবে শাকগুলি একটি আঁটি বাঁধিয়া ভাতে দিবে। সিদ্ধ হইলে, উহার জল ঝরাইয়া, তাহাতে খাঁটি সরিষার তৈল ও লবণ মাখিয়া লইবে। কেহ কেহ আবার উহাতে কাঁচা লঙ্কা ও পিয়াজের কুচি-ও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সিদ্ধ করিবার সময় ডাঁটা-সহ উহা যেরূপ লম্বা লম্বা থাকে, আহারের সময় তাহা অত্যন্ত অসুবিধা-জনক হইয়া উঠে। এজন্য সিদ্ধ শাকগুলি ছুরি দ্বারা কুচি কুচ করিয়া, তাহাতে তৈলাদি মাখিয়া লইলে-ই ভাল হয়।

ডিমের কাট্‌লেট।

প্রথমে ডিম জলে সিদ্ধ করিবে। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে, ভিতরের তরলাংশ কঠিন হইবে। এখন ডিম গরম জল হইতে তুলিয়া লইবে। ঠাণ্ডা হইলে, ডিমের উপরিভাগের খোলা ছাড়াইবে। পরে ডিম খণ্ড খণ্ড আকারে কাটিবে।

এ দিকে কাঁচা ডিম ভাঙ্গিয়া, তাহার ভিতরের তরলাংশে আদার রস, পিয়াজের রস, লঙ্কা-বাটা বা গুঁড়া, লবণ এবং বিস্কুট অথবা ময়দা কিংবা বেসন মিশাইয়া ফেটাইবে। উহা যেন খুব ঘন না হয়। অনন্তর, ঘৃত জ্বালে বসাইয়া, পাকাইয়া লইবে। এই সময় এক এক খণ্ড ডিম গোলাতে ডুবাইয়া, ঘৃতে বাদামী ধরণে ভাজিয়া লইবে। ভাজা হইলে, গরম গরম পরিবেষণ করিবে।

ইচ্ছা হইলে আবার এই কাট্‌লেটের কালিয়া প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে নিয়মে কালিয়া পাক করা হইয়া থাকে, সেই নিয়মে পাক করিবে; কিন্তু অধিক ঝোল রাখিবে না। গা-মাখা-গোছের হইলে, বেশ মুখ-প্রিয় হইবে।

মাংসের বরফি।

মাংস দ্বারা নানাপ্রকার সুমিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। মাংসের জেলি, মাংসের রসগোল্লা প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য-সমূহ রসনার অত্যন্ত আদরণীয়। মাংস স্বভাবত-ই পুষ্টিকর, উহা যে-কোন-প্রকারে আহার করিলে, শারীরিক বল-বিধান-পক্ষে বিশেষরূপ উপকার হইয়া থাকে।

প্রথমে মাংস বড় বড় আকারে কুটিয়া লইবে। পরে তাহা জ্বালে সিদ্ধ করিবে। উত্তমরূপ সুসিদ্ধ হইলে, জ্বাল হইতে নামাইবে। এবং হাত-সওয়া ঠাণ্ডা হইলে, তাহা খুব চট্‌কাইবে। অনন্তর হাড় ও মাংস ফেলিয়া দিয়া, যূষ বা ঝোল একটী পাত্রে রাখিবে। এ দিকে ডিম ভাঙ্গিয়া, তাহার শ্বেতাংশ এক পাত্রে ও হরিদ্রাংশ অপর পাত্রে রাখিবে। এখন ঝোলের সহিত ডিমের হরিদ্রাংশ মিশাইয়া, খুব ফেটাইতে থাকিবে। উত্তমরূপ ফেটান হইলে, আবার শ্বেতাংশ মিশাইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় ফেটাইয়া লইবে। পরে বার-কতক এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা-ঢালি করিয়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এখন এই ঝোল আগুনে চড়াইয়া, মৃদু জ্বাল দিতে থাকিবে। দুই একবার ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে পরিমাণ-মত ছোট এলাচের গুঁড়, দারুচিনির গুঁড়, এবং চিনি দিয়া নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে, বেশ আঠার ন্যায় হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহা জ্বাল হইতে নামাইয়া, পুনর্ব্বার কাপড়ে ছাঁকিয়া, একটী পাতলা রূপার বা কলাই করা বাটীতে রাখিবে। অনন্তর, বাটীটী বরফের উপর বসাইয়া দিবে। অর্থাৎ এরূপ নিয়মে বসাইবে, যেন বাটীর চারিদিক বরফে ডুবিয়া থাকে, অথচ বরফ গলিয়া যেন ভিতরে জল প্রবেশ করিতে না পারে। বরফে মধ্যে মধ্যে লবণ মাখাইয়া দিবে, তাহা হইলে, উহা শীঘ্র গলিয়া যাইবে না। যেখানে বরফ পাওয়া না যায়, তথায় এক পোয়া সোরা ও এক ছটাক নিষাদল জলে গুলিয়া, সেই জলের উপর বসাইলে-ও জমিয়া যাইবে। একবারে না জমে, আধ ঘণ্টা অন্তর ঐরূপ জল প্রস্তুত করিয়া, দুই তিন-বার বসাইলে-ই জমিয়া যাইবে। জমিয়া আসিলে, বরফি কাটার ন্যায় ছুরী দ্বারা কাটিয়া লইবে।

লাউয়ের সরুচুকলি।

পিটে কিংবা পায়সের পক্ষে কচি লাউ-ই প্রশস্ত। প্রথমে লাউয়ের খোসা এবং বুকো ছাড়াইয়া ফেলিবে। পরে তাহা সরু সরু করিয়া কুটিয়া, জলে সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে, তাহা জ্বাল হইতে নামাইবে। এবং ঠাণ্ডা হইলে, তাহা নিংড়াইয়া, জল গালিয়া ফেলিবে।

এ দিকে, একটী পাক-পাত্রে ঘৃত জ্বালে চড়াইবে। এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত ও জীরে ফোড়ন দিবে। জীরেগুলি ফুটিয়া আসিলে, তাহাতে লাউ দিয়া নাড়িতে চাড়িতে থাকিবে। ইচ্ছা করিলে, ফোড়নে ছোট এলাচের দানা অল্প থেঁত করিয়া দিতে পার। লাউ উত্তমরূপ কসা হইলে, তাহা নামাইবে।

এখন সরুচুকলির যেরূপ গোলা প্রস্তুত করিতে হয়, চাউলের গুঁড়ি দুধে গুলিয়া, সেইরূপ গোলা করিবে। এই গোলাতে লাউ দিয়া, খুব চট্‌কাইবে। চট্‌কাইলে, উহা গোলার সহিত উত্তমরূপ মিশিয়া যাইবে। অনন্তর এই গোলাতে সরুচুকলি প্রস্তুত করিবে। লাউ-পিটে অত্যন্ত মোলায়েম হইয়া থাকে; এবং উহা খাইতে-ও বেশ সুখাদ্য। কামিনী ধানের চাউলের যে গুঁড় হয়, তদ্দ্বারা যে কোন পিটে প্রস্তুত করিলে, তাহা অতি উপাদেয় হইয়া থাকে। চাউলের গুঁড়র অভাবে, ময়দার আটাতে-ও পিটে তৈয়ের করিতে পারা যায়। ইহা সরুচুকলির ন্যায় খাইতে হয়।

মিষ্ট গোকুল-পুরি।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ এই লুচি খাইতে ভাল বাসিতেন বলিয়া-ই, ইহার নাম গোকুল-পুরি হইয়াছে। এই পুরি বেশ সুখাদ্য। নারিকেল-দুধ দ্বারা গোকুল-পুরি প্রস্তুত করিতে হয়। লুচির ময়দা যে নিয়মে মাখিতে হয়, সেই নিয়মে, জলের পরিবর্ত্তে, নারিকেল-দুধে ময়দা মাখিবে। মিষ্ট পুরি ভাজিতে হইলে, নারিকেল-দুধে চিনি মিশাইয়া ময়দা মাখিবে। এখন, ছোট ছোট এক একটি লেচি কাটিয়া, তদ্দ্বারা সুগোল লুচি বেলিবে। পরে তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। ঘৃতে ভাজিবার সময় মধ্যে মধ্যে, ঝাঁঝরা হাতার

লুচি ঘৃতে ডুবাইয়া ধরিবে, খুব ফুলিয়া উঠিবে। গোকুল-পুরি ক্ষীরে ডুবাইয়া খাইতে বড় ভাল লাগে।

যদি নিম্‌কি করিতে ইচ্ছা হয়, তবে ময়দায় লবণ মিশাইয়া লইয়া, নারিকেল-দুধে মাখিবে। আর মাখা ময়দায় কিছু কালজীরা ও লেবুর রস মিশাইয়া লইলে, নিম্‌কি অত্যন্ত সুখাদ্য হইয়া থাকে। অনন্তর, নিম্‌কি ভাজার নিয়মানুসারে ময়দা বেলিয়া, উহা ভাজিয়া লইবে।

আঙ্গুর-ক্ষীর।

প্রথমে আঙ্গুরগুলির বোঁটা ফেলিয়া দিয়া পরিষ্কার করিবে; এবং যে সকল ফল পচা বা দাগী, তাহা ফেলিয়া দিবে। এখন, এক পোয়া আঙ্গুর অল্প জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহার রস বাহির করিবে। রস বাহির করিয়া, একটী পরিষ্কৃত পাক-পাত্রে করিয়া, তাহা মৃদু জ্বালে বসাইবে। রস গরম হইলে, তাহাতে এক ছটাক চিনি মিশাইবে। তাপে ফুটিতে আরম্ভ হইলে, দুইটী ডিমের হরিদ্রাংশ ফেনাইয়া, উহাতে ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে চাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে, রস ঘন হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে পরিমাণ-মত গোলাপ-জল, অথবা রসের ঠাণ্ডা অবস্থায় দুই এক ফোঁটা গোলাপী আতর মিশাইয়া, একবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লইলে-ই আঙ্গুরের উপাদেয় ক্ষীর প্রস্তুত হইল। এই ক্ষীর অত্যন্ত সুখাদ্য এবং পুষ্টি-কর। শরীরের বল-বৃদ্ধির পক্ষে আঙ্গুর-ক্ষীর যার-পর-নাই উপকারী।

পাঁউরুটীর পুডিং।

কিস্‌মিস্, মাখন, চিনি, লবণ, ডিম এবং পরিমাণ-মত দুগ্ধ। একটি পাক-পাত্রে মাখন দিয়া, কিস্‌মিস্ ও রুটী থাক্ থাক্ সাজাইয়া, পাত্রটী পূর্ণ কর। পরে তাহাতে দুগ্ধ, চিনি ও ডিমের কুসুমাংশ ঢালিয়া দাও। অল্পক্ষণ পরে তাহাতে সামান্য মাত্রায় লবণ দিয়া, কাঠ-কয়লার দমে বসাইয়া রাখিলে-ই পুডিং প্রস্তুত হইবে।

পুডিং প্রস্তুতের নিয়ম একরূপ নহে; ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পুডিং বিভিন্নাকারে তৈয়ার করিতে হয়। ভিন্নতানুসারে যে, পুডিংএর আস্বাদ-গত পার্থক্য হইয়া থাকে, তাহা বলা-ই বাহুল্য।

সরেলা।

উপকরণ ও পরিমাণ।—সর এক সের, দোবরা চিনি আধ সের, পানিফলের পালো এক পোয়া। বাদাম এক ছটাক ও পেস্তা এক ছটাক, ছোট এলাচের দানা এক আনা, জাফরাণ দুই আনা, দুধ এক সের, ঘৃত এক পোয়া, এবং পরিমিত গোলাপী আতর।

প্রথমে খাঁটি দুধের সর প্রস্তুত করিবে; অনন্তর, একখানি চাটু মৃদু আঁচে বসাইয়া, তাহাতে অল্প ঘৃত ঢালিয়া দিবে। উহা পাকিয়া আসিলে, তদুপরি সরখানি পাতিয়া দিবে। আগুনের আঁচে সরের নীচের পিঠের দুধ শুকাইয়া আসিবে; এখন সরখানি তুলিয়া, পাত্রান্তরে রাখিবে, এবং ছুরি দ্বারা তাহা সরু সরু করিয়া কাটিবে। কর্ত্তিত সরের কুচিগুলি লাল্‌ছে ধরণে ঘৃতে ভাজিয়া রাখিবে।

এদিকে দুই-তার-বন্ধ চিনির রসে পানিফলের পালো মিশাইয়া জ্বালে বসাইবে। উহা দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, তাহাতে দুধ ঢালিয়া দিবে। জ্বালের অবস্থায় যে, উহা মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। যখন দেখিবে, দুধ ও চিনির রস অর্দ্ধেক মরিয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে সরের কুচি, বাদাম ও পেস্তা ঢালিয়া দিয়া, মৃদু তাপ দিতে থাকিবে। সামান্য রস থাকিতে থাকিতে, তাহাতে জাফরাণ-বাটা দিয়া নামাইয়া লইবে। এবং শীতল হইলে, তাহাতে গোলাপী আতর মিশাইবে। আতর ব্যবহারে আপত্তি থাকিলে, উহার পরিবর্ত্তে কর্পূর মিশাইবে। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, সরেলা প্রস্তুত হইবে। সরেলা অতি উপাদেয় এবং পরম পবিত্র খাদ্য।

পাক-প্রণালী।

বৃদ্ধাবস্থার খাদ্য।
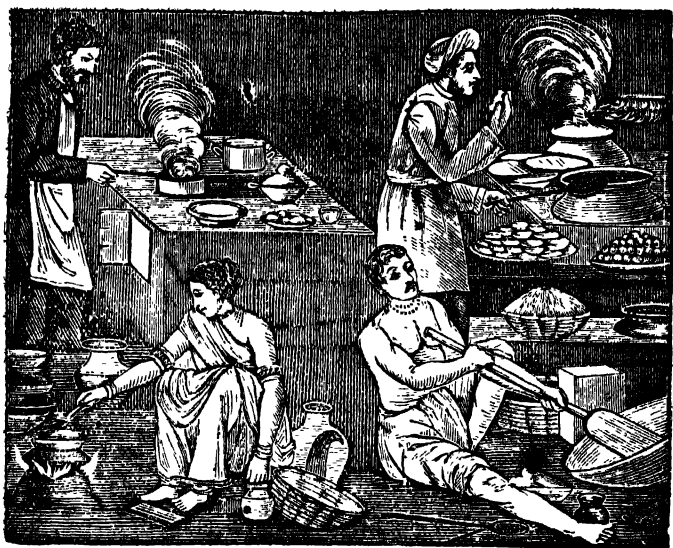
যে খাদ্য আমাদের দেহ-ধারণ ও জীবন-রক্ষার একমাত্র নিদান, সেই খাদ্যের অপব্যবহার দ্বারা আবার আমাদের দেহ-ভঙ্গ এবং জীবন-ক্ষয় হইয়া থাকে। দেহ রক্ষা করিতে হইলে, স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্য আহার করা একান্ত আবশ্যক। বয়োভেদে আবার খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বাচন করিতে হয়। যে খাদ্য আহার করিয়া, শিশুর দেহ-বর্দ্ধন ও রক্ষণ হইয়া থাকে। তাহা আহার করিয়া, একজন যুবক কখন-ই জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না; আবার যে পরিমিত গুরু-পাক খাদ্য আহার করিয়া, যুবক সহজে জীর্ণ

করিতে সমর্থ হন, বৃদ্ধের পক্ষে তাহা আবার বিষ-তুল্য হইয়া উঠে। এইরূপ বয়স, স্বাস্থ্য এবং শ্রমশীলতা-অনুসারে আহারের পার্থক্য হইয়া থাকে। বৃদ্ধ বয়সে শরীর-যন্ত্র-সমূহ শিথিল হইয়া আইসে; দেহে শোণিত-প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া পড়ে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেহ ক্ষয় হইতে থাকে। একদিকে বার্দ্ধক্য ও অপর দিকে মৃত্যু, বৃদ্ধ এই সন্ধি-স্থলে দণ্ডায়মান থাকেন। সুতরাং এ সময়ে খাদ্যাদি বিষয়ে যে পরিমাণে ত্রুটি ঘটিবে, সেই পরিমাণে মৃত্যু-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। অতএব, এই সময়ে আহারে সংযম-ই বৃদ্ধের জীবন-রক্ষার একমাত্র সহায়। কিরূপ আহার দ্বারা বৃদ্ধের দেহ সুস্থ থাকিতে পারে, তৎসম্বন্ধে স্বাস্থ্য-পত্রের লিখিত প্রবন্ধ নিম্নে প্রকটিত হইল।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিশ্বজনীন নিয়ম। এই নিয়মের বশে সকল জিনিসের-ই উৎপত্তি, বৃদ্ধি এবং বিনাশ ঘটিতেছে। পৃথিবীর স্থাবর-জঙ্গম, মনুষ্য, কীট-পতঙ্গাদি সকলে-ই এই নিয়মের অধীন। আজি যাহা নাই, কালি তাহা হইতেছে, যতদূর বৃদ্ধি পাইবার পাইতেছে, তাহার পর-ই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, যাহা হইতে উৎপত্তি, তাহাতে-ই বিলীন হইতেছে। মনুষ্য-ও ঐরূপে জন্ম-জরাদির বশীভূত;—আজি জরায়ু-মধ্যে, যথাকালে তাহা হইতে বহির্গত হইয়া, শৈশব বাল্যাদি অবস্থায়, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, যৌবনে পূর্ণাঙ্গতা পাইতেছে!

এই সকল অবস্থায় মানব-দেহের সমস্ত যন্ত্র-ই সমধিক কর্ম্ম-শীল থাকে। শরীরে শোণিত-স্রোত খরবেগে প্রবাহিত হয়; শরীর সমধিক কর্ম্মক্ষম হইয়া থাকে, পাক-যন্ত্রে পাচক-রস প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, শরীর-ও তদনুসারে সবল ও হৃষ্টপুষ্ট হয়। যৌবনে এই জন্য-ই সর্ব্বাবয়ব স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট এবং সুগোল ও সুন্দর হইয়া থাকে। যৌবনের পর, যত-ই বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, তত-ই রক্তের তেজ কমিয়া আইসে, অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ রক্ত-সঞ্চালন হয় না। তাহা না হইলে-ই, সমস্ত যন্ত্র শিথিল হইয়া আইসে, শরীরস্থ পেশীগুলি-ও পূর্ব্ববৎ স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্ট থাকে না, ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আইসে, তাহাদের আকুঞ্চন-প্রসারণ-শক্তি-ও উত্তরোত্তর কমিতে থাকে, আভ্যন্তরিক যন্ত্র যকৃৎ, মূত্রাশয় এবং পাকা-শয়াদির অভ্যন্তরে শোণিত-সঞ্চালন ক্রিয়ার-ও হ্রাস জন্মে, পাকাশয়ে পূর্ব্ববৎ পাচক-রস-ও সঞ্চিত হয় না; কারণ, পাচক-রসোৎপাদনের সহিত রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়ার বড়-ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। রসশোষিকা নাড়ীগুলির ক্রিয়া-ও মন্দীভূত হইয়া

আইসে। কায়িক ও মানসিক শ্রমশীলতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে। আলস্যপ্রিয়তা জন্মে; পাকাশয়, আমাশয়, ও অন্ত্রাদি যন্ত্রের আকুঞ্চন-প্রসারণ-শক্তি-ও এই সকলের সহিত কমিতে থাকে, এজন্য বার্দ্ধক্যে কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরে বায়ু-সঞ্চার বেশী হয়। ইহা হইতে-ই পরিপাক-শক্তি কমিতে থাকে। ত্রিশ বৎসর বয়সে শারীরিক ক্লেদ নিঃসারণ-শক্তি যেরূপ বলবতী থাকে, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাহার অনেক হ্রাস হয়। যে জিনিষ যত অধিক ব্যয় হয়, তাহার আয়-ও তত অধিক হওয়া আবশ্যক, না হইলে জমায় খরচে কুলাইবে কেন? যদি শরীর-বিধানে বেশী ক্ষয় না হয়, তবে আর অধিক খাদ্যের পরিমাণ কমাইতে ও বাড়াইতে হয়। এ বিষয়ে সামঞ্জস্য না রাখিতে পারিলে-ই ঠকিতে হয়—শরীরে রোগ সঞ্চিত হয়। কর্ম্মক্ষম যৌবনে যে আহার করিয়া জীর্ণ করিতে পারা যায়, বৃদ্ধ বয়সে যদি সেইরূপে রসনা-তৃপ্তির জন্য উদর পূর্ণ করিয়া, ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে, রসনা-পরিতোষের জন্য বিষময় ফল উৎপন্ন হয়,—তদ্দ্বারা শরীর খুব মোটাইয়া যায়, অর্থাৎ দেহে মেদ বৃদ্ধি পায়, না হয় বাত রোগে সমধিক কষ্ট দেয়, অথবা শরীর-যন্ত্রগুলির মধ্যে এরূপ দূষিত পদার্থ সকল সঞ্চিত হয় যে, তদ্দ্বারা অল্পে অল্পে তাহাদের ক্রিযা-বিকৃতি জন্মে, এবং তাহা হইতে-ই ক্ষয় উৎপন্ন হয়। ফলকথা, ইহা টাকা কড়ি নহে,—টাকা কড়ি যত জমে, তত-ই ভাল, কিন্তু শারীরিক আয় ব্যয়ের অবস্থা অন্যরূপ; ইহার জমায় খরচে ঠিক থাকা-ই ভাল; জমা বেশী, খরচ কম, বা জমা কম, খরচ বেশী, এতদুভয়ের কিছু-ই ভাল নহে। বৃদ্ধাবস্থায়, শারীরিক ব্যয় কমিয়া আইসে, এজন্য খাদ্যরূপ জমা-ও কম করা কর্ত্তব্য। অল্প বয়সে যখন শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি বর্দ্ধনশীল থাকে, কিংবা কর্ম্মক্ষম যৌবনে যখন শরীর হইতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষয় হয়, তখন প্রভূত পরিমাণে পুষ্টি-কর খাদ্য ভক্ষণ করা আবশ্যক। পরিণত বয়সে শারীরিক শ্রমের মাত্রানুসারে উহার হ্রাস বৃদ্ধি করিতে হয়; অর্থাৎ যদি শারীরিক শ্রম বেশী করিতে হয়, তাহা হইলে, খাদ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বাড়াইতে হয়, নতুবা, উহা কমাইয়া দেওয়া-ই ভাল। এরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলে, তবে, শরীর সুস্থ থাকে এবং দীর্ঘজীবী হইতে পারা যায়।

বৃদ্ধাবস্থায় আহারের পরিমাণ না কমাইলে, চর্ব্বি বৃদ্ধি পায়, বাতে ধরে,

অকাল-জরা হয়। একজন ডাক্তার শতবর্ষজীবী লোকের তালিকা সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ঠিক। ঐ সকল শতবর্ষজীবী ব্যক্তিগণ বার্দ্ধক্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পাহার করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকের-ই মাংসাহারে অভ্যাস ছিল। সাঁইত্রিশ জনের মধ্যে একজন বেশী বেশী খাইতেন, নয় জন মাঝামাঝি, কুড়ি জন তদপেক্ষা কম, চারি জন নাম মাত্র খাইতেন, এবং তিন জন নিরামিষভোজী ছিলেন। যাঁহারা মাঝামাঝি মাংসাহার করিতেন বলা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে একজন দেড় পোয়া, একজন তিন ছটাক, একজন আড়াই ছটাক, আর ছয় জন আধ পোয়া করিয়া খাইতেন। সুরা-সেবন সম্বন্ধে-ও তাঁহাদের তদ্রূপ মিতাচারিতা ছিল। পনর জন মোটে-ই সুরাপান করিতেন না। চব্বিশ জন অল্প পরিমাণে, দশ জন তদপেক্ষা বেশী, আর কতকগুলি লোক অল্প বয়সে পান করিতেন, বার্দ্ধক্যে একবারে-ই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সকল লোকের বিষয় পাঠ করিয়া, বুঝা যায় যে, মদ্য, মাংস সম্বন্ধে তাঁহারা বিলক্ষণ মিতাচার ছিলেন।

বার্দ্ধক্যে দন্তহীনতা প্রযুক্ত, কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ পরিত্যাগ করা-ই ভাল। উপযুক্তরূপ চর্ব্বণ ব্যতীত কঠিন দ্রব্য পরিপাক করা যায় না, যাহা সুজীর্ণ হয় না, তাহা খাইলে, শরীর কখন সুস্থ থাকিতে পারে না। অতএব, তাহা পরিত্যাগ করা-ই যুক্তিযুক্ত। যে সকল দ্রব্য অতি কোমল, সেই সকল দ্রব্য অথবা তরল দ্রব্যের উপর-ই বৃদ্ধদিগের অধিক নির্ভর করা কর্ত্তব্য। অল্প বয়সে কোন রোগ ভোগ করিয়া, যদি দন্তের অকাল-পতন ঘটে, তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত বিধি ব্যবস্থা মানিবার ততটা প্রয়োজন নাই।

সার্ হেনরি টমশন নামে বিলাতের একজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বয়স এবং শারীরিক শ্রমভেদে আহারের পরিমাণের তারতম্য সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"আশী নব্বুই বৎসরের বৃদ্ধ প্রায়-ই পাতলা ও অল্পাহারী হইয়া থাকেন।" পাঠক, তদ্রূপ বয়সে কি কাহাকে-ও স্থূলকায় ও বহুভোজী দেখিয়াছেন? বোধ হয়, নয়। কোন কারণে পরিণত-বয়স্ক ব্যক্তি-গণের আহারের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, অল্পে অল্পে করা-ই ভাল। সহসা পরিবর্ত্তন করিলে, বিপরীত ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা। বৃদ্ধদিগের নিমন্ত্রণ খাওয়া কোন-মতে উচিত নহে। তাহার প্রথম কারণ—নিমন্ত্রণ স্থলে বহুবিধ খাদ্য

প্রস্তুত হয়, একটু একটু করিয়া, সকলগুলি খাইলে-ও ভোজনের গুরুতা জন্মে। আর এক কথা, যুবাদিগের পরিপাক-শক্তি, অতি ভোজনে বিকৃত হইলে-ও, সহজে প্রকৃতিস্থ হয়; কিন্তু বৃদ্ধদিগের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে; তাঁহারা ঐরূপ করিলে, নিশ্চয়-ই রুগ্ন হইয়া পড়িবেন।

অতএব, আমাদের দন্তহীন পিতামহ-স্থানীয় বৃদ্ধ মহাশয়গণের পক্ষে ভাল জ্বাল দেওয়া দুধ, আর দুটি গলা ভাত ভিন্ন, অন্য কোন প্রকার গুরুপাক বা কঠিন দ্রব্য খাদ্যের পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। তবে, সুসিদ্ধ শাক-সব্জী, পক্ক আম্রাদি ফল চোষণ দ্বারা তৎসমুদায়ের শস্যাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে। ফলকথা, যাহাতে পাকস্থলীকে অধিক খাটিতে হয়, এরূপ দ্রব্য ভক্ষণ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। আমাদিগকে জীবনের আরম্ভে ও অন্তে দ্বিবিধ অবস্থাতে-ই দন্ত-হীন হইতে হয়। আর এই দুইটী অবস্থাতে-ই দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কোন আহারের উপর নির্ভর করিতে পারা যায় না। বৃদ্ধকে বলিষ্ঠ করিবার জন্য অধিক পরিমাণে খাওয়াইয়া কুফল ফলিতে দেখা গিয়াছে।

অন্ন-পাক।

রিষ্কৃত অন্ন দেখিতে-ও যেমন সুন্দর, আহারে-ও আবার সেই-রূপ তৃপ্তি-জনক। প্রথমে চাউলগুলি ঝাড়িয়া, হাত-বাছাই করিয়া লইবে। পরে তাহা ভাসা জলে দুই তিন বার উত্তমরূপ ধুইবে। এই ধৌত চাউল জলে ভিজাইয়া রাখিবে।

এদিকে উনানে জল চড়াইবে। অন্ন-পাকে জলের পরিমাণ একটু অধিক দিলে ভাল হয়। কারণ বেশী জলে ভাতগুলি গা-মেলিয়া বেশ নড়িতে চড়িতে পারে; আর চাউলের ময়লা ফেনের সঙ্গে বাহির হইয়া, অন্ন সুন্দররূপ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

লিখিত নিয়ম ব্যতীত অন্ন পাকের সময়, জলে সামান্য ফটকিরি দিলে, অন্নগুলি মল্লিকা ফুলের ন্যায় সাদা ধব্ ধব্ করিতে থাকে। পূর্ব্বে উনানে যে জল-সহ ভাতের হাঁড়ি বসাইয়াছ, হাঁড়ির জল গরম হইলে, তাহাতে ধৌত চাউল ঢালিয়া দিবে। কাঁচা জলে চাউল দিবে না। এখন এই গরম জলে ফটকিরির গুঁড় এবং সামান্য লেবুর রস দিবে। ফটকিরি আগুনের উপর কিংবা তাওয়ার উপর রাখিলে-ই খৈ হইবে। ঐ খৈ গুঁড় করিয়া, ভাতের জলে দিবে। এই সময় লেবুর রস-ও দিতে পার। ফটকিরি ও লেবুর রসে ভাত পরিষ্কৃত হইবে। ফটকিরি দেওয়া হইলে, হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। উথলিয়া উঠিলে, ভাতের ফেন কাটিয়া ফেলিয়া দিবে। অনন্তর অন্ন সুসিদ্ধ হইলে, ভাতের ফেন গালিয়া ফেলিবে। ফেন গালিয়া, হাঁড়িটী আর একবার আগুনের দমে বসাইবে। এইরূপ বসাইবার কারণ এই যে, আগুনের আঁচে ভাতের জল মরিয়া, উহা বেশ ঝরঝরে হইবে। ঝরঝরে ভাত-ই উত্তম সুখাদ্য।

আবার কেহ কেহ ফেন গালিবার পূর্ব্বে, ভাতে খানিকটা কাঁচা জল ঢালিয়া দিয়া, ফেন গালিয়া থাকেন। এইরূপ কাঁচা জলে ধৌত অন্ন অত্যন্ত লঘু-পাক। আর এইরূপ শীতল জল দ্বারা ধুইয়া না লইলে, সেই অন্ন গুরু-পাক হইয়া থাকে।

বৈদ্য-শাস্ত্র-মতে নূতন চাউলের অন্ন শ্লেষ্ম-কর, স্বাদু, সুস্নিগ্ধ, পুষ্টি-কর আর গুরু। পুরাতন চাউলের অন্ন, রুক্ষ, পথ্য ও অগ্নি-বৃদ্ধি-কর। এই কারণে-ই রোগীর পথ্যে এই চাউল ব্যবহার করা উচিত।

পূর্ব্বে-ই বলা হইয়াছে যে, ফেন গালিবার পূর্ব্বে অন্নে কাঁচা জল ঢালিয়া ফেন না গালিলে, সেই অন্ন গুরু-পাক হইয়া থাকে। সেইরূপ ঠাণ্ডা ভাত-ও আহার করিলে, তাহা-ও গুরু-পাক হইয়া থাকে। অর্থাৎ সহজে হজম হয় না। ভাবপ্রকাশ-নামক চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিত আছে, কাঁচা জলে ধুইয়া ফেন গালিয়া লইলে, সেই গরম ও পবিষ্কৃত অন্ন আহার করিলে, অগ্নির বৃদ্ধি হয়, তৃপ্তি জন্মে, প্রস্রাব হয়, এবং অত্যন্ত লঘু হয়। আর ঐরূপ অধৌত অন্ন শীতল, বৃষ্য, গুরু-পাক ও কফ-জনক। অত্যন্ত গরম ভাত আহার করিলে, বলের হ্রাস হইয়া থাকে। আর ঠাণ্ডা ও কড়কড়ে ভাত সহজে হজম হয় না। †

ভাত ভিজাইয়া রাখিয়া, যে ভাত প্রস্তুত হয়, তাহাকে পান্তা ভাত কহে। এই ভাত আহার করিলে, নানাবিধ রোগ হইতে পারে। বিশেষতঃ যে সময় দেশ-মধ্যে ওলাউঠা রোগ হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় বাসী পান্তা, কড়কড়ে কিংবা নূতন চাউলের অন্ন আদৌ ব্যবহার করা উচিত নহে। পান্তা ভাত বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা-কর আর রুক্ষ। ‡

---

* সুধৌতঃ প্রস্রুতঃ স্বিন্নঃ সন্তপ্তশ্চোদনো লঘুঃ।
অধৌতঃ প্রস্রুতঃ স্বিন্নঃ শীতশ্চাপ্যোদনো গুরুঃ॥—চরক।

† ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং মূত্রলং লঘু।
সুধৌতং প্রস্রুতং চোষ্ণং বিশদং গুণবত্তরং॥
অধৌতমস্রুতং শীতং বৃষ্যঙ্গুরু কফপ্রদং।
অত্যুষ্ণং বলহৃদ্ভক্তং শীতং শুষ্কঞ্চ দুর্জ্জরং॥—ভাবপ্রকাশ।

‡ ত্রিদোষকোপনং রুক্ষং বার্য্যন্নং নিশি সংস্থিতং।—রাজবল্লভ।

উদরাময় রোগীর পক্ষে পোড়ের ভাত যার-পর-নাই উপকারী। এই অন্ন ধারক, লঘু-পাক আর পুষ্টি-জনক। ঘুঁটের আগুনে পোড়ের ভাত রাঁধিতে হয়। কয়লার জ্বালে পক্ক অন্ন রোগীর পক্ষে অব্যবহার্য্য। মোটা চাউল অপেক্ষা সরু পুরাতন চাউলের অন্ন-ই অতি উপাদেয় উপকার-জনক খাদ্য।

ফেন্‌সা ভাত।

এই ভাত অত্যন্ত পুষ্টি-কর। ভাতের মাড় বা ফেন গালিয়া ফেলিলে, সেই সঙ্গে অন্নের সার-ভাগ বাহির হইয়া যায়। যে সকল অন্নের ফেন গালা হয় না, অর্থাৎ পোলাও, খিচুড়ি এবং ফেন্‌সা-ভাত অত্যন্ত পুষ্টি-কর এবং গুরু-পাক। সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউলের-ই ফেন্‌সা-ভাত অত্যন্ত সুস্বাদু হইয়া থাকে। মাদ্রাজের উপকূলবর্ত্তী লোকেরা ফেন্‌সা ভাত খাইতে ভালবাসে। তাহারা নারিকেল-দুধে এই অন্ন পাক করিয়া থাকে। নারিকেল-দুধে অন্ন পাক করিলে, তাহা মিষ্ট আস্বাদনের হইয়া থাকে।

ফেন্‌সা ভাত রাঁধিতে হইলে, ভাত সিদ্ধ হইলে, তাহা ঘন ঘন নাড়িয়া চাড়িয়া, ভাত ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। ভাত ভাঙ্গিয়া, ফেনের সহিত মিশিয়া, বেশ লপেট-গোছের হইয়া যায়। ইহার ফেন গালিতে হয় না। এই গলা ভাত, ভাজা-পোড়া প্রভৃতির সহিত আহার করিতে হয়। ভাল টাট্‌কা ঘৃত মাখিয়া খাইলে, উহা অতি তৃপ্তি-কর হইয়া থাকে। ফেন্‌সা ভাত গরম গরম বেশ সুখাদ্য। ছোট ছোট নিরোগী, ছেলেদিগকে এই ভাত খাইতে অভ্যাস করাইলে, তাহারা বলবান্ হইতে পারে।

মটন (মেষ-মাংস) নির্ব্বাচন।

ঋতু-ভেদে এবং শরীরের অবস্থা-ভেদে মাংস নির্ব্বাচন করিয়া আহারে ব্যবহার করিতে হয়; নতুবা পীড়া হইবার সম্ভাবনা। মেষ-মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টি-কর। কিন্তু বৎসরের মধ্যে সকল সময় উহা আহার করা উচিত নহে। সচরাচর হেমন্ত ও শীত ঋতু এবং বসন্ত কালের প্রারম্ভে মটন ব্যবহার করিবার প্রশস্ত সময়। অন্যান্য ঋতুতে এই মাংস আহার না করা-ই ভাল।

যে কোন জন্তুর মাংস রাঁধিবার পূর্ব্বে, প্রত্যেক পাচক কিংবা পাচিকার জানা আবশ্যক, কি-প্রকার মাংস রন্ধন ও ভোজনের উপযোগী। হাড়-সার মেষ-মাংস সুখাদ্য নহে, অর্থাৎ যে মেষ বেশ মাংসাল, তাহার-ই মাংস রন্ধনের পক্ষে প্রশস্ত। যে মেষ অত্যন্ত মোটা, অথচ পা ছোট, এবং যাহাকে দানা খাওয়াইয়া, পালন করা হইয়াছে, সেই মেষের মাংস স্বভাবতঃ-ই সুস্বাদু হইয়া থাকে। যে মেষের মাংস বেশ উজ্জ্বল, এবং যাহার চর্ব্বি বেশ ধব্‌-ধবে সাদা, তাহা-ই আহারের উপযোগী। যে মাংস চোঁচ-চোঁচ, আর যাহার চর্ব্বি হরিদ্রা-বর্ণের হইয়াছে, তাহা আহারে ব্যবহার করা উচিত নহে; কারণ, এরূপ মাংসাদি আহার করিলে, উদরাময় প্রভৃতি রোগ হইতে পারে। পাঁচ বৎসর বয়স না হইলে, মেষ আহারের উপযোগী হয় না। পাঁচ বৎসরের কম বয়স হইলে, সেই মেষ-মাংস তত সুস্বাদু এবং উপকার-জনক হয় না। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মেষ পুষিয়া, তাহাকে এতদিন খাওয়াইয়া, আহারের উপযোগী করিয়া, সচরাচর বাজারে বিক্রয় হয় না। সাধারণতঃ তিন বৎসর বয়সের মেষ-ই বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে।

মেষের রাঙ্‌ এবং পশ্চাতের অংশ-ই উৎকৃষ্ট। মেষের দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। মেষের কোমরের অংশে কিংবা অবিভক্ত পৃষ্ঠদেশে অতি উৎকৃষ্ট রোষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। মেষের ঘাড়ের মাংস অর্থাৎ গর্দ্দানা তত সুখাদ্য নহে; কিন্তু কেহ কেহ ঘাড়ের মাংসের ষ্টু ভালবাসিয়া থাকেন। ফলতঃ মেষের ঘাড়ের মাংসে ষ্টু কিংবা সিদ্ধ করিয়া আহার করা-ই ভাল। মেষের গর্দ্দানার সংস্পৃষ্ট যে কোমল মাংসপিণ্ড, তাহা স্বভাবতঃ-ই অতি মোলায়েম হইয়া থাকে। এজন্য এই মাংসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে রোষ্ট করিলে, তাহা অতি উপাদেয় হয়। কিন্তু ঐ মাংস প্রথমে সিদ্ধ করিয়া লইয়া, পরে তদ্দ্বারা কট্‌লেট্‌ প্রস্তুত করিলে, তাহা অত্যন্ত তৃপ্তি-কর বোধ হইয়া, থাকে। লেজের সংস্পৃষ্ট অর্থাৎ পশ্চাৎভাগের যে মাংস, তাহাতে-ই চপ্‌ এবং কট্‌লেট্‌ হইতে দেখা যায়। মেষের নলী, ব্রথ অর্থাৎ যূষ ভিন্ন, অন্য কোন প্রকার রন্ধনে প্রায়-ই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না।

মটনের সাপ্‌টা ষ্টু।

মাংস হইতে চর্ব্বি তুলিয়া ফেল; এবং ছোট ছোট টুকরা করিয়া মাংস কুটিয়া রাখ। এখন ভাল করিয়া মাংস বাছিয়া লও, যেন উহাতে হাড় আদৌ না থাকে। পরে একটী প্রশস্ত পাক-পাত্রে এক থাক মাংস সাজাও। মাংসগুলি সাজাইবার পূর্ব্বে উহা একবার ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া লইবে, এবং পরিমাণ-মত মরীচের গুঁড়া ও সামান্য ময়দা উহাতে মাথিয়া লইবে। এইরূপ মাংস এক থাক সাজান হইলে, আধ ইঞ্চ পুরু করিয়া, শালগম উহার উপর সাজাইবে। শালগম চৌক চৌক করিয়া কুটিবে। শালগম সাজান হইলে, তাহার উপর ঐরূপ গাজর কুটিয়া সাজাইবে। গাজর দেওয়ার পূর্ব্বে শালগমের উপর পরিমাণ-মত লবণ এবং মরীচের গুঁড় ছড়াইয়া দিবে। এখন অবশিষ্ট মাংসের অর্দ্ধেক ঐ স্তরের উপর পুনরায় সাজাইয়া, অন্য কোন তরকারি কুটিয়া, তদুপরি সাজাইয়া দিবে। অনন্তর ঠাণ্ডা জল অথবা যুষ উহার উপর ঢালিয়া দিবে। জল কিংবা যুষ বা আথ্‌নি এরূপ নিয়মে দিবে, যেন মাংস প্রভৃতি বেশ ডুবিয়া যায়। পরে পাক-পাত্রটী আস্তে আস্তে মৃদু জ্বালে বসাইয়া দিবে।

দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত মৃদু জ্বালে আস্তে আস্তে মাংস ফুটিতে থাকিলে, উহা বেশ সুসিদ্ধ হইবে। রুচি-অনুসারে তরকারির স্তর সাজাইবার সময়, উহাতে পিয়াজের কুচি দিতে পারা যায়।

মাংস ও তরকারি পাক-পাত্রে সাজাইবার পূর্ব্বে, যদি ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, বাদামী ধরণে কসিয়া বা ভাজিয়া লওয়া যায়, তবে ষ্টুর বেশ রঙ্ খুলিয়া থাকে। আর উহা খাইতে-ও অধিকতর সুস্বাদু হইয়া থাকে। তৈল অপেক্ষা মাখন কিংবা ঘৃতে ভাজা-ই প্রশস্ত। আর অন্য কোন প্রকার মসলা ব্যবহার না করিয়া, পরিমিত কারি-পাউডার দিয়া পাক করিলে, ষ্টু অত্যন্ত রসনার তৃপ্তি-কর হইয়া থাকে।

ষ্টু রাঁধিবার যদি-ও অনেক-প্রকার নিয়ম আছে, কিন্তু লিখিত নিয়মটী তত মন্দ নহে।

বাঁধাকপির ফ্রিজি।

ইহা এক-প্রকার ভাজা-বিশেষ। ফ্রিজির পক্ষে শক্ত গোছের বাঁধাকপি-ই উত্তম। যে কপি খুব নিরেট, তাহার অর্থাৎ তালের উপরিভাগের পাকা পাতাগুলি খুলিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে তালটী ফালি ফালি করিয়া কুটিবে। পরে তাহা ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে।

এখন একটী হাঁড়িতে জলে লবণ গুলিয়া, জ্বালে চড়াইবে। অল্পক্ষণ জ্বাল পাইলে, হাঁড়ির জল ফুটিয়া, গাদ উঠিতে থাকিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গাদ উঠিবে, ততক্ষণ তাহা কাটিয়া বা তুলিয়া ফেলিবে। পরে তাহাতে কপির ফালিগুলি আস্তে আস্তে ছাড়িয়া দিবে। জ্বালে কপি সুসিদ্ধ হইলে, জল গালিয়া অথবা জল হইতে ফালিগুলি তুলিয়া লইবে। পরে এক একখানি ফালি খণ্ড খণ্ড আকারে কাটিয়া রাখিবে।

এদিকে পাক-পাত্রে মাখন কিংবা ঘৃত জ্বালে চড়াইবে; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে পূর্ব্ব-কর্ত্তিত কপির খণ্ডগুলিতে মরীচের গুঁড় ও লবণ মাখিয়া, ছাড়িয়া দিবে। ভাজার চুড়্-চুড়্ শব্দ হইতে থাকিলে, কপির উপর সামান্য ময়দা ছড়াইয়া দিয়া, আস্তে আস্তে একবার নাড়িয়া দিবে। নাড়িবার সময়, কপির পরিমাণ বুঝিয়া, ক্রমে ক্রমে তাহাতে ক্রিম বা দুধের সর দিতে থাকিবে। অনন্তর তাহা জ্বাল হইতে নামাইয়া, আহার করিবে। এই ফ্রিজি বেশ সুখাদ্য।

ফুলকপির ফ্রেঞ্চ-পাক।

প্রথমে কপির পাতাগুলি ফেলিয়া দিয়া, ফুলের গোড়া ঘেঁসিয়া, ডাঁটা কাটিয়া ফেলিবে। পরে ফুলটী তিন কিংবা চারি খণ্ডে বিভক্ত করিবে।

এখন পাক-পাত্রে আদ ছটাক মাখন ও কিঞ্চিৎ লবণ এবং গরম জল ঢালিয়া দিয়া, কপি-খণ্ডগুলি উল্টাভাবে অর্থাৎ গোড়ার দিক্ উপরের দিকে করিয়া সাজাইবে। এইরূপ অবস্থায় তপ্ত অঙ্গারের উপর, বার হইতে আঠার মিনিট পর্য্যন্ত রাখিলে, কপি বেশ সিদ্ধ হইবে। কপি সিদ্ধ হইলে, জল ঝাড়িয়া ফেলিবে। অর্থাৎ পাক-পাত্রের মুখে একখানি ঢাকনি চাপা দিয়া, পাত্রটী উল্টাইয়া ধরিবে, জল পড়িয়া যাইবে।

অনন্তর পাক-পাত্র হইতে কপিগুলি বাহির করিয়া, অপর একখানি পাত্রে ফুলটী এরূপে সাজাইবে, যেন উহা দেখিতে ঠিক একটী আস্ত ফুলকপির ন্যায় হয়। এখন এই কপির উপর মাখন-গলা ঘৃত ও লিমন যূষ এবং লবণ মিশ্রিত করিয়া মাখাইবে। এই পাকে অর্থাৎ সিদ্ধ ফুলকপি ফরাসিদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য।

পর্টু গিজ—পিয়াজ-সিদ্ধ।

পর্টু বালবাসীরা যে নিয়মে পিয়াজ সিদ্ধ করিয়া, আহার করিয়া থাকেন, তাহা বেশ সুখাদ্য। সাধারণ পিয়াজ-সিদ্ধ অপেক্ষা ইহাতে কিছু বিভিন্নতা আছে।

প্রথমে বড় বড় পাটনাই পিয়াজ বাছিয়া লইবে। পরে তাহার খোসা ছাড়াইয়া, তাহার বোঁটা কাটিয়া, জলে ধুইয়া লইবে। জল ঝরিয়া গেলে, একটী প্রশস্ত পাত্রে ধৌত পিয়াজগুলি সাজাইবে। কিন্তু উপরে উপরে সাজাইবে না; অর্থাৎ একটী স্তরে যা থাকে যতগুলি ধরে, সেই পরিমাণ সাজাইবে। এইরূপ নিয়মে সাজাইয়া, পিয়াজের উপর পরিমাণ মত লবণ ছড়াইয়া দিবে। এখন পিয়াজের উপর মাংসের আখ্‌নি ঢালিয়া দিয়া, মৃদু জ্বালে পাত্রটী বসাইয়া দিবে। কেহ কেহ আবার পিয়াজগুলি সিদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, উহা ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া, সিদ্ধ করিয়া লইয়া থাকেন। ভোক্তা-গণ উভয়-প্রকার নিয়মের মধ্যে যে কোন নিয়মানুসারে পাক করিয়া আহার করিতে পারেন। পিয়াজ সুসিদ্ধ হইলে, নামাইয়া আহার করিবে। এই পিয়াজ-সিদ্ধ খিচুড়ি কিংবা লুচি প্রভৃতির সহিত আহার করিতে পায়া যায়।

পাতাল-ফোঁড়।

ইহাকে ব্যাঙের ছাতা-ও কহিয়া থাকে। অনেকে ইহা আদরের সহিত আহার করিয়া থাকেন। ভাল করিয়া রাঁধিতে পারিলে, ইহার ব্যঞ্জন খাইতে মন্দ হয় না।

পাতাল-ফোঁড় টাট্‌কা অবস্থায় রাঁধিয়া খাইতে হয়। বাসী হইলে, তত সুখাদ্য হয় না। এজন্য উহা তুলিয়া, প্রথমে উহার ডাঁটা কাটিয়া ফেলিবে।

পরে অল্প পরিমাণে লবণ মাখিয়া, নেকড়ায় করিয়া, উত্তমরূপ পুঁছিয়া ফেলিবে। এখন একবার জলে ধুইয়া, জল ঝাড়িয়া বা পুঁছিয়া লইবে।

এ দিকে একখানি কড়া জ্বালে চড়াইবে। এবং তাহাতে মাখন কিংবা ঘৃত দিবে; জ্বালে উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে পাতালফোঁড় ঢালিয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে দুই একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিয়া, তাহাতে জৈয়িত্রীর গুঁড়, ছোট এলাচের গুঁড় এবং লবণ দিবে। জ্বালে উত্তমরূপ ভাজা ভাজা হইলে, উনান হইতে পাক-পাত্রটী নামাইয়া লইবে। অনন্তর উহা পরিবেষণ করিবে।

ফাঁপড়া

ফাঁপড়া এক-প্রকার বেগুণি-বিশেষ। ইহা খাইতে বেশ সুখাদ্য। কচি বেগুণ দ্বারা ফাঁপড়া প্রস্তুত করিতে হয়। মুগের দাইল ও বেগুণ-ই ফাঁপড়ার প্রধান উপকরণ। ভাত ও খিচুড়ির সহিত উহা খাইতে হয়।

প্রথমে কাঁচা মুগের দাইল জলে ভিজাইবে। উত্তমরূপ ভিজিলে, ভাসা জলে কচ্‌লাইয়া কচ্‌লাইয়া ধুইয়া, তাহার খোসা তুলিয়া ফেলিবে। জলে ধুইয়া, দাইলের খোসা তোলা হইলে, পরে তাহা শিলে বাটিবে। উহা চন্দনের মত খিচ্-শূন্য করিয়া না বাটিয়া, ছিব্‌ড়া ছিব্‌ড়া আকারে বাটিবে। এখন এই দাইল-বাটা ফেটাইবে। পরে তাহাতে সামান্য ময়দা (ময়ান মাখিয়া), আদা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, মৌরী-ছেঁচা এবং লবণ মাখিবে।

এদিকে জ্বালে ঘৃত কিংবা তৈল চড়াইবে; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, বেগুণের লম্বা লম্বা ফালি পূর্ব্ব-প্রস্তুত দাইলের গোলাতে ডুবাইয়া, উক্ত ঘৃত অথবা তৈলে ছাড়িবে। বেগুণের ফালিতে পূর্ব্বে পরিমাণ মত লবণ ও হরিদ্রা মাখিয়া রাখিবে। বেগুণের ফালি দুই পিটু উল্টাইয়া, লাল্‌চে ধরণে ভাজিয়া তুলিয়া লইবে। গরম গরম উহা উত্তম সুখাদ্য।

শফেদী কাঁকুড়-ভাজা।

শফেদার সহিত ভাজিতে হয় বলিয়া, ইহাকে শফেদী কাঁকুড় ভাজা কহে। শফেদী কাঁকুড়-ভাজা অন্ন, খিচুড়ি কিংবা লুচি ও রুটি প্রভৃতির সহিত আহার

করিতে পারা যায়। ইহা বেশ সুখাদ্য মুখ-রোচক খাদ্য। গরম গরম অবস্থায়, এই ভাজা খাইতে ভাল।

প্রথমে কাঁচা কাঁকুড়ের খোসা ও বিচি প্রভৃতি কুটিয়া পরিষ্কৃত করিবে। পরে এক আঙুল লম্বা অথচ মোটা করিয়া, কাঁকুড়ের ছোট ছোট ফালি কুটিয়া রাখিবে।

এদিকে একটী পাত্রে শফেদা ও বেসন জলে গুলিয়া, গোলা প্রস্তুত করিবে। গোলা খুব ঘন কিংবা নিতান্ত পাতলা করিবে না। গোলার পরিমাণ বুঝিয়া, তাহাতে লঙ্কা-বাটা ও লবণ মিশাইয়া ফেটাইবে।

এখন কড়াতে ঘৃত অথবা তৈল জ্বালে চড়াইবে; এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে এক একখানি কাঁকুড়ের ফালি পূর্ব্ব-প্রস্তুত গোলাতে ডুবাইয়া ছাড়িবে। এবং এক-পিঠ ভাজা হইলে, অপর-পিঠ উল্টাইয়া দিবে। এইরূপে দুই পিঠ ভাজা হইলে, তুলিয়া লইবে। আহারে বিলম্ব থাকিলে, ভাজাগুলি উনানের পাশে, অর্থাৎ আগুনের আঁচে রাখিবে। আগুনের আঁচে রাখিলে, উহা বেশ গরম থাকিবে।

খৈ-বড়া।

খৈ দ্বারা পাক করিতে হয় বলিয়া, ইহাকে খই-বড়া কহিয়া থাকে। খৈ অত্যন্ত লঘু-পাক। অনেক সময় উহা রোগীর পথ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খৈয়ের ওগরা, খৈয়ের মণ্ড অতি সুপথ্য। পূর্ব্ব-প্রকাশিত "পাক-প্রণালী" ও "মিষ্টান্ন-পাকে" খৈয়ের মুড়কি, ছাঁই, খৈচুর এবং খৈয়ের চাঁপা প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুতের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। সকল-জাতীয় ধানে ভাল খৈ হয় না; কনকচূর ধানে যে খৈ হয়, তাহা-ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

যে কোন খাদ্যে টাট্‌কা, দানাদার খৈ ব্যবহার করিবে। বাসী খৈ চিম্‌সে হইয়া থাকে। প্রথমে খৈয়ের ধান বাছিয়া লইবে। অনন্তর, তাহা জলে ভিজাইবে। এককালে অধিক জলে ভিজাইবে না। যখন দেখিবে, খৈ জলে ভিজিয়াছে, তখন তাহা চট্‌কাইবে। অনন্তর তাহাতে শফেদা, নারিকেল-বাটা, লঙ্কা-বাটা এবং লবণ মিশাইয়া মাখিবে; কাদার মত হইলে,

জানিবে, তাহা বড়া গড়াইবার উপযুক্ত হইয়াছে। এখন তাহাতে এক একটি বড়া গড়াইয়া, ঘৃত কিংবা তৈলে ভাজিয়া লইবে।

বিলাতি কুমড়ার ফুলুরি।

ফুলুরির পক্ষে পাকা মিষ্ট কুমড়া-ই প্রশস্ত। প্রথমে কুমড়ার খোলা, বিচি এবং আঁত ছাড়াইয়া লইবে। পরে তাহা জলে সিদ্ধ করিয়া রাখিবে।

হাত-সওয়া ঠাণ্ডা হইলে, সিদ্ধ কুমড়া বেশ করিয়া চট্‌কাইবে। এখন উহাতে ময়দা, শফেদা, লবণ এবং একটু মিষ্ট (চিনি বা গুড়) মিশাইবে। এখন মৌরী ও গোল-মরীচের গুঁড়া মিশাইয়া, উত্তমরূপে ফেটাইবে।

এখন কড়াতে তৈল চড়াইবে। ভাজার পক্ষে ভাসা তৈল বা ঘৃত হইলে যে, ভাল হয়, তাহা যেন মনে থাকে। জ্বালে তৈল পাকিয়া আসিলে, তাহাতে ফুলুরি ছাড়িতে আরম্ভ কর। এইরূপে এক এক খোলা ভাজা হইলে, ঝাঝরা হাতায় করিয়া তুলিয়া লইবে। গরম গরম এই ফুলুরি বেশ সুখাদ্য হইয়া থাকে।

পিয়াজের ব্রুণ।

পিয়াজের ব্রুণ বা ভাজা, পোলাও কিংবা মাংসাদি রাঁধিয়া, তাহার উপর ছড়াইয়া বা গুঁড় করিয়া দিলে, অত্যন্ত সুস্বাদু হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ঘি-ভাত এবং খিচুড়ি প্রভৃতির সহিত আহার করিতে পারা যায়। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রমতে পিয়াজের বিস্তর গুণ বর্ণিত আছে। রাজবল্লভের মতে পিয়াজ মধুর, বৃষ্য, কটু, স্নিগ্ধ, বায়ু-নাশক, বল-কর, পিত্তের অবিরোধী, কফ-নাশক ও তৃপ্তি-কর। * ডাক্তারী মতে-ও পিয়াজ অত্যন্ত উপকারী।

পিয়াজের ব্রুণ করিতে হইলে, প্রথমে উহার উপরের খোসা ছাড়াইয়া ফেলিবে। পরে লম্বা দিকে চিরিয়া দুইখানি করিবে। এখন এক একখানি

---

* পলাণ্ডুর্মধুরো বৃষ্যঃ কটুঃ স্নিগ্ধোঽনিলাপহঃ।
বল্যঃ পিত্তাবিরোধী চ কফনুত্তর্পণো গুরুঃ।—রাজবল্লভ।

খণ্ড লইয়া, লম্বাভাবে সরু সরু করিয়া কুটিবে। এইরূপ সরু সরু পিয়াজকে শ্লাইস্-কাটা কহে।

এ-দিকে জ্বালে ঘৃত চড়াইয়া, পাকাইয়া লইবে। পরে তাহাতে পিয়াজ-গুলি ফেলিয়া দিবে। এবং মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। যখন দেখিবে, পিয়াজ লাল্‌ছে ধরণে ভাজা হইয়াছে, তখন তাহা নামাইবে। এই ভাজা পিয়াজ বেশ মুচ্‌মুচে হইয়া থাকে। লিখিত নিয়মে ভাজা পিয়াজকে পিয়াজের ক্রুণ কহিয়া থাকে।

ওলকপির ঘণ্ট।

ওলকপি পাকিয়া উঠিলে, তাহা সুখাদ্য হয় না। যে কোন তরকারির কোমল অবস্থায় উত্তম ব্যঞ্জন হইয়া থাকে। প্রথমে কপির খোলা বাধাইয়া ছাড়াইবে। পরে তাহা ডুম ডুম করিয়া কুটিবে। এই ডুমগুলি এখন ছেঁচিয়া, নিংড়াইবে। কলাইশুঁটি ছাড়াইয়া, দানাগুলি বাছিয়া রাখিবে।

এ-দিকে পাকপাত্রে ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে আদার কুচি, লঙ্কা ও তেজপাত দিয়া নাড়িতে থাকিবে। আধ-ভাজা হইয়া আসিলে, তাহাতে কপি-ছেঁচা ও কলাইশুঁটি ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। একটু পরে-ই তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, ধনে-বাটা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। মসলা ভাজা ভাজা হইলে, জল ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। সিদ্ধ হইয়া আসিলে, তাহাতে লবণ ও লেবুর রস দিবে। রুচি-অনুসারে লেবুর রসের পরিবর্ত্তে সির্কা-ও দিতে পারা যায়। যখন দেখিবে ঘণ্ট বেশ থক্‌থকে হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহা নামাইবে, এবং ছোট এলাচের ও জায়ফলের গুঁড়ি ব্যঞ্জনের উপর ছড়াইয়া, এক-বার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। নিরামিষ আহারে এই ঘণ্ট উত্তম সুখাদ্য। সামিষ ঘণ্ট রাঁধিতে হইলে, তরকারির জল ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে ভাজা মাছ দিতে হয়। এই ঘণ্ট অন্ন কিংবা লুচি অথবা রুটি প্রভৃতির সহিত আহার করিতে পারা যায়।

কলাই-শুঁটির ঘণ্ট।

এই ঘণ্ট নিরামিষ ও সামিষ উভয় প্রকারে রাঁধা হইয়া থাকে। ভাল করিয়া রাঁধিতে পারিলে, উভয়বিধ ঘণ্ট-ই তৃপ্তি-জনক। এই ঘণ্ট অন্ন, লুচি, রুটি এবং পরোটার সহিত আহার করা যাইতে পারে।

অপক্ক অবস্থায় কলাইশুঁটি উত্তম সুখাদ্য। প্রথমে শুঁটির দানাগুলি ছাড়াইয়া, ধুইয়া রাখিবে। যে পরিমাণ দানা হইবে, সেই পরিমাণ আলু ছাড়াইয়া, কুচি কুচি করিয়া ধুইয়া রাখিবে।

এখন পাক-পাত্রে ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে কলাই-শুঁটি ও আলু ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। তরকারি বেশ কসা হইলে, তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, ধনে-বাটা, লঙ্কা-বাটা দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। অনেকে-ই এই সকল মসলা জলে গুলিয়া, ঢালিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা না করিয়া, মসলাগুলি একটু ভাজিয়া লইলে, কাঁচা গন্ধ থাকে না, আর বেশ সুগন্ধ হয়। মসলা যে চন্দনের মত করিয়া, অর্থাৎ খিচশূন্য করিয়া বাটিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। এজন্য কেহ কেহ মসলা জলে গুলিয়া, তাহা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া-ও থাকেন। মসলা-গোলা জলকে "ছাঁচনা" কহে। মসলা ভাজা হইলে, তরকারিতে জল দিয়া, হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া দিবে। জ্বালে উহা ফুটিতে থাকিলে, ঢাকনি খুলিয়া, উহাতে লবণ দিবে। অল্পক্ষণ পরে দুধ, চিনি ও জীরামরীচ-বাটা একসঙ্গে গুলিয়া, ঘণ্টে ঢালিয়া দিবে। জল মরিয়া ব্যঞ্জন বেশ থক্-থকে গোছের হইলে, তাহা উনান হইতে নামাইবে। আর সামিষ ঘণ্ট রাঁধিতে হইলে, উহাতে দুধ ও মিষ্ট দিবে না। যে সময় জীরামরীচ দিবে, সেই সময় মাছ-ভাজা দিয়া, ফুটাইয়া লইবে।

এখন সম্বরা দিবার জন্য হাঁড়ি জ্বালে চড়াইবে। এবং তাহাতে ঘৃত অথবা তৈল ঢালিয়া দিবে। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত দিয়া নাড়িতে থাকিবে। পরে জীরা ফোড়ন দিবে। উহা ফুটিয়া উঠিলে-ই ব্যঞ্জন ঢালিয়া দিয়া, সম্বরা দিবে। দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, ঘণ্টের উপর গরম-মসলার গুঁড় কিংবা বাটা দিয়া, এক-বার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিয়া, নামাইয়া রাখিবে।

বাঁধা-কপির ঘণ্ট।

ইহা-ও সামিষ ও নিরামিষ ভেদে দুই-প্রকার। ঘণ্টের তরকারি, অন্যান্য ব্যঞ্জনের আনাজ অপেক্ষা, ছোট ছোট করিয়া কুটিতে হয়। প্রথমে কপির দুই একটী পাকা পাতা ফেলিয়া দিবে। পরে তালের গায়ে যে কচি পাতা বাহির হইবে, তাহা ছোট ছোট আকাবে কুটিবে। কলাই-শুঁটি ছাড়াইয়া রাখিবে এবং আলুর খোসা ছাড়াইয়া, ছোট ছোট ডুম ডুম ধরণে কুটিয়া, প্রত্যেক তরকারী ধুইয়া পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখিবে।

এখন পাক-পাত্রে তৈল জ্বালে চড়াইবে। এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে আলু, কপি ও শুঁটি ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে, বেশ কসা হইয়াছে, তখন তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, ধনে-বাটা দিয়া নাড়িবে। মসলা ও তরকারি বেশ লপেট হইয়া, ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে পরিমিত জল ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। তরকারি ছাঁকা তৈলে কসা হইলে, অধিক জল দিতে হয় না। কিছুক্ষণ জ্বাল পাইলে, তরকারি ফুটিতে থাকিবে, তখন তাহাতে লবণ দিবে। আলু ও কপি সিদ্ধ হইলে, জীরামরীচ-বাটা, সামান্য চিনি বা বাতাসা এবং দুধ গুলিয়া, ব্যঞ্জনে দিবে। দুই একবার ফুটিয়া উঠিলে, উনান হইতে ব্যঞ্জন নামাইবে। কিন্তু মাছের সহিত ঘণ্ট রাঁধিতে হইলে, উহাতে দুধ ও চিনি না দিয়া, লবণ দেওয়ার সময়, ঘণ্টে ভাজা মাছ দিবে।

ইঁচড়ের ঘণ্ট।

কচি ইঁচড়ের ঘণ্ট-ই বেশ সুখাদ্য। ইঁচড় ছাড়াইবার সময় হাতে একটু তেল মাখিয়া কুটিলে, হাতে আটা জড়াইয়া ধরিবে না। ইঁচড় যে একটু বাধাইয়া ছাড়াইতে হয়, তাহা বোধ হয়, সকলে-ই জানেন। প্রথমে খুব সরু সরু করিয়া কুটিয়া জলে ফেলিবে। যদি ইঁচড়ের সহিত আলু দিতে ইচ্ছা কর, তাহা-ও খোসা ছাড়াইয়া, ছোট ছোট করিয়া কুটিয়া ধুইয়া রাখিবে।

এখন ইঁচড়গুলি জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ করিয়া, জল গালিয়া ফেলিবে। পরে হাঁড়িতে ঘৃত কিংবা তৈল চড়াইয়া, পাকাইয়া লইবে। উহাতে ইঁচড় ও আলু-

গুলি বেশ করিয়া কসিবে। কসা হইলে, পাত্রান্তরে নামাইয়া রাখিবে। অনন্তর পাক-পাত্রে ঘৃত চড়াইয়া, পাকাইয়া লইবে। পরে তাহাতে তেজপাত দিয়া নাড়িতে থাকিবে। অল্প ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, লঙ্কা-বাটা, আদা-বাটা, ধনে-বাটা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। একটু পরে তাহাতে দধি, কিস্‌মিস্ দিয়া নাড়িতে থাকিবে। এইগুলির বেশ রঙ্ হইলে, ইঁচড় ও আলু ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। খানিক ফুটিয়া উঠিলে, ঢাকনি খুলিয়া, ব্যঞ্জনে লবণ, চিনি দিয়া, এক-বার নাড়িয়া দিবে। জ্বালে জল মরিয়া, ঘণ্ট থক্-থকে হইয়া আসিলে, উহাতে ভাজা জীরা ও গরম-মসলার গুঁড় ছড়াইয়া দিয়া, এক-বার নাড়িয়া চাড়িয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া, নামাইয়া লইলে-ই ইঁচড়ের ঘণ্ট পাক হইল। এই ঘণ্ট ভাত কিংবা লুচি ও রুটি প্রভৃতির সহিত আহার করিতে পারা যায়।

পালম-গোড়ার চচ্চড়ি।

ইহা নিরামিষ কিংবা মাছ অথবা মাছের তেল-কাঁটার সহিত, যে কোন-প্রকারে রাঁধিবে, তাহা-ই বড় মুখ-প্রিয় হইবে। প্রথমে পালমের গোড়া-গুলি অল্প চাঁচিয়া, এক আঙুল লম্বা করিয়া কুটিবে। গোড়া মোটা হইলে, খানিক চিরিয়া দিবে। গোড়ার সহিত শাক ও শিষ-ও কুটিয়া লইবে। শাক কুটা হইলে, তাহা ভাসা জলে, ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিবে। এ-দিকে আলু ছাড়াইয়া, ছোট ছোট করিয়া কুটিবে। এবং শিমের দুই মুখ কাটিয়া, ধারের আঁশ তুলিয়া ফেলিবে। কলাইশুঁটি-ও ছাড়াইয়া রাখিবে।

এখন হাঁড়িতে তেল দিয়া, জ্বালে চড়াইবে। তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে বড়ি ভাজিয়া তুলিয়া রাখিবে। পরে তাহাতে শাক প্রভৃতি ধৌত আনাজগুলি ঢালিয়া দিয়া, মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া চাড়িয়া, হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া দিবে। জল মরিয়া, তরকারি কসা হইলে, তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, সরিষা-বাটা, লঙ্কা-বাটা জলে গুলিয়া ঢালিয়া দিবে। এই সময় পরিমাণ-মত লবণ দিয়া, এক-বার নাড়িয়া চাড়িয়া, হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া দিবে। যদি সামিষ রাঁধিতে ইচ্ছা কর, তবে ছাঁচনা দেওয়ার পর, দুই এক-বার ফুটিয়া আসিলে, তাহাতে ভাজা মাছ ও তেল-কাঁটা দিবে। তরকারি আধ-সিদ্ধ হইলে, ব্যঞ্জনে ভাজা বড়ি ঢালিয়া দিবে। যখন দেখিবে, তর-কারি বেশ সুসিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহা উনান হইতে নামাইবে। এখন একটি

পাত্র জ্বালে বসাইবে, এবং তাহাতে তৈল ঢালিয়া দিবে। উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত ও লঙ্কা ফেলিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে। ভাজা ভাজা হইলে, পাঁচফোড়ন ফেলিয়া দিয়া, চচ্চড়ি সম্বরা দিবে। একটু ফুটিয়া আসিলে, চচ্চড়ি নামাইয়া লইবে।

সজিনা-ডাঁটার চচ্চড়ি।

সজিনা ডাঁটার ছেঁচ্‌কি, চচ্চড়ি, নিমঝোল এবং আচার প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা পাকিয়া উঠিলে, এক-প্রকার অখাদ্য বলিলে-ই হয়। যতদিন পর্য্যন্ত ডাঁটাগুলি নরম থাকে, ততদিন খাইতে ভাল।

এক আঙুল লম্বা করিয়া ডাঁটা কুটিবে, এবং তাহার আঁশ তুলিয়া ফেলিবে। পরে আলুর খোসা ছাড়াইয়া কুটিবে। আর যদি চচ্চড়িতে থোড় ও ঝিঙ্গে প্রভৃতি তরকারি দিতে ইচ্ছা কর, তবে এই সঙ্গে সেগুলি-ও কুটিয়া ধুইয়া রাখিবে।

এখন পাক-পাত্রে তেল জ্বালে চড়াইয়া, পাকাইয়া লইবে। এই তেলে বড়ি ভাজিয়া, তুলিয়া রাখিবে। পরে অবশিষ্ট তেলে তরকারি দিয়া, কসিয়া লইবে। আনাজ কসা হইলে, হরিদ্রা-বাটা, লঙ্কা-বাটা এবং সরিষা-বাটা জলে গুলিয়া, তরকারির উপর ঢালিয়া দিবে। দুই এক-বার ফুটিয়া উঠিলে, পরিমাণ-মত লবণ দিবে। যখন দেখিবে, তরকারি প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন ভাজা বড়িগুলি উহাতে ঢালিয়া দিবে। সুসিদ্ধ হইলে, জ্বাল হইতে তরকারি নামাইবে।

এ-দিকে সম্বরা দেওয়ার জন্য পাক-পাত্র জ্বালে চড়াইয়া, তাহাতে তেল ঢালিয়া দিবে। এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে লঙ্কা দিয়া নাড়িতে চাড়িতে থাকিবে। ভাজা ভাজা হইলে, পাঁচফোড়ন সম্বরা দিয়া, তাহাতে তরকারি ঢালিয়া দিবে। দুই এক-বার ফুটিয়া উঠিলে, নাড়িয়া চাড়িয়া, চচ্চড়ি নামাইয়া লইবে।

যদি আমিষ চচ্চড়ি রাঁধিতে ইচ্ছা কর, তবে তরকারি ফুটিবার সময়, তাহাতে [illegible] অথবা মাছের তৈল-কাঁটা দিয়া, রাঁধিবে। নিরামিষ অপেক্ষা মাছের ডাঁটা-চচ্চড়ি সমধিক সুমিষ্ট হইয়া থাকে।

সজিনার ডাঁটা স্বাদু, কষায়, পিত্ত-নাশক, অত্যন্ত দীপন, আর শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস এবং গুল্ম-রোগের শান্তি-কারক। *

---

* শোভাঞ্জনফলং স্বাদু কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
শূলকুষ্ঠক্ষয়শ্বাসগুল্মহৃদ্দীপনং পরং॥

ঝালের মাছ।

কি চুনো, কি পোনা, সকল প্রকার মাছের-ই ঝাল হইতে পারে। ঝালের মাছ বড়-ই মুখ-প্রিয় ; এমন কি, ইহাতে অরুচি পর্য্যন্ত ভাল হইয়া থাকে।

যে কোন মাছ ঝালে রাঁধিবার পূর্ব্বে, তাহা কুটিয়া বাছিয়া, ধুইয়া লইবে। পরে তাহা তৈলে ভাজিয়া, তুলিয়া রাখিবে। এখন তাওয়া বা কড়া জ্বালে বসাইয়া, তাহাতে তৈল দিবে। এবং উহা পাকিয়া আসিলে, কাঁচা লঙ্কা ছেঁচিয়া সম্বরা দিয়া, নাড়িতে চাড়িতে থাকিবে। ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে হলুদ-জল ঢালিয়া দিবে। ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে ভাজা মাছ ও লবণ দিবে। যখন দেখিবে, জল প্রায় মরিয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে আদা-ছেঁচা ও তেল ঢালিয়া দিবে। শেষ অবস্থায় তেল দিলে, জল মরিয়া, সেই তেলের উপর মাছ চুড়-চুড় করিতে থাকিবে। এই সময় উনান হইতে পাক-পাত্র নামাইবে। এইরূপ পাকের ঝালের মাছ অত্যন্ত মুখ-রোচক হইয়া থাকে। যাঁহারা পিয়াজ খাইয়া থাকেন, তাঁহারা আদা-ছেঁচার সহিত দুই একটী পিয়াজ-ও ছেঁচিয়া দিতে পারেন। লঙ্কার পরিমাণ রুচি-অনুসারে ঠিক করিয়া লইতে হয়। ঝালের মাছের পক্ষে, খাঁটি সরিষাব তেল হইলে-ই, উহা অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু হইয়া থাকে।

আমলকী ভাতে।

ভাতে ভিন্ন, আমলকীর অতি উৎকৃষ্ট মোরব্বা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক-প্রকার ঔষধে আমলকী ব্যবহৃত হয়। বৈদ্য-শাস্ত্রে আমলকীর বিস্তর গুণ বর্ণিত আছে। ইহা কষায়, অম্ল, মধুর, *শীতল, লঘু, রসায়ন ; আর দাহ, পিত্ত, বমি, মেহ এবং শোষ-নাশক।

আমলকী অতি পবিত্র ফল ; অতএব উহা হাবষ্যান্নে ব্যবহার করিতে পারা যায়। ভাত রাঁধিবার সময় যখন চাউলে জল দিতে হয়, সেই সঙ্গে আমলকী-ও ভাতে দিতে হয়। ভাতে দেওয়ার পূর্ব্বে, ফল বেশ করিয়া ধুইয়া লওয়া আবশ্যক। আর চাউলের সঙ্গে না দিলে, উহা সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ভাতের ফেন ঝাড়া হইবার পর-ও, খানিকটা সময় উহা ভাতে রাখিলে ভাল হয়। পরে ভাত হইতে

---

* কষায়াম্লমধুরা শীতলা লঘুঃ দাহপিত্তবমিমেহ-শোষঘ্নী রসায়নী চ।—রাজনির্ঘণ্ট।

আমলকী বাহির করিয়া, লবণ, তৈল এবং কাঁচা লঙ্কা মাখিয়া লইলে-ই, খাদ্যের উপযুক্ত হইবে। হবিষ্যে ব্যবহার করিতে হইলে, তৈল ও লবণের পরিবর্ত্তে ঘৃত এবং সৈন্ধব লবণ দ্বারা মাখিতে হয়।

পটোলের বটকা।

পূরন্ত অথচ লম্বা আকারের পটোল দ্বারা উত্তম বটকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথমে পটোল লম্বাভাবে চিরিয়া, তাহার ভিতরের শাঁস ও বিচি বাহির করিয়া ফেলিবে। শাঁস ও বিচি বাহির হইলে, এক একটী পটোলের দুই-খানি করিয়া খোল প্রস্তুত হইবে।

এ-দিকে পটোলের পরিমাণ বুঝিয়া, ইঁচড় কুটিয়া, জল-সহ আগুনে সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে, নামাইয়া জল ঝরাইবে। পরে তাহা বাটিয়া বা চট্কাইয়া, মোলায়েম করিবে। এখন জ্বালে ঘৃত পাকাইয়া, তাহাতে ছোট-এলাচের দানা, আদা-ছেঁচা, এবং লঙ্কা ছাড়িয়া, আধ-ভাজা করিবে। পরে তাহাতে বাটা ইঁচড় ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে চাড়িতে থাকিবে। দুই চারি-বার নাড়া-চাড়ার পর, উহাতে পরিমাণ-মত লবণ, সামান্য লঙ্কা-বাটা দিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, নামাইবে। জীরা আগুনে গরম করিয়া, গুঁড় করিবে; এই গুঁড় ইঁচড়ে মাখিবে।

পূর্ব্বে যে পটোল ছাড়াইয়া রাখিয়াছ, এখন সেই পটোলগুলি ঘৃতে এক-বার কসিয়া নামাইবে। এই পটোলের এক এক-খানি লইয়া, তাহার ভিতর ইঁচড়ের পূর পূরিয়া, অপর এক-খানি পটোল তাহার উপর দিয়া, আস্ত পটোলের ন্যায় সাজাইয়া রাখিবে। এইরূপে সমুদয় পটোলগুলি প্রস্তুত করিবে।

এখন গোলা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ কর। অর্থাৎ যে পরিমাণ সফেদা, সেই পরিমাণ খাসা ময়দা * এক সঙ্গে মিশাইয়া, তাহাতে ময়ান দিবে। ময়ান দেওয়া হইলে, দই দিয়া, তাহার গোলা তৈয়ার করিবে। গোলা ফেটাইবার সময়, উহাতে একটু লবণ ও জায়ফলের গুঁড় মিশাইবে। আর প্রয়োজন হইলে, গোলাতে সামান্য জল-ও মিশাইয়া লইতে পার। অনন্তর এই গোলাতে এক একটী পটোল

* গুজি-ভাঙ্গা ময়দা, অর্থাৎ যাহাতে খাজা প্রস্তুত হয়, তাহাকে খাসা ময়দা বলে। এইরূপ ময়দা হইলে-ই ভাল হয়। অভাবে অন্য ময়দা-ও চলিতে পারে।

ডুবাইয়া, ঘৃতে বেগুনি ভাজার ন্যায় ভাজিয়া, তুলিয়া লইলে-ই বটকা পাক হইল। ইহা গরম গরম বেশ সুখাদ্য। ইচড়ের ন্যায় মোচা দ্বারা-ও, লিখিত নিয়মে পূর প্রস্তুত করিয়া, পটোলের বটকা পাক করা যাইতে পারে। নিরামিষ আহারে এই খাদ্য বেশ আদরের সামগ্রী। ভাত, খিচুড়ি প্রভৃতির সহিত পটোলের বটকা বেশ সুখাদ্য।

লাল আলুর বড়ি।

বেশ মোটা মোটা লাল আলুর খোসা ছাড়াইয়া, তাহা শিলে বাটিয়া, রৌদ্রে শুকাইবে। এ-দিকে আলুর পরিমাণ বুঝিয়া, কলাইয়ের কাঁচা দাইল, জলে ভিজাইবে। পরে তাহার খোসা তুলিয়া, ভাসা জলে ধুইয়া লইবে। এখন দাইলের সহিত পূর্ব্ব-দিনের শুষ্ক আলু-ছেঁচা উত্তমরূপ বাটিবে। পরে তাহা ফেটাইবে। ফেটান হইলে, তাহাতে লবণ মিশাইয়া, বড়ি দিবে। বড়ি শুষ্ক হইলে তুলিয়া রাখিবে, এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিবে। এই বড়ি অম্বলে ব্যবহার করিবে।

বিটপালমের বড়ি।

লাল আলুর ন্যার বিটপালমের খোসা ছাড়াইয়া, বড়ির দাইলের সহিত এক সঙ্গে বাটিবে। আলুর ন্যায় বিটপালম ছেঁচিয়া, পূর্ব্বদিন রৌদ্রে দিতে হইবে না। দাইল ও বিট বাটা হইলে, তাহা ফেটাইবে। অনন্তর উহাতে সামান্য লবণ মিশাইয়া, অন্যান্য বড়ির ন্যায় কোন পাত্রে তেল-হাত মাখিয়া, তাহাতে বড়ি দিবে। রৌদ্রে শুষ্ক হইলে, পাত্র হইতে বড়িগুলি তুলিয়া রাখিবে। এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিবে। এই বড়ির উত্তম অম্বল হইয়া থাকে।

কয়েদবেলের চাঁপাটি।

প্রথমে কয়েদবেল ভাঙ্গিয়া, তাহার শাঁস বাহির করিয়া রাখ। এ-দিকে কালজীরা, মেতি, মৌরী, লঙ্কা আগুনে গরম করিয়া, গুঁড়াইয়া রাখিবে। এখন কয়েদবেলের শাঁসের সহিত এই সকল গুঁড় মসলা, লবণ এবং খাঁটি সরিষার তেল এক সঙ্গে মিশাইয়া বাটিবে কিংবা চট্‌কাইবে। অনন্তর পাথরে তেল-হাত বুলা-

ইয়া, তাহাতে ঐ মসলাদি মাখা বেলের শাঁস, হয় বড়ার ন্যায়, নতুবা চেপ্টা করিয়া দিবে। এবং সমস্ত দিন রৌদ্রে শুকাইবে। উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে, পাত্র হইতে তুলিয়া, পাত্রান্তরে রাখিবে। বড়ির ন্যায় ইহা-ও মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিতে হয়। স্যাঁতা স্থানে বড়ি কিংবা আচার প্রভৃতি রাখিবে না। এই চাপাটির অম্বল রাঁধিলে, অতি উপাদেয় মুখ-রোচক চাট্‌নি হইবে। গৃহস্থ-গৃহে এই সকল দ্রব্য যত্ন করিয়া রাখিতে হয়। যাহা অতি সামান্য দ্রব্য বলিয়া, অনেক সময় অগ্রাহ্য করা যায়, যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিলে, তাহা দ্বারা কত-প্রকার প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইতে পারে।

আমড়ার টোপা।

যখন দেশী আমড়া পাকিয়া উঠে, সেই সময় এই টোপা প্রস্তুত করিয়া রাখিলে, অন্য সময় উহা খাদ্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রথমে খোসা-সহ পাকা আমড়া চট্‌কাইবে। চট্‌কাইলে, খোসা ও রস বাহির হইবে। এখন আঁটি-গুলি ফেলিয়া দিবে। পরে আমড়ার রসে লঙ্কার গুঁড় ও লবণ মাখিয়া, পাথরে তেল-হাত মাখিয়া, তাহাতে এক একটী বড়া দিতে থাকিবে। এইরূপে সমুদয় বড়া দেওয়া হইলে, তাহা রৌদ্রে শুকাইবে। উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে, পাত্রান্তরে তুলিয়া রাখিবে। এবং মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিবে। যে সময় আমড়া পাওয়া না যায়, সেই সময় উহা অম্বল রাঁধিয়া খাইলে, অসময়ে আমড়া খাওয়া যাইতে পারে। দেশী পাকা আমড়া বেশ সুখাদ্য। উহার গন্ধ অতি মনোরম। পাকা আমড়ায় অতি উপাদেয় মিষ্ট অম্বল প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে আমড়া বোদা, তাহা ব্যবহার না করা-ই ভাল। আমড়া কচি অবস্থায়-ও নানাপ্রকার চাট্‌নিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
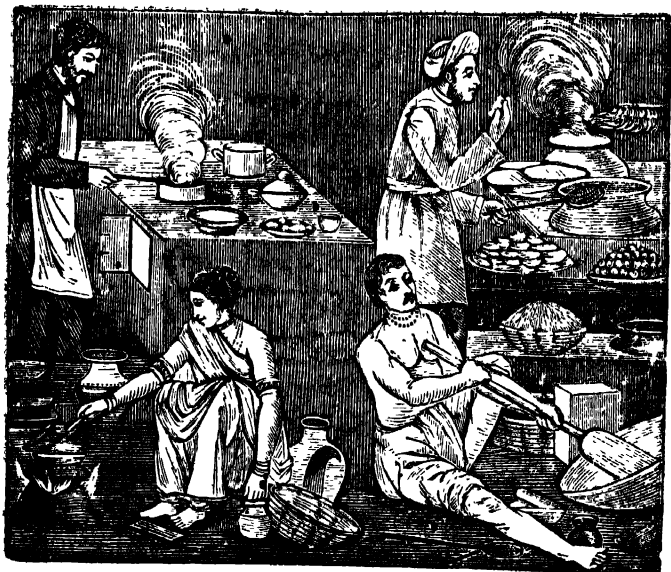
পাক-প্রণালী।

ক্ষুধা ও আহার।

ধা হইলে, আহারে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। আহার দ্বারা আবার শরীর রক্ষা পায়। আহার গ্রহণ ভিন্ন প্রাণি-দেহ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয় না। ফলতঃ, শরীর-বিধানে পোষণের প্রয়োজনানুভব-ই ক্ষুধা। কিন্তু এই ক্ষুধার অযথা ব্যবহারে পীড়া জন্মে। ক্ষুধা বোধ হইলে, কিছু-না-কিছু খাইতে-ই হইবে, না খাইলে, রোগ হইবে। আবার অতি-ভোজন-ও ভাল নয়, পাকস্থলী তাহা সহ্য করিতে পারে না বলিয়া, ভুক্ত

দ্রব্য জীর্ণ হয় না। শরীর ধারণে ক্ষুধা বড় প্রয়োজনীয়; কারণ ক্ষুধা না হইলে, কেহ আহার করে না, আহার না করিলে, শরীরের পুষ্টি-সাধন হয় না, বল-বৃদ্ধি জন্মে না। পৃথিবীতে যে বস্তু ক্ষয়-বৃদ্ধি-শীল তাহার-ই পোষণের প্রয়োজন, পোষণের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে-ই ক্ষুধার প্রয়োজন। এই ক্ষুধার অপব্যবহার-ই দূষণীয়। ক্ষুধার পরিমাণ বোধ না থাকিলে, অনেক সময় কষ্ট-ভোগ করিতে হয়। চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইয়া, অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়েন। রোগীর ক্ষুধা অনুসারে-ই তিনি পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অতএব রোগী যদি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে না পারে, তবে তাঁহাকে বিষম সমস্যায় পড়িতে হয়, রোগের-ও উপযুক্ত প্রতীকার হয় না, রোগী অনর্থক কষ্ট ভোগ করে। যকৃতের ক্রিয়া-বিকৃতিতে এক-প্রকার ক্ষুধার জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহাকে চলিত কথায় "দুষ্ট ক্ষুধা" বলে। উহা প্রকৃত ক্ষুধা নহে। এরূপ ক্ষুধায় পথ্য ব্যবস্থা চলে না, কিন্তু প্রকৃত ক্ষুধায় তাহা না করিলে চলিতে পারে না।

অতি-ভোজন-ই রোগের মূল বিবেচনা করিয়া, সেকালের চিকিৎসকেরা অনশন ব্যবস্থায় আপন কৃতিত্ব বোধ করিতেন। তাঁহারা অনেকে-ই রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পথ্যের ব্যবস্থা করাকে-ই চিকিৎসার উচ্চ অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। পীড়াকালে রোগী নানা-প্রকার খাদ্যের অভিলাষ করে। তাহা খাইতে নিষেধ করা-ই সে কালের চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল! তাঁহারা, মনে করিতেন, রোগীর যে দ্রব্য ভক্ষণে সমধিক স্পৃহা, সে তাহা-ই অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া, পীড়িত হইয়া থাকে, অতএব তাহা নিষিদ্ধ। কিন্তু বুঝিতে হইবে, সুস্থাবস্থায় আমাদের যাহা খাইতে ইচ্ছা হয়, তাহা প্রায় শারীর বিধানের অভাব জন্য-ই হইয়া থাকে। শারীব বিধানে যে দ্রব্যের অভাব হয়, তাহা-ই খাইবার ইচ্ছা হয়। পীড়া-কালে-ও যে, তাহা একবারে হইতে পারে না, এ কথা নির্ব্বন্ধ সহকারে বলা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে যদি তাহা-ই হয়, তবে রোগী আগ্রহের সহিত কোন দ্রব্য খাইতে চাহিলে, চিকিৎসকের তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। ইহা একবারে উপেক্ষা না করিয়া, বিশেষ চিন্তা করিলে, রোগীর শারীর বিধানের অভাবের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়, রোগীর আকাঙ্ক্ষা-ও কিয়ৎ পরিমাণে মিটাইতে পারা যায়। যে দ্রব্য আহারে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা যদি সে অবস্থায় রোগীর পক্ষে দুষ্পাচ্য বোধ হয়, তবে তদনুরূপ স্বাদ-বিশিষ্ট

লঘু-পাক দ্রব্য তিনি বাছিয়া দিতে পারেন। রোগীর আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি কি রোগ প্রতিকারের একটি অনুকূল কাজ নহে? আর যদি আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য রোগী একবারে-ই খাইতে না পায়, তাহা হইলে, তাহার ক্ষুধার অপব্যবহার-জনিত দোষ ঘটিতে পারে না কি? এইজন্য ক্ষুধার অপব্যবহার কোনমতে, কোন অবস্থাতে-ই ভাল নহে। *

আমাদের দেহ নিয়ত-ই ক্ষয় হইতেছে, সেই ক্ষয় বা ক্ষতি-পূরণের ইচ্ছাকে ক্ষুধা বলিতে পারা যায়। ক্ষুধা পাইলে-ই যেমন আহারের প্রয়োজন, সেই আহার আবার শরীরের হিতাহিত বিবেচনা করিয়া নির্ব্বাচন করিতে হয়। মানুষ যা তা খাইয়া কখন-ই জীবন-ধারণ বা স্বাস্থ্য-লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এজন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া-ই আহারের ব্যবস্থা করিতে হয়।

ক্ষুধা পাইলে-ই আহার করিতে হয়, ইহা প্রকৃতি-সিদ্ধ। কিন্তু কিরূপ দ্রব্য আহার করিলে, আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। আমাদের খাদ্য-সমূহ সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম দেহ-পোষক; দ্বিতীয় আগ্নেয় বা উষ্ণতা-সাধক; তৃতীয় লবণ-সমূহ; চতুর্থ জল। এই চারি শ্রেণীর খাদ্য-সমূহ উপযুক্ত পরিমাণে আহার করা প্রয়োজন। কেহ যদি ঐ সকল মিশ্র খাদ্য-দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল-মাত্র একটী দ্রব্য আহার করেন; তবে অচিরে তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়া, মৃত্যু-মুখে পতিত হইবার কথা। এজন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া আহারের ব্যবস্থা করিতে হয়।

শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ক্ষুধানুসারে পরিমিত আহার করিতে-ই উপদেশ দিয়া থাকেন। পরিমিত আহার দ্বারা শরীর-যন্ত্র যেমন সুচারুরূপ পরিচালিত হইয়া থাকে, অপরিমিত আহার করিলে, সেইরূপ স্বাস্থ্য-ভঙ্গ এবং নানা-প্রকার রোগ উপস্থিত হইয়া, দেহ নাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ, ক্ষুধা, পরিপাক-শক্তি এবং খাদ্য-দ্রব্যের পুষ্টিকারিতা বুঝিয়া, আহারের ব্যবস্থা করা-ই দেহ-রক্ষার একমাত্র নিদান।

---

* স্বাস্থ্য।

মিঠে কমলা পোলাও।

রামিষ আহারে কমলা পোলাও অতি উপাদেয়। সকল জাতীয় বা সকল স্থানের কমলা লেবু তত সুখাদ্য নহে। আজ কাল শ্রীহট্ট বা সিলেট, দার্জিলিং এবং নাগপুর হইতে কমলা লেবু আমদানি হইতেছে। নাগপুরের কমলার খোসা পুরু, আর তাহা তেমন রসাল নহে; দার্জিলিঙ্গের লেবুর যদি-ও আকার ছোট, কিন্তু উহা অত্যন্ত সুমিষ্ট। সিলেটের কমলা অম্ল-মধুর আস্বাদ জন্য উহা সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য ও মুখ-রোচক।

প্রথমে লেবুর খোসা ছাড়াইবে। পরে প্রত্যেক কোয়ার গায়ে যে সূতার ন্যায় আঁশ থাকে, তাহা ছাড়াইয়া ফেলিবে। এখন কোয়ার মুখ চিরিয়া, ভিতর হইতে বিচিগুলি ফেলিয়া দিবে। অনন্তর, কোয়ার পরিমাণ বুঝিয়া, চিনি ও জল সমান ভাগে মিশাইয়া, জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহা ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে লেবুর কোয়াগুলি ঢালিয়া দিবে। অল্পক্ষণ জ্বাল পাইলে, জ্বাল হইতে পাত্রটী নামাইবে। এইরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিলে, কোয়া হইতে রস বাহির হইয়া, রস পাতলা হইয়া আসিবে। তখন তাহা পুনর্ব্বার আগুনে বসাইবে। এই সময় রসে জাফরাণ বাটিয়া বা গুলিয়া দিবে। জ্বালে রস ঘন হইয়া আসিলে, নামাইয়া রাখিবে।

এদিকে, ডেক্‌চিতে ঘৃত ঢালিয়া, জ্বালে চড়াইবে। ঘৃত পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত, লবঙ্গ, ছোট এলাচের দানা এবং দারচিনি দিয়া নাড়িতে থাকিবে। মসলাগুলি ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে পোলাওয়ের চাউল ঢালিয়া নাড়িতে থাকিবে। এই সময় ছাড়ান বাদাম, পেস্তা ও কিসমিস্ চাউলে ঢালিয়া

দিয়া ভাজিবে। পরে তাহাতে জল ঢালিয়া দিবে। ফুটিয়া উঠিলে জাফরাণ দুধে গুলিয়া উহাতে দিবে।

ভাত এক ফুট শক্ত থাকিতে থাকিতে, উনান হইতে ডেকৃচি নামাইবে। এখন ভাতের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া, তাহাতে রস-সহ লেবু ঢালিয়া দিবে। পরে, তাহার উপর ভাত চাপা দিয়া ঢাকিয়া দিবে। অনন্তর, হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া দমে বসাইবে। দমে থাকিলে, ভাত বেশ সুসিদ্ধ হইয়া আসিবে। তখন তাহা খাদ্যের উপযুক্ত হইবে।

নানা-প্রকার নিয়মে কমলা লেবুর পোলাও পাক হইয়া থাকে, তন্মধ্যে লিখিত নিয়মটী অতি সহজ এবং সামান্য ব্যয়-সাধ্য। এই পবিত্র পোলাওয়ে হিন্দুর অব্যবহার্য্য কোন দ্রব্য-ই ব্যবহৃত হয় না।

গোলাপী জর্দ্দা।

ইহা এক প্রকার মিঠে পোলাও-বিশেষ। ভাল করিয়া পাক করিলে, এই পোলাও তিন চারি দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়।

যে সকল চাউলে পোলাও পাক হইয়া থাকে, সেই সকল চাউলে যদি-ও জর্দ্দা পাক করা যায়; কিন্তু 'মুচিরাম' নামক চাউলে রন্ধন করিলে, তাহা অতি উপাদেয় হইয়া থাকে। চাউলগুলি ঝাড়িয়া, হাত-বাছাই করিয়া লইলে-ই ভাল হয়। অনন্তর, তাহা ভাসা জলে কচলাইয়া ধুইয়া লইবে।

এদিকে, চাউল সিদ্ধ হইবার উপযোগী জল উনানে চড়াইবে। জ্বালে জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে, তাহাতে ধৌত চাউলগুলি ঢালিয়া দিবে। চাউল বার-আনা পরিমাণ সিদ্ধ হইলে, একখানি কাপড়ে তাহা চালিয়া দিয়া, ফেন গালিয়া ফেলিবে। ফেন গালা হইলে, ঐ ভাতে লেবুর রস ও ফট্‌কিরি-জল দিয়া ধুইয়া ফেলিবে। এরূপ নিয়মে ধৌত করিবার কারণ এই যে, ভাত-গুলি পরিষ্কৃত হইবে, এমন কি এক একটি ভাত যেন কাচের কুচির ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতে থাকিবে। ভাতগুলি এইরূপে পরিষ্কৃত করিয়া রাখিবে।

এ-দিকে ঘৃত ছোট এলাচ, দারচিনি এবং জয়িত্রী দ্বারা দাগ করিয়া, ছাঁকিয়া লইবে। এই সময় চিনির রস প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। এখন, ভাতগুলি একটী

ডেক্‌চিতে ঢালিয়া দিয়া, তাহার উপর দাগ-কবা গরম ঘৃত ঢালিয়া দিবে। পরে পাক-পাত্রটি দমে বসাইয়া, তাহাতে চিনির রস, বাদাম, পেস্তা এবং কিস্‌মিস্‌ ঢালিয়া দিয়া, পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। এইরূপ অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ দমে থাকিলে, সমুদয় রস মরিয়া, ভাত বেশ ঝর্‌-ঝরে, অথচ সুসিদ্ধ হইয়া আসিবে। তখন তাহা দম হইতে নামাইবে। অনন্তর গোলাপ জল ও কেওয়াড়া এক সঙ্গে মিশাইয়া, তাহাতে জাফরাণ এবং মৃগনাভি গুলিয়া, ঐ অন্নে ছড়াইয়া দিবে। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, গোলাপী জর্দ্দা পাক হইল। পরিবেষণের সময় এক ধার হইতে পোলাও কাটিয়া লইবে।

হিন্দুস্থানী খিচুড়ি।

হিন্দুস্থানবাসীরা সচরাচর যে নিয়মে খিচুড়ি রাঁধিয়া থাকে, তাহাকে হিন্দুস্থানী খিচুড়ি কহে। এই খিচুড়ি রাঁধিবার পূর্ব্বে প্রথমে চা'ল ও ডা'ল পৃথক্‌ পৃথক্‌ পাত্রে হাত-বাছাই করিয়া লইবে। যত চা'ল, সেই পরিমাণে ডা'ল লইবে।

একটী হাঁড়িতে জল জ্বালে বসাইবে। উহা গরম হইয়া আসিলে, তাহাতে ডা'ল ঢালিয়া দিবে। যখন দেখিবে, জল উথলিয়া উঠিতেছে, তখন তাহাতে হরিদ্রা-বাটা দিবে। এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ জ্বালে থাকিলে, ডা'ল সিদ্ধ হইয়া আসিবে। পরে তাহাতে চা'ল ঢালিয়া দিবে। যখন দেখিবে, চা'ল বেশ সিদ্ধ হইয়াছে, তখন পরিমাণ-মত লবণ খিচুড়িতে দিবে। লবণ দেওয়ার পর অল্পক্ষণ ফুটিলে, উনান হইতে পাক-পাত্রটী নামাইবে।

এদিকে, সম্বরা দেওয়ার জন্য আর একটী পাত্র জ্বালে বসাইবে, এবং তাহাতে ঘৃত ঢালিয়া দিবে। যখন দেখিবে, উহা পাকিয়া আসিয়াছে, তখন জীরা ফোড়ন দিবে। জীরার চুড়-চুড় শব্দ হইতে থাকিলে, তাহাতে হিং ফেলিয়া দিবে। হিং ডেলা করিয়া দিবে। একটু পরে ঘৃতে লঙ্কা ফোড়ন দিবে। অনন্তর তাহাতে খিচুড়ি সম্বরা দিবে। সম্বরা দিয়া-ই একবার ভাল করিয়া, খিচুড়ি নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। অল্পক্ষণ পরে জ্বাল হইতে উহা নামাইয়া লইবে।

মুগের ওগরা খিচুড়ি।

যে পরিমাণ চাউল, তাহার অর্দ্ধেক দাইল দ্বারা এই খিচুড়ি পাক করিতে হয়। রোগীর জন্য ওগরা রাঁধিতে হইলে, তাহাতে ঘৃত ও গরম মসলা ব্যবহার করিলে, উহা গুরু-পাক হইয়া উঠে, এজন্য তাহা ব্যবহার না করা-ই ভাল।

প্রথমে চা'ল ও ডা'ল ঝাড়িয়া বাছিয়া, ধুইয়া লইবে। এদিকে হাঁড়িতে জল দিয়া, জ্বালে বসাইবে। উহা ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে চা'ল-ডা'ল ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। জ্বালে ফুটিয়া উঠিলে, ঢাকনি খুলিয়া, হরিদ্রা-বাটা, আস্ত লবঙ্গ, ছোট এলাচের দানা, দারচিনির কুচি, লঙ্কা এবং তেজপাত ফেলিয়া দিবে। যখন দেখিবে, বেশ সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহাতে আদা-বাটা ও পরিমিত লবণ দিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। এই সময় হইতে আগুনের আঁচ কমাইয়া দিবে। অনন্তর, ঘৃতে জীরা ফোড়ন দিয়া সম্বরা দিলে-ই ওগরা খিচুড়ি পাক হইল।

রোগীর জন্য প্রস্তত করিতে হইলে, কেবল-মাত্র হরিদ্রা ও লবণ দিবে। এবং খিচুড়ি সুসিদ্ধ হইলে, সামান্যমাত্র ঘৃতে একখানি তেজপাত ফোড়ন দিয়া, সম্বরা দিলে-ই হইল।

গোলাপী ফির্ণি।

ফির্ণি এক-প্রকার পায়স বলিলে-ই হয়। উহা বেশ সুখাদ্য কামিনি-ধানের আতপ চাউল দ্বারা ফির্ণি পাক করিলে, তাহা অতি উপাদেয় হইয়া থাকে। অন্যান্য চাউলে পাক করিলে, কামিনি-চাউলের ন্যায় গন্ধ-বিশিষ্ট হয় না।

প্রথমে চাউলগুলি ঝাড়িয়া বাছিয়া, ভাসা জলে উত্তমরূপে ধুইবে। পরে তাহা ভাত রাঁধিবার নিয়মে পাক করিতে থাকিবে। হাঁড়িতে চাউল দিয়া, চাউলের পরিমাণ বুঝিয়া, সামান্য দারচিনি তাহাতে দিবে। এক পোয়া চাউল হইলে, দেড় সের জলে অন্ন পাক করিবে। ভাত ফুটিতে আরম্ভ করিলে, হাঁড়ির ঢাকনি খুলিয়া, তাহাতে ক্রমে ক্রমে দেড় সের গরম দুগ্ধ খাওয়াইতে থাকিবে। এই সময় হইতে হাঁড়ির ভাত সর্ব্বদা নাড়িয়া দিবে; সর্ব্বদা নাড়িবার

কারণ এই যে, ভাত ভাঙ্গিয়া যাইবে। দুধ দেওয়ার সময় আধ পোয়া সাগু হাঁড়িতে ঢালিয়া দিবে। ভাত সিদ্ধ হইবার সময় হইতে উনানের আঁচ কমাইয়া দিবে। কারণ, এই সময় অধিক আঁচ দিলে, আর ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া না দিলে, উহা ধরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। অনন্তর পরিমাণ-মত, মিছরি কিংবা ভাল চিনি ফির্ণিতে দিবে। বাদাম ও পেস্তা বাটা দিতে ইচ্ছা করিলে, এই সময় তাহা ফির্ণিতে দিয়া, ভাল করিয়া নাড়িয়া দিবে। যখন বুঝিবে, ফির্ণি বেশ লপেট গোছের অর্থাৎ ক্ষীরের ন্যায় হইয়াছে, তখন তাহা উনান হইতে নামাইবে। ফির্ণি ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে, তাহাতে ছোট এলাচের গুঁড় ছড়াইয়া দিবে এবং গোলাপ ছিটাইয়া দিবে। এই ফির্ণি কোন কোন পোলাওয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অন্ন-গোলক।

প্রথমে আতপ চাউলের অন্ন পাক করিবে। অনন্তর, তাহা বাটিয়া কাদার মত করিয়া লইবে। এখন তাহাতে খোয়া ক্ষীর, জাফরাণ-বাটা বা গোলা (দুধে), লঙ্কা-বাটা, গরম মসলার গুঁড়, জায়ফলের গুঁড়, এবং লবণ মাখিয়া চট্‌কাইবে। এখন তাহাতে এক একটি গোলক (অর্থাৎ আকারে আমড়ার মত) গড়াইবে। একটি পাত্রে ময়দা ছড়াইয়া, তাহার উপর গোলকগুলি রাখিবে। এইরূপে সমুদয়গুলি গড়াইয়া, ময়দা মাখাইয়া, ঝাড়িয়া লইবে। ময়দা মাখাইলে, কাহার-ও গায়ে কেহ লাগিয়া যাইবে না।

এদিকে গোলকের পরিমাণ বুঝিয়া, দধিতে লবণ, আদা-বাটা এবং লঙ্কা-বাটা গুলিয়া, উত্তমরূপ ফেটাইবে। এই সময় পাক-পাত্রে ঘৃত জ্বালে চড়াইবে। অনন্তর এক একটি গোলক দয়ের গোলাতে ডুবাইয়া তুলিয়া, তাহা সুজি কিংবা আরারুট মাখাইয়া, ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। মৃদু আঁচে ভাজিবে, যেন পুড়িয়া না যায়। দুই পিঠ বেশ ভাজা হইলে, তাহা পরিবেষণ করিবে। ইহা গরম গরম উত্তম সুখাদ্য।

দাইল-বেগুন ভর্ত্তা।

পাকা বেগুন এক-প্রকার অখাদ্য বলিলে-ই হয়। তবে তাহা নিম-পাতার সহিত ভাজিলে এক-রকম খাওয়া যাইতে পারে। পোকা-ধরা বেগুন পরিত্যাগ করিবে। বেগুন পুড়াইবার পক্ষে কাঠ-কয়লা অথবা ঘুঁটের আগুন-ই প্রশস্ত। বেগুন অধিক পুড়িলে, তাহার অম্ল আস্বাদ হইয়া থাকে। এজন্য মৃদু আঁচে সতর্কতার সহিত উহা পুড়াইতে হয়। বেগুন পুড়াইয়া, তাহার উপরিভাগের কাল খোসা ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিবে। এইরূপ নিয়মে বেগুন পুড়াইয়া পরিষ্কৃত করিয়া রাখিবে।

এদিকে ছোলা বা মটর দাইল সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে, তাহা চট্‌কাইবে। পরে বেগুণের সহিত মাখিয়া লইবে। দাইল ও বেগুন মাখা হইলে, তাহাতে পরিমাণ-মত লবণ, লেবুর রস, কাঁচা লঙ্কার কুচি এবং আদা-বাটা মাখিয়া লইবে। অনন্তর, ঘৃত জ্বালে পাকাইয়া, তাহাতে তেজপাত ফোড়ন দিবে। ফোড়ন দেওয়ার পর, দাইল-বেগুন তাহাতে ঢালিয়া দিয়া, দুই একবার নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইয়া লইবে।

বৈদ্য-শাস্ত্রমতে পোড়া বেগুন সামান্য পিত্তকারী, লঘু-পাক, সারক আর কফ, মেদ এবং বাত-বিনাশক। *

ভাবপ্রকাশ-মতে তৈল ও লবণ-মিশ্রিত দগ্ধ বেগুন গুরু ও স্নিগ্ধ। †

সাদা বেগুন, অর্থাৎ মুরগীর ডিমের ন্যায় যে সাদা বেগুন, তাহা অন্যান্য বেগুণের ন্যায় হীন গুণ-বিশিষ্ট এবং অর্শ পীড়ায় উপকারী। ‡

---

* অঙ্গারপক্কা বার্ত্তাকী কিঞ্চিৎ পিত্তকরী মতা।
কফমেদোঽনিলহরা সরা লঘুর্ভবা পথ্যা॥ (রাজবল্লভ)

† তদেব হি গুরু স্নিগ্ধং সতৈলং লবণান্বিতং॥ (ভাবপ্রকাশ)

‡ অপরং শ্বেতবৃন্তাকং কুক্কুটাণ্ডসমং ভবেৎ।
তদর্শঃসু বিশেষেণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ব্বতঃ॥

পেঁপে ঘণ্ট।

নিরামিষ আহারে পেঁপের ঘণ্ট উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন। প্রথমে কাঁচা পেঁপের খোসা ছাড়াইবে। পরে তাহা চিরিয়া, বিচি প্রভৃতি ফেলিয়া দিবে। এখন ছোট ছোট করিয়া তরকারি কুটিয়া, জলে ফেলিবে। পেঁপের ন্যায় আলু-ও কুটাইয়া রাখিবে।

প্রথমে পেঁপেগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহার জল গালিয়া ফেলিবে। এখন পাক-পাত্রে ঘৃত বা তৈল চড়াইয়া, তাহাতে পেঁপে ও আলুগুলি কসিতে থাক। কসা হইলে, তাহাতে লবণ ও হরিদ্রা এবং জীরামরীচ বাটা দিয়া নাড়িতে থাক। মসলা ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে পরিমাণ-মত জল ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখ। যখন দেখিবে, জ্বালে উহা সিদ্ধ হইয়া, থক্‌-থকে গোছের হইয়াছে, তখন তাহা উনান হইতে নামাইয়া রাখ।

অনন্তর, একটী পাত্রে ঘৃত জ্বালে চড়াও, এবং তাহাতে তেজপাত ও জীরা ফোড়ন দিয়া, পূর্ব্ব-রক্ষিত ব্যঞ্জন ঢালিয়া দাও। দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, সামান্য ময়দা ও চিনি দুধে গুলিয়া, উহাতে ঢালিয়া দিয়া, এক ফুট ফুটাইয়া নামাইয়া লও।

কুমড়ার ঘণ্ট।

বিলাতি কুমড়ার খোসা ছাড়াইয়া, কুচি কুচি করিয়া কুটিয়া ধুইয়া রাখিবে। এই ঘণ্ট ছোলা ভিজা দিয়া রাঁধিলে, অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু হইয়া থাকে। অতএব ঘণ্টের উপযুক্ত ছোলা ভিজাইয়া রাখিবে।

প্রথমে তৈল-সহ পাক-পাত্র জ্বালে বসাইবে, এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে লঙ্কা ফোড়ন দিবে; উহা ভাজা ভাজা হইলে, সরিষা ফেলিয়া দিবে। সরিষাগুলি ফুটিয়া উঠিলে, তাহাতে কুমড়া ঢালিয়া, নাড়িতে থাকিবে। অল্প ভাজা ভাজা হইলে, লবণ দিবে। লবণ দিলে, কুমড়া হইতে জল বাহির হইবে; এই সময় হরিদ্রা ও লঙ্কা-বাটা দিবে। কুমড়াতে জলের পরিমাণ যত কম দেওয়া হয়, তত-ই ভাল। কারণ, জলের পরিমাণ অধিক হইলে, উহার পান্‌সে আস্বাদ হইয়া থাকে। এজন্য সামান্য জল দিবে। তেলের পরিমাণ একটু

অধিক দিলে, তাহাতে-ই প্রায় নরম হইয়া আসিবে। যখন দেখিবে, কুমড়া গলিয়া, বেশ থক্-থকে হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহা উনান হইতে নামাইবে এবং ঘণ্টের উপর নারিকেল-কোরা ছড়াইয়া দিবে। পাচক ও পাচিকাগণ ঘৃত কিংবা তৈল দ্বারা এই ঘণ্ট রাঁধিতে পারেন।

বেতো-শাকের বেসনা।

বৈদ্য-শাস্ত্রে বেতোশাকের বিস্তর গুণ লিখিত আছে। উহা লঘু, ক্রিমি-হারক, মেধা আর বল-বৃদ্ধি-কারক এবং ক্ষার-বিশিষ্ট; সর্ব্ব-দোষ অর্থাৎ বাত-পিত্ত-কফ-দোষ-নাশক, রুচি-কর ও সারক। *

প্রথমে বেশন জলে গুলিয়া উত্তমরূপে ফেটাইবে। এই সময় গোলাব পরিমাণ বুঝিয়া লবণ মিশাইবে। শাকের মাথার দিকের ঝাড়, লম্বা আকারে কাটিয়া, ধুইয়া লইবে।

এ-দিকে কড়াতে তৈল জ্বালে চড়াইয়া, পাকাইয়া লইবে। অনন্তর গোলাতে শাক ডুবাইয়া, তাহা তেলে ভাজিয়া লইবে। ইহা গরম গরম বেশ সুখাদ্য।

আলুর কাবাব।

আলু যে অত্যন্ত পুষ্টি-কর, এ কথা সকল দেশের চিকিৎসকমাত্রে-ই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা যেমন দেহের উপকারী, সেইরূপ আবার সুখাদ্য। তবে যাহাদের মন্দাগ্নি অর্থাৎ হজম-শক্তি ভাল নহে, তাহাদের পক্ষে আলু সুপথ্য নহে। আলু-ভাতে বা সিদ্ধ অপেক্ষা কাবাব অতি সুখাদ্য।

বড় আলু বেশ করিয়া ধুইবে। আলুর গায়ের জল শুকাইয়া আসিলে, তখন তাহার উপর ছিদ্র করিবে। মোটা সূঁচ দ্বারা ছিদ্র করিলে হইবে। এখন ঘৃত, গোলমরীচের গুঁড় এবং লবণ আলুর গায়ে মাখাইবে এবং ছিদ্র দ্বারা যে পরিমাণ পারিবে, ভিতরে ও প্রবেশ করাইবে। পরে সেই আলুটী লোহার লম্বা শলায় বিঁধিয়া, আগুনের উপর ঘুরাইতে থাকিবে। আর মধ্যে

---

* লঘুর্বিপাকে ক্রিমিহা মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনঃ।
সক্ষারঃ সর্ব্বদোষঘ্নো বাস্তুকো রোচনঃ সরঃ।— (রাজবল্লভ)

মধ্যে ঘৃতাদি মাথাইবে। এইরূপ কিছুক্ষণ আগুনে ধরিলে, উহা বেশ সিদ্ধ হইয়া আসিবে। তখন তাহা শলা হইতে খুলিয়া লইয়া আহার করিবে। কেহ কেহ আবার আলু শলায় বিদ্ধ না করিয়া, পাঁউরুটি সেঁকিবার গিরিলদানির উপর আলু রাখিয়া, কাবাব পাক করিয়া থাকেন। রুচি-অনুসারে কাবাব-পাকের সময় উহাতে আদা ও পিয়াজের রস-ও মাথাইয়া থাকেন।

আলুর বড়া।

নিরামিষ আহারে ইহা বেশ সুখাদ্য। প্রথমে আলুর খোসা ছাড়াইবে। পরে তাহা ধুইয়া, জলে সিদ্ধ করিবে। বেশ সুসিদ্ধ হইলে, উনান হইতে নামাইয়া, জল গালিয়া ফেলিবে। পরে হাত-সওয়া ঠাণ্ডা হইলে, তাহা খিচ-শূন্য করিয়া বাটিবে। এখন তাহা সামান্য জলে গুলিবে। আলু গোলা হইলে, তাহাতে লঙ্কা-বাটা, লবণ এবং সফেদা মিশাইয়া, খুব ফেটাইবে। যদি ইচ্ছা কর, তবে উহাতে তিল কিংবা পোস্তদানা মিশাইতে পার।

এ-দিকে কড়াতে ঘৃত কিংবা তৈল জ্বালে চড়াইবে; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, উহার উপর পূর্ব্ব-প্রস্তুত গোলা লইয়া, ফুলরি বা বড়া ছাড়িতে থাকিবে। বড়াগুলি বেশ খড়-খড়ে গোছের ভাজা হইলে, তুলিয়া লইবে। গরম গরম খাইতে ভাল লাগিবে। যাঁহারা পিয়াজ খাইয়া থাকেন, তাঁহারা পিয়াজ-বাটা বা ছেঁচা অথবা আদা-বাটা গোলার সঙ্গে মিশাইয়া, ভাজিতে পারেন। উহা মিশাইলে, বড়া অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু হইয়া থাকে।

মধুরাম্ল মাহী কাবাব।

রুই, মৃগেল কিংবা কাতলা প্রভৃতি পাকা মাছের কাবাব অতি উৎকৃষ্ট। যে মাছ ছোট এবং কাঁটা-যুক্ত, সেরূপ মাছ কাবাব রন্ধনের উপযুক্ত নহে। প্রথমে মাছের আঁইস প্রভৃতি পরিষ্কৃত করিয়া কুটিবে। কাবাবের মাছ ছোট ছোট আকারে না কুটিয়া, গাদার মাছ ত্যাগ করিয়া, পেটি প্রভৃতি কোমল অংশ বড় অথচ লম্বা আকারে কুটিবে। এখন মৎস্যখণ্ডগুলি জলে সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে, জল গালিয়া ফেলিবে। পরে তাহা ঠাণ্ডা হইলে, মাছের কাঁটা

এখন এই মৎস্যে বেসন, ডিমের কুসুম, মৌরী-বাটা, ধনে-বাটা, লঙ্কা-বাটা, পাঁ-বাটা, গরম মসলার গুঁড়, পিয়াজ-বাটা (ইচ্ছা হইলে ত্যাগ করিতে পারা যায়) এবং লবণ মাখিয়া চটকাইবে। এই মিশ্রিত পদার্থকে খাসা বা পিট কহে। উহা দ্বারা চৌকা, গোল অথবা যে কোন আকারে গঠন করিবে। পরে তাহা বাদামী ধরণে ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, মাহী কাবাব প্রস্তুত হইল।

এই কাবাব মধুরাম্ল করিতে হইলে, পানক প্রস্তুত করিবে; অর্থাৎ চিনির রস তৈয়ার করিয়া, তাহাতে লেবুর রস মিশ্রিত করিবে। এই রস বা পানক পাক-পাত্রে জ্বালে চড়াইবে। ফুটিতে আরম্ভ করিলে, তাহাতে পূর্ব্ব-প্রস্তুত কাবাবগুলি ঢালিয়া দিবে। জ্বালে রস মরিয়া, অপেক্ষাকৃত গাঢ় অর্থাৎ ঘন হইলে, তাহাতে জাফরাণ-গোলা দিয়া, একবার ফুটিলে, নামাইয়া লইবে। এই মধুরাম্ল মাহী কাবাব, অম্লমধুর আস্বাদ জন্য, রসনার অতি উপাদেয় হইয়া থাকে।

মাংসের ষষ্ঠরঙ্গ।

মাংসের ষষ্ঠরঙ্গে ঝোল থাকে না, উহা এক-প্রকার শুষ্ক পাকের মাংস-বিশেষ। প্রথমে হাড় হইতে মাংস পৃথক্ করিয়া লইবে। পরে তাহা থুরিয়া, কিমা প্রস্তুত করিবে। এখন এই থুরা মাংস বা কিমা, ধনে-বাটা, (পিঁয়াজ-বাটা ইচ্ছা হইলে, ত্যাগ করিতে পার) এবং ঘৃত-সহ পাক করিবে; অর্থাৎ যেরূপ নিয়মে চপের মাংস রাঁধিতে হয়, সেই নিয়মে শুষ্ক পাক করিয়া নামাইয়া রাখিবে।

অনন্তর, একখানি তাওয়াতে তেজপাত সাজাইয়া, তাহাতে পূর্ব্ব-প্রস্তুত মাংসের একটী স্তবক সাজাইবে। এখন পাঁচটী সিদ্ধ ডিমের কুসুম মাংসের উপর ছড়াইয়া দিয়া, পাত্রটী আগুনের দমে বসাইবে। গরম হইলে, মাংসের উপর লবণ, ঘৃত এবং গরম মসলার গুঁড় দিবে। দমের অবস্থায়, যখন বুঝিবে, ঘৃত ও মসলাদি মাংসের সহিত বেশ মিশিয়া গিয়াছে, তখন তাহা নামাইয়া, অল্প গরম থাকিতে থাকিতে আহার করিবে।

ষষ্ঠরঙ্গ মধুরাম্ল আস্বাদের করিতে হইলে, সমান ভাগে চিনির ও লেবুর

রস মিশাইয়া, তাহা পাক করিবে। পাকে কিছু গাঢ় হইলে, সেই রস দমের অবস্থায় মাংসের উপর ঢালিয়া দিয়া, দুই-এক-বার ফুটিয়া উঠিলে, নামাইয়া লইবে। অম্লমধুর আস্বাদ জন্য ষষ্ঠরঙ্গ অত্যন্ত উপাদেয় হইয়া থাকে।

সিরাজী বেগুণ ঘণ্ট।

প্রথমে কচি বেগুণ জলে সিদ্ধ করিবে। পরে তাহার খোসা ছাড়াইয়া, তাহা লবণ দিয়া মাখিবে। এখন ঘৃতে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া, উহা সম্বরা দিবে। সম্বরা দেওয়ার পর, তাহাতে আদার রস, দধি এবং কিসমিস্ দিয়া পাক করিতে থাকিবে।

এ-দিকে ডিম সিদ্ধ করিয়া, তাহার খোলা ছাড়াইবে। এখন ডিম ছোট ছোট টুকরা করিয়া কাটিবে। পরে তাহা বেগুণে ঢালিয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। অনন্তর তাহা নামাইয়া রাখিবে।

এইবার একটী পাক-পাত্র ঘৃত-সহ জ্বালে বসাইবে, এবং ঘৃত পাকিয়া আসিলে, তাহাতে লবঙ্গ ও কাঁচা-লঙ্কা ফোড়ন দিবে। পরে তাহাতে ব্যঞ্জন সম্বরা দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। অনন্তর তাহাতে জাফরাণ-বাটা ও গরম মসলার গুঁড় দিয়া নামাইয়া লইবে।

যদি এই ঘণ্ট মধুরাম্ল করিতে ইচ্ছা কর, তবে চিনির রসে পাতি কিংবা কাগজি লেবুর রস মিশাইয়া, ঘণ্টে দধি দেওয়ার সময় ঢালিয়া দিবে। তাহার পর গরম মসলা প্রভৃতি দেওয়ার যে নিয়ম লিখিত হইল, সেই নিয়মে পাক করিলে-ই, সিরাজী বেগুণ ঘণ্ট প্রস্তুত হইল। এই ঘণ্ট উত্তম মুখ-রোচক। বেগুণ সিদ্ধ না করিয়া, পোড়াইয়া লইলে-ও চলিতে পারে। বেগুণ পুড়াইতে হইলে, কাট-কয়লা অথবা ঘুঁটের আগুনে পোড়াইলে-ই ভাল হয়।

উচ্ছের চচ্চড়ি।

নিরামিষ ব্যঞ্জনের মধ্যে উচ্ছের চচ্চড়ি বেশ সুখাদ্য। ইহার রন্ধন-প্রথা-ও অতি সহজ। প্রথমে আলুর খোসা ছাড়াইয়া কুটিবে; উচ্ছে লম্বা দিকে চিরিয়া চারিখানি করিবে, ঝিঙ্গে ও থোড়-ও কুটিয়া, জলে ধুইয়া রাখিবে।

এ-দিকে পাক-পাত্রে ঘৃত বা তৈল জ্বালে চড়াইবে; এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে উচ্ছে দিয়া নাড়িতে থাকিবে। একটু ভাজা ভাজা হইলে, অবশিষ্ট তরকারিগুলি তাহাতে ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। তরকারিগুলি কসা হইলে, তাহাতে হরিদ্রা-বাটা, আদা-বাটা, লঙ্কা-বাটা এবং লবণ দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। যখন দেখিবে, জল মরিয়া, তরকারি সুসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহা নামাইয়া, লঙ্কা ফোড়ন দিয়া, সম্বরা দিবে। দুই একবার ফুটিয়া উঠিলে-ই নামাইয়া লইবে।

আম-উচ্ছে-ভাজা।

প্রথমে কাঁচা আমের খোসা ছাড়াইবে। পরে তাহার কসি ফেলিয়া দিয়া, লম্বা আকারে ফালি ফালি করিয়া কুটিয়া, ধুইয়া রাখিবে। এ-দিকে উচ্ছে চাকা চাকা করিয়া কুটিয়া ধুইয়া রাখিবে।

এখন পাক-পাত্রে তৈল জ্বালে চড়াইবে। এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে তেজপাত ও কাঁচা লঙ্কা কুটিয়া দিবে। ভাজা ভাজা হইলে, মেতি ফোড়ন দিবে। পরে আম ও উচ্ছেগুলি হাঁড়িতে ঢালিয়া দিয়া, নাড়িয়া দিবে। একটু পরে পরিমাণ-মত লবণ তরকারিতে দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। এরূপ অবস্থায় অল্পক্ষণ জ্বালে থাকিলে, তরকারি পাক হইয়া আসিবে। অনন্তর তাহা নামাইয়া লইবে।

এই তরকারি বেশ মুখ-রোচক এবং সামান্য ব্যয়-সাধ্য। মনে করিলে, প্রত্যেক গৃহস্থ-ই উহা পাক করিতে পারেন।

প্রদিগ্ধ মাংস।

প্রথমে ছাগাদির কোমল মাংস কুটিয়া লইবে। পরে তাহা উপযুক্ত মসলার সহিত, অধিক ঘৃতে কসিতে হইবে। ঘৃতে ভাজার সময় তাহাতে সর্ব্বদা জলের ছিটা দিয়া, সিদ্ধ করিতে হইবে। অনন্তর তাহাতে লবণ, ঘোল এবং এলাচ, দারুচিনি ও তেজপাত দিয়া পাক করিয়া লইলে-ই, তাহাকে প্রদিগ্ধ মাংস কহে। অতি প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের মধ্যে এইরূপ নিয়মে মাংস পাক করিয়া, আহারের ব্যবস্থা ছিল।

আয়ুর্ব্বেদ-মতে প্রদিগ্ধ মাংস পুষ্টি-কর, বল-কারক, অগ্নি-বর্দ্ধক আর কফ-পিত্ত-নাশক।

তক্র-মাংস।

ঘোলের সহিত এই মাংস পাক করিতে হয় বলিয়া, ইহাকে তক্র-মাংস কহে। পারস্য-ভাষায় ইহার নাম 'এসনি'।

ছাগ ও মেষ প্রভৃতির মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কুটিবে। পরে ঘৃত জ্বালে চড়াইয়া, তাহা পাকাইয়া লইবে। এখন এই ঘৃতে হিং ও হরিদ্রা দিয়া নাড়িতে থাকিবে। ভাজা ভাজা হইলে, তাহাতে মাংস ঢালিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। জ্বালে জল মরিয়া আসিলে, তাহাতে পরিমিত জল ঢালিয়া দিয়া, পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। জ্বালে মাংস সিদ্ধ হইয়া আসিলে, লবণ, আদা-বাটা, ধনে-বাটা, তক্র অর্থাৎ ঘোলে গুলিয়া, মাংসে ঢালিয়া দিবে। পরে অল্প ঘৃতে তেজপাত ও লঙ্কা ফোড়ন দিয়া, তাহাতে মাংস সম্বরা দিয়া লইলে-ই, তক্র-মাংস পাক হইল। রুচি-জনক করিতে হইলে, মাংস উনান হইতে নামাইয়া, তাহাতে গরম মসলার গুঁড় দিবে।

তক্র-মাংস—লঘু-পাক, পাচক, রুচি-কর, বল-কারক, বাত-কফ-নাশক আর সামান্য পিত্ত-কারক।

মাছ-পোড়া।

মাছ আগুণে পোড়াইয়া, তাহাতে খাঁটি সরিষার তৈল, লবণ এবং কাঁচা-লঙ্কা মাখিয়া আহার করিতে হয়।

মাছ-পোড়া—গুরু-পাক, পুষ্টিকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, বল-কর, আর ক্ষীণ-শুক্র, ক্ষীণতেজা, জর্জ্জরিত ও নিত্য স্ত্রী-সহবাসকারীদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ভাজা মাছ ইহা অপেক্ষা গুণহীন।

কাঁচা আমের ঝুরিয়া।

অম্ল-মধুর আস্বাদ জন্য কাঁচা আমের ঝুরিয়া, অত্যন্ত মুখ-রোচক। ঝুরিয়ার প্রধান উপকরণ কাঁচা আম ও মটর দাইলের বড়ি। প্রথমে আমের খোসা ছাড়াইয়া, তাহা ছেঁচিবে বা বাটিবে।

এদিকে পাক-পাত্রে তৈল জ্বালে চড়াইবে। এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে বড়িগুলি দিয়া ভাজিয়া তুলিয়া রাখিবে। পরে অবশিষ্ট তৈলে সরিষা, জীরা, মৌরী, মেতি এবং কালজীরা ফোড়ন দিবে। ফোড়ন দেওয়ার পর, আমগুলি উহাতে ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে চাড়িতে থাকিবে। একটু কসা হইলে, ভাজা বড়ি ভাঙ্গিয়া, উহার উপর ঢালিয়া দিবে। আম ভাজা ভাজা হইলে, হরিদ্রা, লঙ্কা-বাটা, লবণ ও সামান্য চিনি জলে গুলিয়া, উহাতে ঢালিয়া দিবে। জ্বালে জল মরিয়া, আম ও বড়ি বেশ থক-থকে হইয়া আসিলে নামাইবে। অনন্তর মৌরী, মেতি ও কালজীরা আগুনের আঁচে সামান্য গরম করিয়া, তাহার গুঁড় উহার উপর ছড়াইয়া দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া লইলে-ই, কাঁচা আমের ঝুরিয়া পাক হইল।

কাঁচা আম অম্ল-রস এবং বায়ু-পিত্ত-কফ-বর্দ্ধক। কচি আম কষায়-রস, সুগন্ধি, অগ্নি-বর্দ্ধক, মল-রোধক, পিত্ত-বর্দ্ধক, বাত-রক্ত-কারক।

রাগষাণ্ডব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এই খাদ্য হিন্দুজাতির মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রাগষাণ্ডব এক-প্রকার আমের মোরব্বা। পূর্ব্বকালে যেরূপ নিয়মে এই মোরব্বা প্রস্তুত হইত, নিম্নে তাহা-ই লিখিত হইল। এক্ষণে মোরব্বা-পাকের নানাবিধ নিয়ম বাহির হইয়াছে।

প্রথমে কাঁচা আমের খোসা ছাড়াইবে। এখন প্রত্যেক আম দুই তিন খণ্ড লম্বা আকারে কাটিবে। এইরূপ নিয়মে আমগুলি কাটিয়া জলে ধুইবে। ধুইয়া জল ঝরিবার জন্য একটী চুবড়িতে তুলিয়া রাখিবে।

এদিকে আমের পরিমাণ বুঝিয়া, ঘৃত জ্বালে চড়াইবে, এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে ধৌত আম ভাজিবে। ভাজা হইলে, তাহা চিনির রসে ফেলিয়া

রাখিবে। উহা সুগন্ধ ও সুস্বাদু করিবার জন্য, চিনির রসে কর্পূর, মরীচের গুঁড় এবং ছোট এলাচের গুঁড় মিশাইয়া দিবে।

রাগষাণ্ডব।—সুস্বাদু, পুষ্টি-কর, বল-বৰ্দ্ধক, গুরু-পাক, স্নিগ্ধ, তৃপ্তি-কর, অরুচি-নাশক এবং রক্ত-দোষ ও বাত-পিত্ত-নাশক।

শিখরিণী।

শিখরিণীর অপর একটী নাম রসালা। ইহা এক-প্রকার সরবত। শ্রীকৃষ্ণ এই পানীয়-পানে বিশেষরূপ প্রীতি-লাভ করিতেন। ভীমসেন এই পানীয় প্রস্তুত করিয়া, কৃষ্ণের আনন্দ-বৰ্দ্ধন করিতেন। বৈদ্যক-শাস্ত্রে রসালার বিস্তর উপকারিতা লিখিত আছে। উহা অম্লমধুর-রস, শীতল, সারক, অগ্নি-বৰ্দ্ধক, স্নিগ্ধ, পুষ্টি-কর, বল-কারক, শুক্র-বৰ্দ্ধক, বাত-পিত্ত-নাশক এবং দাহ, তৃষ্ণা, রক্ত-পিত্ত, ও প্রতিশ্যায় রোগের উপশম-কারক। অতিরিক্ত সহবাস আর পথ-পর্য্যটন প্রভৃতি কারণজনিত ক্লান্তিও বিদূরিত করিয়া থাকে।

দুই-প্রকার নিয়মে শিখরিণী বা রসালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভাল শুকো দধি আট সের, পরিষ্কৃত চিনি চারি সের এবং দুগ্ধ ষোল সের, এই কয়েকটী জিনিষ এক সঙ্গে মিশাইবে; পরে তাহাতে উপযুক্ত-পরিমাণ কর্পূর, ছোট এলাচ, লবঙ্গ এবং গোলমরীচের গুঁড় মিশ্রিত করিবে।

প্রকারান্তর।—দধি চারি সের, চিনি দুই সের, মধু আধ পোয়া, শুঁট ও এলাচের গুঁড় প্রত্যেক আধ তোলা, আর মরীচ ও লবঙ্গের চূর্ণ প্রত্যেক দুই তোলা; এই সকল উপকরণ একসঙ্গে মিশাইয়া, পরিষ্কৃত পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর তাহাতে মৃগনাভি ও কর্পূর প্রভৃতি দিয়া, সুগন্ধ করিবে।

ক্ষীরিকা।

পরমান্ন বা পায়সের একটী নাম ক্ষীরিকা। নির্জ্জলা দুগ্ধে উহা পাক করিতে হয়। অতি-প্রাচীন-কালে যে নিয়মে ক্ষীরিকা প্রস্তুত হইত, এস্থলে তাহা-ই লিখিত হইতেছে।

অৰ্দ্ধ-পক্ব দুগ্ধে, দুগ্ধের ষোল ভাগের এক-ভাগ সরু আতপ চাউল, ঘৃতের

সহিত সিদ্ধ করিবে; চাউল সিদ্ধ হইলে, তাহাতে পরিমাণ-মত চিনি দিবে। পরমান্ন পাক হইলে, উহা উনান হইতে নামাইয়া, তাহাতে ছোট এলাচের দানার গুঁড় ও সামান্য কর্পূর দিবে।

বৈদ্য-শাস্ত্রমতে ক্ষীরিকার গুণ,—মধুর-রস, গুরু-পাক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টি-কর, এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্ত-পিত্তের হানিকারক।

আমের জারি।

ইহা এক-প্রকার আচার; জারির অপর নাম জালী। কাঁচা আম ধুইয়া পরিষ্কৃত করিবে। পরে তাহা বাটিবে। এখন আমের পরিমাণ বুঝিয়া, তাহাতে হিঙ্ ভাজা, সরিষা-বাটা, এবং লবণ মিশাইয়া লইলে-ই জারি প্রস্তুত হইবে।

বৈদ্য-শাস্ত্রমতে জারি অম্ল, লবণ, কটুরস, অগ্নি-বর্দ্ধক, রুচি-কর, কণ্ঠ-শোধক এবং জিহ্বার কণ্ডূ-নাশক।

আম্রলেহ।

ইহা-ও আমের এক-প্রকার চাটনি। আম্রলেহ অম্লমধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরু-পাক, রুচি-জনক এবং তৃপ্তি-কারক।

প্রথমে আমের খোসা ছাড়াইয়া, ফালি ফালি করিয়া কাটিবে। পরে তাহা ভাজিবে। এখন এই ভাজা আমে চিনি, সৈন্ধব, মরীচ আর ভাজা হিং মিশাইবে। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, আম্রলেহ প্রস্তুত হইবে।

প্রপানক।

কাঁচা আম জলে সিদ্ধ করিবে, পরে সেই জল ফেলিয়া দিয়া, শীতল জলে তাহা গুলিবে। এখন উহাতে চিনি, মরীচের গুঁড় এবং কর্পূর মিশাইবে। পরে তাহা পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে।

এই সরবত,—সদ্যোরুচি-কর, ইন্দ্রিয়-সমূহের তৃপ্তি-জনক, বল-কারক, পিপাসা-নাশক, শ্রান্তি-নিবারক এবং বায়ু-নাশক।

আম্রপানক।

কাঁচা আমের দ্বারা এই পানক অর্থাৎ সরবত প্রস্তুত করিতে হয়। এই সরবত রুচি-কর, বল-বর্দ্ধক, এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের তৃপ্তি-জনক। গরমের সময় এই পানক অত্যন্ত উপাদেয় হইয়া থাকে।

প্রথমে কাঁচা আমের খোসা ছাড়াইবে। পরে তাহা থেঁতো করিয়া, পরিমিত জলে গুলিবে। এখন উহাতে চিনি, মরীচের গুঁড় এবং সামান্য কর্পূর মিশ্রিত করিয়া, পরিষ্কৃত পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে।

আম্র-রসাকৃতি পানক।

এই সরবত দেখিতে পাকা আমের রসের ন্যায় বলিয়া, ইহাকে আম্র-রসাকৃতি পানক কহিয়া থাকে। এই সরবত অম্ল-মধুর-রস, রুচি-জনক, বল-বর্ণ-কারক এবং বায়ু ও পিত্ত-নাশক।

প্রথমে দধি মন্থন করিবে। পরে তাহাতে পরিমাণ-মত চিনি, পাতি এবং কাগজি লেবুর রস এবং জাফরাণ মিশ্রিত করিবে।

আর্দ্র-বটক।

ইহাকে আদা-বড়া কহে। ইহার প্রস্তুতের নিয়ম অতি সহজ। প্রথমে মুগের পিটা তৈয়ার করিয়া, তাহা ঘৃত কিংবা তৈলে ভাজিবে। পরে তাহা চূর্ণ করিবে। পরে সেই চূর্ণের সহিত ভাজা হিং, মরীচ, জীরা যোয়ান, আদা এবং লেবুর রস মিশাইবে। এখন এই চূর্ণের পূর দিয়া, মুগের দাইলের পিষ্টক প্রস্তুত করিবে, এবং তাহা ঘৃত অথবা তৈলে ভাজিবে। ভাজিয়া চিনির রসে ডুবাইয়া রাখিবে। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, আর্দ্র-বটক প্রস্তুত হইবে।

বৈদ্য-শাস্ত্র-মতে আদা-বড়া গুরু-পাক, মুখ-রোচক এবং অগ্নি-বর্দ্ধক।

মণ্ডুক।

ইহা এক-প্রকার পিষ্টক। প্রাচীনকালে এই পিটা খাদ্যে ব্যবহৃত হইত। ময়দায় ময়ান দিয়া, তাহা জলের সহিত মাখিয়া, খুব ঠাসিবে। পরে

ঐ ময়দার বড়া ভাজিয়া, চিনির রসে ফেলিবে। বড়া রসে ফেলিবার পূর্ব্বে, তাহাতে ছোট এলাচের গুঁড়, মরীচের গুঁড় এবং কর্পূর মিশাইয়া রাখিবে। ইহাকে মণ্ঠক অর্থাৎ মঠ নামক পিষ্টক কহে।

মণ্ঠক—মধুর-রস, গুরু-পাক, রুচি-কর, বল-কারক, পুষ্টি-জনক এবং শুক্র-বর্দ্ধক।

মাড়ারুটি।

ইঁহার সংস্কৃত নাম মণ্ডক, হিন্দুস্থানে ইহাকে মাড়া রুটি কহে। অন্যান্য রুটির ন্যায় আটা বা ময়দা জল-সহ খুব ঠাসিয়া মাখিবে। পরে তাহার লেচি কাটিয়া, বেলনায় না বেলিয়া, হাতে করিয়া গড়িবে। এই রুটি সেকিবার নিয়ম স্বতন্ত্র; অর্থাৎ আগুনের উপর একটী হাঁড়ি উপুড় করিয়া দিবে। তাপে উহা গরম হইলে, তাহাতে রুটি সেকিয়া লইবে।

মাড়ারুটি—মধুর-রস, অম্ল, গুরু-পাক, মল-রোধক, রুচি-কর, পুষ্টি-জনক, -কারক, শুক্র-বর্দ্ধক এবং ত্রিদোষ-নাশক।

সরচক্র।

সরচক্র এক-প্রকার সুমিষ্ট পিষ্টক। ইহা অতি উপাদেয় খাদ্য। মুগের দাইল দ্বারা এই পিষ্টক প্রস্তুত করিতে হয়। মুগের মধ্যে সোণা মুগ-ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

প্রথমে ভাজা মুগের দাইল, জলে সিদ্ধ করিবে। উহা সুসিদ্ধ হইলে, উত্তম-রূপে বাটিয়া লইবে। যে পরিমাণ দাইল, তাহার দুই ভাগ নারিকেল-কুরা চন্দনের মত করিয়া বাটিয়া রাখিবে। এখন চিনি দুই ভাগ, খোয়া-ক্ষীর দুই ভাগ, এবং এক ছটাক ময়দা, সমুদয় উপকরণগুলি এক সঙ্গে মিশাইবে। অনন্তর এই মিশ্রিত পদার্থ জ্বালে চড়াইয়া, নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে, জ্বালে উহার রস মরিয়া, শক্ত গোছের হইয়াছে, তখন তাহা নামাইবে।

এখন উহাতে পরিমিত ছোট এলাচের গুঁড় মিশাইয়া চটকাইয়া লইবে। এই মিশ্রিত পদার্থকে 'পিটি' কহে। এই পিটি দ্বারা চমচমের আকারে পিটা গড়াইবে। অনন্তর তাহা ঘৃতে বাদামী ধরণে ভাজিয়া, চিনির রসে ডুবাইয়া

রাখিবে। ইচ্ছা করিলে, রস ঠাণ্ডা হইলে, তাহাতে দুই এক ফোটা গোলাপী আতর মিশাইয়া লইবে। এই সরচক্র যেরূপ উপাদেয়, আহার না করিলে, তাহা অনুভব করা যায় না। উদরাময় রোগীর পক্ষে সরচক্র অত্যন্ত গুরু-পাক।

পিষ্টক-মাত্রে-ই গুরু-পাক্, বিদাহী, রুক্ষ, ও বল-কর। চাউলের গুঁড়ার পিটা কফ-পিত্ত-নাশক। দাইলের পিটা গুরু-পাক, বিষ্টম্ভী এবং বায়ুর অনু-লোম-কারক।

তবকী-সমোসা।

প্রথমে একসের মাংস বেশ করিয়া থুরিয়া, কিমা প্রস্তুত করিবে। পরে তাহা চপের মাংসের ন্যায় শুষ্ক পাক করিবে। এখন এক সের ময়দায় এক ছটাক ঘৃতের ময়ান দিয়া, লুচির ময়দা মাখার নিয়মে উত্তমরূপ ঠাসিয়া মাখিবে। ময়দা মাখিবার সময় তাহাতে একটু লবণ মিশাইবে। ময়দা মাখা হইলে, তাহার লেচি কাটিয়া, পাতলা করিয়া, এক একখানি লুচি বেলিবে। এখন এক ভাগ খাসির তেল ও দুই ভাগ ঘৃত এক সঙ্গে মিশাইয়া, সাটা প্রস্তুত করিবে। এই সাটা লুচির উপর লেপিয়া দিবে। পরে তাহার উপর একখানি বেলালুচি চাপিয়া দিবে। এইরূপে দুই তিনখানি উপরি উপরি সাজাইয়া, তাহার উপর পূর্ব্ব-প্রস্তুত মাংসের কিমা দিবে। পরে অপর বেলা লুচি দ্বারা মাংস ঢাকিয়া দিয়া, একটু জল-হাত করিয়া, লুচির চারি-ধার বেশ করিয়া, মুড়িয়া দিবে। অনন্তর তাহা লুচি ভাজার নিয়মে ঘৃতে ভাজিয়া তুলিয়া লইলে-ই, তবকী-সমোসা ভাজা হইল। এই সমোসা গরম গরম উত্তম সুখাদ্য।

দুগ্ধ-কূপিকা।

ইহা-ও এক-প্রকার মিষ্ট পিষ্টক। এই পিটা পূর্ব্বকালে এদেশে প্রস্তুত হইত। দুগ্ধ-কূপিকার প্রধান উপকরণ ময়দা, দুগ্ধ, ঘৃত এবং চিনি।

প্রথমে ময়দায় ছানা মিশাইয়া দুধে মাখিবে। পরে তদ্দারা পুলি পিটার আকারে গড়াইয়া ভিতরে ক্ষীরের পূর দিবে। এখন উহা ঘৃতে ভাজিয়া, চিনির রসে ফেলিবে। ময়দার অভাবে চাউলের গুঁড়াতে-ও প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু তাহা তত সুখাদ্য হয় না।

দুগ্ধ-কূপিকা—রুচি-কর, গুরু-পাক, শীতল, শুক্র-বর্দ্ধক, পুষ্টি-কর এবং বায়ু ও পিত্ত-নাশক।

হরিদ্বর্ণ মিষ্ট রুটি।

এই রুটি উত্তম সুখাদ্য। রুটি প্রস্তুত করিবার সময় ময়দায় চিনি মিশাইতে হয়, এজন্য রুটির মিষ্ট আস্বাদন হইয়া থাকে। যদি তিন পোয়া ময়দার রুটি করিতে হয়, তবে পেষিত কাঁচা ছোলা এক পোয়া, চিনি এক পোয়া, বাদাম-বাটা আধ পোয়া, দুধের সর আধ পোয়া, পেস্তা এক ছটাক, মৃগনাভি এক পোয়া এবং গোলাপ জল আধ ছটাক লইবে। অনন্তর ঐ সকল উপকরণ এক সঙ্গে মিশাইয়া, যে নিয়মে ময়দা মাখে, সেই নিয়মে মাখিবে। ময়দা যে অধিক পরিমাণে ঠাসিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে। ময়দা উত্তমরূপ ঠাসা হইলে, রুটি খুব ফুলিয়া উঠে এবং মোলায়েম হয়। ময়দা মাখা হইলে, তাহার লেচি কাটিয়া, রুটি বেলিবে। এই রুটি তন্দুরে অর্থাৎ পাঁউরুটি সেকিবার উনানে সেকিলে ভাল হয়।

গোধূম-চূর্ণ অর্থাৎ ময়দা কষায়-যুক্ত মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু-পাক, বিষ্টম্ভী, বিরেচক, বল-কারক, শুক্র-বর্দ্ধক, পুষ্টি-জনক, দেহের স্থিরতা-কারক, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, রুচি-কর।

ফিরিঙ্গি রুটি।

সুজি দ্বারা ফিরিঙ্গি রুটি প্রস্তুত করিতে হয়। এই রুটি অত্যন্ত লঘু-পাক, এজন্য রোগীর পথ্যে ব্যবহার করিতে পারা যায়। অম্লরোগে বাসী রুটি কুপথ্য।

সুজি মাখিবার সময়, তাহাতে তাল, খেজুর কিংবা মৌরীর জল মিশাইয়া মাখিতে হয়। আর অন্যান্য রুটি অপেক্ষা ইহা অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত দলিয়া মাখিতে হয়। যে পরিমাণে দলিবে বা ঠাসিবে, সেই পরিমাণে রুটি ফুলিয়া উঠিবে। এই রুটি তন্দুরে পাক করিতে হয়।

উজবুকী রুটি।

এক সের আটাতে আধ পোয়া ঘৃত ও এক পোয়া দুধের ময়ান দিয়া, খুব ঠাসিয়া মাখিবে। অনন্তর তদ্দ্বারা ছোট কিংবা বড় যে কোন আকারে রুটি গড়িবে। এই রুটি সেকিবার নিয়ম একটু স্বতন্ত্র; অর্থাৎ পাঁওরুটি সেকিবার উনান যেরূপ আগুন জ্বালিয়া গরম করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ আগুন করিয়া প্রথমে একটী স্থান খুব গরম করিবে। সেই তপ্ত ভূমিতে চাটু বসাইয়া, তাহার উপর রুটি দিবে। এখন উহাতে আচ্ছাদন দিয়া, সেই ঢাকার উপর আবার কাট-কয়লার আগুন দিবে। এইরূপ অবস্থায়, অর্থাৎ দমে থাকিলে, রুটি সুপক্ক হইয়া আসিবে। লিখিত নিয়মে উজবুকি রুটি প্রস্তুত করিতে হয়। এই রুটি বেশ সুখাদ্য।

মিঠে রুটি।

উপকরণ ও পরিমাণ।—সাদা যবের আটা এক সের, বাদাম-বাটা এক সের, দুধের সর আধ সের, ননী আধ ছটাক, চিনি এক সের, পেস্তা এক ছটাক, গোলাপ জল আধ পোয়া, মৃগনাভি এক রোয়া, জাফরাণ দুমাসা এবং একটী ডিমের শ্বেত ভাগ।

প্রথমে চিনির এক তার বন্দ রস প্রস্তুত করিবে। এখন এই রসে আটা, বাদাম-বাটা এবং ডিমের শ্বেত ভাগ মিশাইয়া, উত্তমরূপ দলিবে। পরে আধ পোয়া পরিমাণ এক একটী লেচি কাটিয়া, আট কোণ আকারে এক একখানি রুটি বেলিবে। অনন্তর মৃদু তাপে চাটু চড়াইয়া, তাহাতে একখানি করিয়া রুটি সেকিবে। সেকিবার সময় পেস্তা পাতলা পাতলা করিয়া, তাহার উপর দিবে। সুপক্ক হইলে রুটির উপর জাফরাণ ও মৃগনাভি ননীতে গুলিয়া দিবে। কেহ কেহ আবার উহা সুদৃশ্য করিবার জন্য সোণালি কিংবা রূপালির পাত দ্বারা মুড়িয়া থাকেন। কিন্তু খাদ্য-দ্রব্যে ঐরূপ কোন জিনিস না মিশান-ই ভাল।

যবের রুটি মধুর-রস, লঘু-পাক, রুচি-কর, বল-কারক, শুক্র-বর্দ্ধক, বায়ু ও মলের বৃদ্ধি-কারক আর কফ-নাশক।

পাক-প্রণালী।

সূপ-শাস্ত্র।

আর্য্য-ঋষি-প্রণীত প্রাচীন সূপ-শাস্ত্র আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংসার-বিরাগী আর্য্য-ঋষিগণ, আমাদের জীবন-রক্ষার জন্য খাদ্য-দ্রব্যাদি নির্ব্বাচন, রন্ধন-প্রথা, পাচক ও পাচিকা নির্দ্ধারণ, রন্ধন-গৃহ, ভোজন-পাত্র, এবং পরিবেষক স্থিরীকরণ প্রভৃতি প্রত্যেক গৃহস্থের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি, অতি সুন্দররূপে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সাংসারিক প্রত্যেক বিষয়ে-ই তাঁহাদিগের সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি ছিল। তাঁহারা

বুঝিয়াছিলেন, রুচি-কর পুষ্টি-জনক দ্রব্য আহার না করিলে, কখন-ই মানব-দেহ সুরক্ষিত হয় না। দেহ রক্ষিত না হইলে, মনুষ্য দ্বারা সমাজের কোন প্রকার কল্যাণ সুসম্পন্ন হয় না। যে খাদ্যাদির উপর মানব-দেহ সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে, সেই দুর্লভ দেহ বা জীবন রক্ষা করিতে হইলে, আহারের সুব্যবস্থা করিতে হয়। আহারের সুব্যবস্থা করিতে হইলে, রন্ধন-গৃহের প্রতি সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে। তাই ঋষি-সমিতি প্রথমে-ই ব্যবস্থা করিলেন—

আগ্নেয্যাং দিশি কর্ত্তব্যমাবাসস্য মহানসং।
গবাক্ষজালমার্গায় মূর্দ্ধভিত্ত্যুপলেপিতং॥
চুল্লী তত্র প্রকর্ত্তব্যা পূর্ব্বপশ্চিমমায়তা।
মৃন্ময়াদীনি ভাণ্ডানি ক্ষালিতানি চ বারিণা॥
তেষু যৎ পচ্যতে দ্রব্যং গুণবৎ সর্ব্বসম্মতং।
মৃদুতাপে পচেল্লৌহে চক্ষুরর্শোবিকারজিৎ॥
কাংস্যজে পাচিতং যদ্ধি তদ্ধিতং মতিদং শুচি।
যচ্চ তাম্রময়ে সিদ্ধং ন রুচ্যং স্বল্পপিত্তকৃৎ॥
সৌবর্ণে রাজতে পাচ্যধিমাঢ্যভূমিভৃতাং গৃহে।
তৎপাত্রং সর্ব্বদোষঘ্নং ধীষণোৎসবদায়কং॥

অর্থাৎ ভদ্রাসনের অগ্নি-কোণে রন্ধন-গৃহ নির্ম্মাণ করিবে; বাস্তবিক, রন্ধন-শালা বাস-ভবনের অদূরে নির্ম্মিত হইলে, ধূমাদি দ্বারা স্বাস্থ্যের হানি করে না, এবং গৃহ সামগ্রী-ও মলিন হয় না। আর রন্ধন-গৃহে বহুতর গবাক্ষ রাখিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা-ও বিজ্ঞান-সম্মত। রন্ধন-গৃহে ধূম-নির্গমের প্রশস্ত ব্যবস্থা না থাকিলে, ধূম দ্বারা পাচক বা পাচিকার দৃষ্টি-শক্তির ব্যাঘাত জন্মে; চক্ষু অতি-কোমল পদার্থ, তাহাতে সর্ব্বদা ধূম লাগিলে যে, চক্ষু-রোগ হইবার সম্ভাবনা, অনেক চিকিৎসকদিগের ইহা-ই অভিমত। আজকাল যে পাথুরিয়া কয়লার ধূঁয়াতে কোন কোন রুদ্ধ-গৃহে অনেকের প্রাণ-বিনাশ হইতে শুনা যায়, তাহা কে-না অবগত আছেন? আর এক কথা, গৃহে ধূম নির্গত হইতে ব্যাঘাত হইলে, তদ্দ্বারা প্রচুর ঝুল সঞ্চিত হয়, গৃহের বায়ু দূষিত হয়, সেই দূষিত বায়ু কিংবা ঝুল-সংযোগে পক্ক-দ্রব্য যে, অস্বাস্থ্য-কর হইয়া থাকে, তাহা একটু অনুধাবন করিলে-ই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

রন্ধন-গৃহের দেওয়াল লেপিবার ব্যবস্থা আছে। এ-প্রথাটী যে, অতি সুন্দর, তাহা বলা-ই বাহুল্য। কারণ, দেওয়ালের গাত্রে গর্ত্ত প্রভৃতি থাকিলে, নানা-প্রকার কীট পতঙ্গাদির আবাস স্থান হইয়া উঠে; ঐ সকল প্রাণী দ্বারা খাদ্য-দ্রব্য বিষাক্ত বা বিদূষিত হইবার সম্ভাবনা।

রন্ধন-গৃহের পর-ই ঋষিগণ পাক-পাত্রের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মৃত্তিকা, লৌহ এবং কাংস্য পাত্র-সমূহ-ই রন্ধন করিবাব পক্ষে প্রশস্ত। তাম্র-পাত্রে কোন দ্রব্য পাক করিলে, তাহা অহিত-কর হয়। বিশেষতঃ, অম্লপিত্ত রোগে তাম্র-পাত্রে পক্ক-দ্রব্য যার-পর-নাই অনিষ্ট-জনক; তবে সাধারণতঃ, রন্ধনের তাম্র-পাত্র মাসের মধ্যে অন্ততঃ দুইবার কলাই করিয়া লইলে, অপকারের তত আশঙ্কা থাকে না। ধনবান্ ব্যক্তিদিগের জন্য কাঞ্চন ও রজত পাক-পাত্রের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পাত্রে পক্ক-খাদ্য আহার করিলে, আনন্দ ও বীর্য্য-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আর্য্যগণ পক্ক-দ্রব্য রাখিবার নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন, তৎসমুদয় অত্যন্ত হিত-কর। তাঁহাদের ব্যবস্থা এইরূপ :—

সঙ্কীর্ণে পাত্রসম্ভারে মার্গে বা গ্রামবর্জ্জিতে।
স্থাপয়েদ্‌গুণবান্ সূদঃ সিদ্ধান্নং পাত্রকান্তরে॥
ভুক্তং সপাবকে স্থাপ্যং ন স্থাপ্যং পাত্রকান্তরে।
ঘৃতং কাষ্ঠায়সে স্থাপ্যং মাংসং মাংসভবং রসং॥
স্থাপয়েদ্রাজতে হৈমে পাত্রে লৌহেঽথ কাষ্ঠজে।
পত্রাদি ষড়্‌বিধং শাকং স্থাপ্যং কাষ্ঠাশ্মলৌহজে॥
পক্কান্নং পিষ্টজং ভক্ষ্যং স্থাপ্যং কাংস্যেঽথ দারুজে॥
পানীয়ং পায়সং তক্রং মৃন্ময়েষ্বেব ধারয়েৎ।
কাচজে স্ফাটিকে বাথ বৈদূর্য্যাদ্বিবিচিত্রিতে॥
ধারয়েৎ সর্ব্বদা পাত্রে রাগষাড়বসট্টকান্॥
উক্তপাত্রান্তরে স্থাপ্যং যদ্দ্রব্যং তদ্রুজাপহং।
সর্ব্বদা সুখদং হৃদ্যমন্যথা দোষকারকং॥

সূপকার অর্থাৎ পাচক রন্ধন করিয়া, পক্ক-দ্রব্য-সমূহ কিরূপ পাত্রে রাখিবে; তদ্বিষয়ে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তৎসমুদয় বড়-ই যুক্তি-সঙ্গত। অন্ন, পলান্ন,

খেচরান্ন প্রভৃতি অগ্নির উপর স্থাপন করিবে, অর্থাৎ দমে বসাইয়া রাখিবে। ঈষদুষ্ণ অন্ন যে, স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হিত-কর, সমুদয় চিকিৎসা-শাস্ত্র তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। মনোহর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্রে ঘৃতাদি রাখিবে। পানীয় প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তর পাত্রে রাখিবার ব্যবস্থা আছে। কাচ বা স্ফাটিক পাত্র যে, পূর্ব্বকালে ব্যবহৃত হইত, তাহার-ও প্রমাণ দেখা যাইতেছে। ফলতঃ পরিষ্কৃত পাত্র যে, অত্যন্ত রুচি-কর এবং স্বাস্থ্যের অনুকূল, তাহা আর্য্যেরা অবগত হইয়া-ই ঐরূপ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। এক্ষণে অনেকে মনে করিয়া থাকেন, ইংরাজদিগের অনুকরণ করিয়া, এদেশে কাচের পাত্র ব্যবহৃত হইতেছে; কিন্তু সে বিশ্বাস যে, সম্পূর্ণ ভুল, তাহা উপর্য্যুক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

রন্ধনোপযোগী দ্রব্য-সম্ভার রন্ধন-গৃহ বা ভাণ্ডার-গৃহে রাখিবার যে ব্যবস্থা আছে, তৎসমুদয় আলোচনা করিলে, স্পষ্ট-ই প্রতীয়মান হয়, রন্ধন-বিদ্যায় তাঁহাদের বিশেষরূপ অভিজ্ঞতা ছিল, এবং রন্ধন-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে, তাঁহারা যার-পর-নাই উন্নতি-লাভ করিয়াছিলেন। রন্ধন করিতে হইলে, যে সকল দ্রব্য সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে হয়, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিম্ন-লিখিত ব্যবস্থা দিয়াছেন :—

বস্তূনি ভোজনার্হাণি বিবিধানি পুনঃ পুনঃ।
সর্ব্বাণি গুণযুক্তানি স্থাপিতানি মহানসে॥
দাস্যাপ্তা মার্জ্জনী বাঢ়া পূতহণ্ডী স্রুকূর্চ্চিকা।
ঘর্ষণী বৈণবং পাত্রং জলপূর্ণস্থলিঞ্জরঃ॥
বহ্নিসংজননো গ্রাবা কুদ্দালং সুকুঠারকঃ।
দারুখণ্ডানি শুষ্কাণি হস্তমাত্রাণি চেন্ধনং॥
অজীর্ণান্যনতিস্থূলান্যজন্তূন্যমলানি চ।
তিতয়ূশ্চালনী পীঠো মুষলং চাপ্যুদূখলং॥
শূর্পো লোষ্ট্রশিলা দর্ব্বী চতুরস্রাবপট্টিকা।
সংদংশকস্তু যুগলং বস্ত্রখণ্ডচতুষ্টয়ং॥
নালিকা ছুরিকা চৈব সুশূলং সুকটাহকং।
বহ্নিসংচালনার্থায় দর্ব্বী দীর্ঘায়ুলোহজা॥

তন্দুরং ঝর্ঝরী স্রাবা তপ্তকং দৃঢ়বেষ্টনী।
ইত্যাদি বস্তুজাতং হি যুজ্যতে চ মহানসে॥

পাচক বা পাচিকা রন্ধনে নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সমূহ সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। যে সকল পাত্রে ভোজ্য-দ্রব্য রাখিলে, স্বাস্থ্যের কোন প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত না হয়, এরূপ পাত্রাদি রন্ধন-গৃহে রক্ষা করিবেন। আর রন্ধন-গৃহের কার্য্যাদি করিবার জন্য সুবিশ্বস্তা পরিচারিকা নিয়োগ করিবেন। বাস্তবিক, খাদ্য-দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার ভার যাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকে, তাহারা বিশ্বাসী না হইলে, পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। আমাদের জীবনের উপর, যাহাদিগের বাস্তবিক মায়া-মমতা আছে, এরূপ বিশ্বাস-যোগ্য লোকের-ই রন্ধন কার্য্যের সংস্রবে থাকা যে, একান্ত আবশ্যক, তাহা কাহাকে-ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয় না।

হাতা, বেড়ী, চিমটা, শিক, জলের জালা, কুলা, ধুচনী প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সমূহ রন্ধন-শালায় না থাকিলে, রন্ধন-কার্য্যে বড়-ই অসুবিধা হইয়া উঠে। আর কীট-জর্জ্জরিত কাষ্ঠ যে, রন্ধনের পক্ষে বিশেষরূপ অসুবিধাজনক, এ-কথা কে-না অবগত আছেন?

পাক-সম্বন্ধে সপ্তবিধ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ :—

তর্জ্জনং তলনং স্বেদঃ পচনং ক্বথনং তথা।
তান্দুরং পুটপাকশ্চ পাকঃ সপ্তবিধো মতঃ॥

পূর্ব্বকালে সূপ-বিদ্যার যে, কতদূর শ্রীবৃদ্ধি-সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা এই পাক বা জ্বালের ব্যবস্থা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয়। বিশেষ বিশেষ রন্ধনে, বিশেষ বিশেষরূপ তাপের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কোন কোন খাদ্য-দ্রব্য তৈল, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ পদার্থে ভাজিতে হয়। কোন কোন দ্রব্য কেবলমাত্র সিদ্ধ করিতে হয়। কোন কোন দ্রব্য বাষ্প-যন্ত্রে অর্থাৎ ভাপে পাক করিতে হয়; পলান্ন প্রভৃতি পুটপাক অর্থাৎ দমে রাখিতে হয়, কোন কোন রুটি তন্দুরে সেকিতে হয়। এইরূপ বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য পাকের জন্য বিভিন্ন-প্রকার তাপ বা জ্বালের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়।

ভক্ষ্য-দ্রব্য-সমূহ অর্থাৎ অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি কি নিয়মে ভোক্তার সম্মুখে স্থাপন করিবে, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক, খাদ্য-দ্রব্য যদৃচ্ছাভাবে সজ্জিত বা রক্ষিত হইলে, আহার-কালে, বিশেষরূপ

অসুবিধা হইয়া থাকে। সুচারু ব্যবস্থার সহিত কোন কার্য্য সম্পন্ন না হইলে, তাহারা অঙ্গহীন হইয়া উঠে; যে কার্য্য অঙ্গহীন বা ত্রুটি সংযুক্ত হয়, তাহা কখন-ই উন্নতির পরিচায়ক নহে। এজন্য, ভোজ্য-দ্রব্য-সমূহ স্থাপন-সম্বন্ধে আর্য্য জাতির ব্যবস্থা অতি সুন্দর। সেই ব্যবস্থা এইরূপ:—

পুরস্তাদ্বিমলং পাত্রং সুবিস্তীর্ণং মনোরমং।
তত্র ভক্তং পরিন্যস্তং মধ্যভাগে সুসংযতং॥
সূপঃ সর্পিঃ পলং শাকং পিষ্টমন্নন্তু মৎস্যকং।
স্থাপয়েদ্দক্ষিণে পার্শ্বে ভুঞ্জানস্য যথাক্রমং॥
প্রলেহাদ্যাঃ দ্রবাঃ সর্ব্বে পানীয়ং পানকং পয়ঃ।
চূষ্যং সন্দানকং লেহ্যং সব্যপার্শ্বে নিধাপয়েৎ॥
সর্ব্বানিক্ষুবিকারাংশ্চ পকান্নং পায়সং দধি।
পুরতঃ স্থাপয়েদ্ভোক্তুর্দ্বয়োঃ পংক্তৌ চ মধ্যতঃ॥

ভোক্তার সম্মুখে প্রশস্ত নির্ম্মল এবং মনোহর পাত্রের মধ্যস্থলে অন্ন সজ্জিত করিবে; ঘৃত, শাক, শুক্ত, দালি এবং মৎস্য-মাংসাদি ভোক্তার দক্ষিণে স্থাপন করিবে; চূষ্য, লেহ্য, পেয়, এবং আচার চাটনি প্রভৃতি বাম-ভাগে রক্ষা করিবে; এবং পায়স, দধি ও পকান্ন আদি মধ্যভাগে দুই পংক্তি করিয়া, ভোক্তার সম্মুখে স্থাপন করিবে।

পূর্ব্বকালে ভোজন-সম্বন্ধে যে, যার-পর-নাই উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল, ভোজ্য-দ্রব্য-সমূহ-স্থাপনের ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে-ই তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। ভোজন-সময়ে যে, নানাবিধ উপাদেয় ব্যঞ্জনাদির প্রচলন ছিল, আর মৎস্য-মাংস এবং মিষ্টান্ন ও আচার প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত, তাহা-ও সহজে বুঝিতে পারা যায়।

ভোজ্য-পাত্র-সমূহ যে, কিরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে ব্যবহৃত হইত, তদ্বিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থা আছে:—

তিষ্ঠন্তি যত্র নবকাঞ্চননির্ম্মিতানি
শ্রেণীকৃতানি পরিতস্তু কটোরকাণি।
রাকাশশাঙ্ক নিভমণ্ডলভাস্বরং যৎ
ক্ষৌণীভৃতাং রজতনির্ম্মিতথালকং স্যাৎ॥

অধোর্দ্ধপ্রতিমাদর্শি কাংস্যমাদর্শবৎ শুচি।
পাত্রং দৃঢ়ং সুবিস্তীর্ণং স্ত্রীণামত্যন্তদুর্লভং॥
পত্রাবলী ভবতি বা নম্ন ভোজনায়
নির্জন্তু জালরহিতামলবারিধৌতা।
পালাশভূরুহদলৈ রচিতা মনোজ্ঞা
তাদৃগ্বপনগণৈঃ? পরিবেষ্টিতা চ॥

পূর্ব্বকালে ধনকুবের নরপতিগণের জন্য সুবর্ণ ও রজত-বিনির্ম্মিত ভোজন-পাত্র ব্যবহৃত হইত। ভোজন-পাত্র পূর্ণ চন্দ্র-প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল করিবার ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে হাইপলিশ করিলে, রজত-কাঞ্চনাদি যেরূপ সমুজ্জ্বল দীপ্তিশালী হয়, ভোজন-পাত্রের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সেইরূপ দৃষ্টি ছিল। ব্যঞ্জনাদি ব্যবহারের জন্য বহুবিধ সুমার্জ্জিত কটোরা অর্থাৎ বাটী দ্বারা ভোজনস্থল সুসজ্জিত হইত। সাধারণের জন্য কাংস্য ও পত্রাদি ব্যবহৃত হইত; কিন্তু তৎসমুদয়ের-ও সুপরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি ছিল। কাংস্য পাত্র-ও আবার দর্পণের ন্যায় উভয় দিকে উজ্জ্বল বা চাকচিক্যশালী করিবার আদেশ ছিল। আর পত্রাদি-ও কীট ও জন্তুর জালাদি রহিত করিবার জন্য সুধৌত করিতে হইত। ফলতঃ, এই সকল আলোচনা করিলে, সহজে-ই অনুভব করিতে পারা যায় যে, স্বাস্থ্য ও তৃপ্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া-ই ভোজনের ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন জাতি সভ্যতার চরম সীমায় উপস্থিত হইলে, যে সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, প্রাচীন ভারতবাসী তদ্বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাঁহারা যে সময়ে এই সকল অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় আবিষ্কার করিয়া, বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তৎকালে পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-ভাগ ঘোরতর অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। খাদ্য-দ্রব্যের উন্নতির সহিত যখন আমাদের বল, বর্ণ ও পরমায়ুর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তখন ঋষি-গণ বিশেষরূপ গবেষণা করিয়া-ই, উহার সম্যক্ উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন।

সূপ-শাস্ত্রে পরিবেষক-সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা পাঠ করিলে, ইহা-ই প্রতীত হয়, দেশের প্রকৃতি বুঝিয়া-ই তাহা ব্যবস্থিত হইয়াছিল। যে দেশের যেরূপ প্রকৃতি, সে দেশের আচার ব্যবহার ও আহার এবং পরিচ্ছদাদি সেই দেশের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য-ই পরিবেষক-সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে :—

স্নাতশ্চন্দনচর্চ্চিতঃ সুবসনঃ স্রগ্বী প্রসন্নাননঃ,
স্পষ্টাত্মা সুভগঃ প্রসন্নহৃদয়ঃ শ্রীকান্তপূজারতঃ।
স্বামিস্নেহপরঃ স্বপাকনিপুণঃ প্রৌঢ়ো বদান্তঃ শুচিঃ,
বিপ্রো বা পরিবেষকস্তু কুলজশ্চান্যোঽপি বা ভূপতেঃ॥

আজকাল ইংরেজের চাপ্‌কান-পরিহিত তক্‌মা-ধারী ফৈজু খানসামার হস্তে ভিন্ন অনেকের আহারে রুচি জন্মে না। আমাদের উষ্ণ-প্রধান দেশ, সর্ব্বদা দেহ হইতে ঘর্ম্মাদি নির্গত হইয়া থাকে, পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ করিলে, দেহ হইতে অধিক পরিমাণে স্বেদ নিঃসৃত হইবার কথা। স্বেদ বা ক্লেদ খাদ্য দ্রব্যে পতিত হইলে, উহা দূষিত ও অরুচি-কর হইয়া থাকে; এজন্য পরিবেষক গাত্রে চন্দন লেপন করিয়া, এবং সদ্গন্ধ পুষ্প-মাল্য ধারণ-পূর্ব্বক পরিবেষণ করিবেন। পরিবেষক স্নানান্তে পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সহাস্য-মুখে পরিবেষণ করিবেন। বাস্তবিক, শুদ্ধাচারীর হস্ত-প্রস্তুত খাদ্যাদিতে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, অজ্ঞাত-কুল-শীল, নীচ-কুল-জাত এবং নীচ-কর্ম্মার হস্তে কখন-ই সেরূপ রুচি জন্মে না। যে সকল জাতি স্বভাবতঃ-ই অশুচি ও হীন-কর্ম্মা, তাহাদের হস্ত-স্পর্শ ও শ্বাস-প্রশ্বাস-সংক্রমিত খাদ্য যে, স্বাস্থ্য ও রুচির বিরোধী, এ-কথা কাহাকে-ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে হয় না।

গৃহস্থ-গৃহে পরিবারস্থ মহিলাগণ-ই রন্ধন ও পরিবেষণ করিয়া থাকেন। এ-নিয়মটী যে, কতদূর পবিত্র ও উৎকৃষ্ট, তাহা একটু চিন্তা করিলে-ই বুঝিতে করিতে পারা যায়। বাস্তবিক মাতা, ভগিনী, সহধর্ম্মিণী ও আত্মীয়া নারীগণ যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহের সহিত আমাদের খাদ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, বেতন-ভুক্ নিঃসম্পর্কীয় পাচক বা পাচিকা দ্বারা তাহা কখন-ই প্রত্যাশা করা যায় না। সেই জন্য পরিবেষিকা-সম্বন্ধে সূপ-শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে :—

স্নাতা বিশুদ্ধবসনা নবধূপিতাঙ্গী কর্পূরসৌরভমুখী নয়নাভিরামা।
বিম্বাধরা শিরসি বদ্ধসুগন্ধিপুষ্পা মন্দস্মিতা ক্ষিতিভৃতাং পরিবেষিকা স্যাৎ॥

"স্নান করি সুন্দরী শোভন বস্ত্র পরি।
সুচারু নূতন ধূপ-গন্ধে অঙ্গ ভরি॥
কর্পূর-সৌরভ মুখে অনঙ্গ বিভোল।
বলে ছলে মৃদুমন্দে নয়ন-হিল্লোল॥

ওষ্ঠ দুটি পরিপাটি বিম্বফল জিনি।
সুকোমল মুখে মৃদু মধুর হাসিনী॥
সুগন্ধ পুষ্পের গুচ্ছে কবরী বন্ধন।
সূপ-পরিবেষিকার এমত লক্ষণ॥"

রাজারাজড়ার কথা ছাড়িয়া দাও; গৃহস্থ-মহিলারা যেরূপ সস্নেহ মধুর বাক্যে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত রন্ধন ও পরিবেষণ করিয়া থাকেন, তদ্দর্শনে মনে হয়, প্রত্যক্ষ দয়ামায়ার স্বর্গীয় প্রতিমাগুলি অন্নপূর্ণারূপে ভারতবাসীর গৃহস্থালী পবিত্র করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা দিন দিন এই অপার্থিব গার্হস্থ-সুখ হইতে বঞ্চিত হইতেছি! অন্নপূর্ণারূপিণী মহিলাগণের রন্ধন-কার্য্যে ভ্রষ্টাচার পাচক পাচিকাগণ প্রবেশ করিতেছে!

পরিবেষণ-সম্বন্ধে আর একটী ব্যবস্থা আছে, সে ব্যবস্থাটী অতি সুন্দর।

অর্থাৎ :—

লবণং ব্যঞ্জনঞ্চৈব ঘৃতং তৈলং তথৈব চ।
লেহ্যং পেয়ঞ্চ বিবিধং হস্তদত্তং ন ভক্ষয়েৎ॥

লবণ বা ব্যঞ্জন, ঘৃত, তৈল, লেহ্য এবং পেয় কিছু-ই হাতে করিয়া, পরিবেষণ করিলে, খাইবে না। এ-স্থলে ব্যঞ্জনাদির পরিবেষণ পরিশুদ্ধরূপে না হইলে যে, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার উদ্রেক হইয়া, চিত্তের অপ্রশস্ততা জন্মে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা হইয়াছে।

পরিবেষণাদির পর ভোক্তার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে :—

স্নাতঃ সুধৌত-মৃদুসুন্দর-শুক্লবাসা-
স্তৎকাল-ধৌত-চরণঃ সহ পুত্রমিত্রৈঃ।
স্রগ্বী প্রসন্নহৃদয়ো রসপাকবেদ্যাং
ভোক্তা বিশেচ্চ সততং হি মহাত্মবৈদ্যৈঃ॥
মৃদুতূলময়ে স্থূলে চারুবস্ত্রাবগুণ্ঠিতে।
আসনে প্রাঙ্মুখো ভোক্তোপবিশেদ্বাপ্যুদঙ্মুখঃ॥

ভোক্তা উত্তমরূপে স্নান করিবেন এবং সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুষ্পমালা ধারণ করতঃ, চরণাদি ধৌত করিয়া, পুত্র মিত্র ও বৈদ্য সহ পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে ভোজন করিতে বসিবেন। এখানে-ও পবিত্রতা রক্ষা বিষয়ে বিশেষরূপ দৃষ্টি

করা হইয়াছে; পবিত্রতা যে, স্বাস্থ্য ও চিত্তের প্রসন্নতা-সাধক, ইহা সকলে-ই বুঝিতে পারেন। ফলতঃ, কি রন্ধন, কি পরিবেষণ, কি ভোজন, সকল বিষয়ে-ই পবিত্রতা-রক্ষার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আজ কাল ম্লেচ্ছভাব প্রবল হওয়াতে, হিন্দুজাতির পবিত্র গৃহ হইতে পবিত্রতা বিদূরিত হইতেছে। যাহা এতকাল পরম যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, কাল-মাহাত্ম্যে বা বিজাতীয় অনুকরণ-স্রোতে তাহা ভাসিয়া যাইতেছে। আমরা উন্নতির মরীচিকায় দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া, বিপথে অগ্রসর হইতেছি। মণি-মাণিক্যের পরিবর্তে কাচ-খণ্ড সংগ্রহ করিতে উন্মত্ত হইতেছি।

দেশকাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া-ই এদেশে সূপ-শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল। কোন্ সময় হইতে যে, এদেশে সূপ-শাস্ত্র বিরচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা বড়-ই সুকঠিন। কারণ, চরক, সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ, রাজ-নির্ঘণ্ট প্রভৃতি বহুতর বৈদ্যক গ্রন্থে খাদ্য-দ্রব্য-সমূহের যেরূপ গুণাবলী নির্ণীত হইয়াছে, তাহা অতি প্রাচীন। সুশ্রুতাদির কত পূর্ব্বে যে, ঐ সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নহে। ঋগ্বেদে-ও কোন কোন খাদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘৃতাদির গুণ অবগত হইয়া, উহা যজ্ঞ ও আহারার্থে ব্যবহৃত হইত। চ্যবন ঋষি যে চ্যবনপ্রাশ ঘৃত ঔষধ ও পথ্যরূপে আবিষ্কার করিয়া, নর-কুলের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে, স্পষ্ট-ই প্রতীয়মান হয়, আর্য্যগণ সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত এবং আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি অশেষবিধ বিদ্যার উন্নতির সহিত সূপ-শাস্ত্রের-ও প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা, মহারাজ নল, মহাবাহু ভীমসেন এবং দ্রৌপদী দেবীর পাক-বিদ্যার পরিচয় এদেশে কাহার-ও অবিজ্ঞাত নাই। মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে সময় নবরত্নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংস্কৃত সূপ-শাস্ত্র সংগ্রহ-কর্ত্তা ক্ষেমশর্ম্মা লুপ্ত-প্রায় সূপ-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া, "ক্ষেম-কুতূহল" নামে প্রচার করেন। এই সংস্কৃত সূপ-শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া মুসলমান বাদসাহ-গণ পারস্য ভাষায় উহা অনুবাদ করিয়া, তাহার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মুসলমান-গণের নিকট হইতে উহা য়ুরোপে প্রচারিত হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে। অধুনা য়ুরোপীয় সূপ-শাস্ত্র আলোচনা করিলে ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারত গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ, এদেশে মাংসা-

দির বহুল প্রচলনে স্বাস্থ্যের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, এজন্য ভারতে মৎস্য-মাংসের পরিবর্ত্তে সাত্বিক আহারের সমধিক আদর বৃদ্ধি হইয়াছিল। য়ুরোপ শীতপ্রধান দেশ, এজন্য তথায় সাত্বিক আহারের স্থানে সামিষাদি খাদ্যের অধিক প্রচলন। আবার ঐ সকলের রন্ধন-প্রথা যে, ভারতীয় সূপ-শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহার-ও শত শত প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ, যে সময় পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-ভাগ ঘোরতর বর্ব্বরতার পরিচয়স্থল ছিল, খাদ্যাদির বিচার ছিল না, পশু-সমাজের ন্যায় কোনরূপে জঠরানল নির্ব্বাপিত হইত, সেই সময় আমাদের আবাসভূতা ভারত-ভূমিতে চর্ব্ব্য, চূষ্য এবং লেহ্য, পেয় নানাবিধ রসনা-তৃপ্তিকর উপাদেয় খাদ্যাদি-রন্ধনের নিয়ম উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ভারত রন্ধন-বিদ্যার জন্য কখন পরমুখাপেক্ষী হয় নাই। ভারত-মৃত্তিকা যেমন ফল-শস্যাদির প্রসূতি, সেইরূপ ভারত-জননী আবার প্রতি-গৃহে অতিথিশালা সংস্থাপন পূর্ব্বক মুক্ত হস্তে অন্ন বিতরণ করিতেন। অন্নপূর্ণার অন্নক্ষেত্র ভারতক্ষেত্র, অন্ন-দানের পরম পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া, চিরদিন পরি-কীর্ত্তিত ছিল। আর্য্য ঋষিগণ কেবল-মাত্র সূপ-শাস্ত্রের উন্নতি বিধান করিয়া-ই যে নিরস্ত ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা রন্ধন-কার্য্যকে পঞ্চ-যজ্ঞের মধ্যে পরি-গণিত করিয়াছিলেন। জীবে দয়া ও জীবের সেবার ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহারা সূপ-শাস্ত্রের মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া, অক্ষয় পুণ্য-সঞ্চয়ের যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ ব্যবস্থা আর কোন-ও দেশের সূপ-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আপেলের পোলাও।

এই পোলাও সামিষ ও নিরামিষ উভয় প্রণালীতে পাক হইয়া থাকে। প্রথমে আপেলের খোসা ছাড়াইবে। পরে তাহা চিরিয়া, ভিতরের বিচি ছাড়াইয়া ফেলিবে। এখন, তাহা ডুম ডুম করিয়া কুটিয়া ধুইয়া, সিদ্ধ করিয়া রাখিবে।

এদিকে চিনির রস জ্বালে চড়াইবে। এবং তাহা ফুটিয়া অপেক্ষাকৃত ঘন হইলে, তাহাতে আপেলগুলি ঢালিয়া দিয়া, মোরব্বা পাক করিয়া, নামাইয়া রাখিবে।

এখন, জ্বালে ঘৃত চড়াইয়া, পাকাইয়া লইবে। পরে তাহাতে লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোট এলাচের দানা, এবং তেজপাত ফোড়ন দিবে। দুই একবার ফুটিয়া উঠিলে-ই তাহাতে পোলাওয়ের চাউল ঢালিয়া দিয়া, নাড়িতে থাকিবে। দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, তাহাতে বাদাম, পেস্তা, এবং কিস্‌মিস্ দিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, জল ঢালিয়া দিবে। জল দিয়া পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে। ভাত ফুটিতে থাকিলে, ঢাকনি খুলিয়া, জাফ্‌রাণ দিবে। এই পোলাও রাঁধিবার সময় জল এরূপ হিসাব করিয়া দিবে, যেন ফেন গালিতে না হয়। ভাত একটু শক্ত থাকিতে থাকিতে উনান হইতে নামাইবে। এখন উহাতে পরিমিত লবণ দিয়া, একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। পরে ভাতের ভিতর গর্ত্ত করিয়া, সেই গর্ত্তে আপেলগুলি দিবে। আপেলের উপর ভাত চাপা দিয়া, অবশিষ্ট ঘৃত ও চিনির রস ঢালিয়া দিয়া, পুনর্ব্বার পাক-পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে। এখন পাক-পাত্রটী দমে বসাইয়া রাখিবে। খানিকক্ষণ দমে থাকিলে, ভাত বেশ সুসিদ্ধ হইয়া ঝরঝরে হইবে। পরে তাহা পরিবেষণ করিবে।

সৌখিন রুটি।

এই রুটি পাঁপরের ন্যায় সূক্ষ্ম আকারে অর্থাৎ পাতলা করিয়া বেলিয়া, প্রস্তুত করিতে হয়। এক সের আটাতে রুটি তৈয়ার করিতে হইলে, তাহাতে এক পোয়া ঘৃত, দুধ আধ পোয়া এবং লবণ দুই তোলা মিশাইয়া আটা মাখিবে। অন্যান্য রুটির ময়দা যে নিয়মে মাখিতে হয়, ইহা মাখিবার নিয়ম স্বতন্ত্র; অর্থাৎ উহা কিঞ্চিৎ তরল (পাতলা) করিয়া মাখিতে হয়। ময়দা মাখা হইলে, চারি তোলা পরিমাণ এক একটী লেচি কাটিবে। অনন্তর, তাহা পাঁপরের ন্যায় পাতলা করিয়া বেলিবে। পরে তাহা তন্দুরে সামান্য আঁচে সেকিবে। তন্দুরের অভাবে চাটুর নিম্নে আগুন রাখিবে, আর রুটির উপর ঢাকা দিয়া তাহার উপর আগুন রাখিবে। রুটির নীচে ও উপরে আগুন থাকিলে, সেই আঁচে রুটি প্রস্তুত হইবে।

বেসনী রুটি।

ছোলার বেসন দ্বারা এই রুটি প্রস্তুত করিতে হয় বলিয়া, ইহাকে বেসনী রুটি কহিয়া থাকে। অন্যান্য রুটির ন্যায় এই রুটি বেশ সুখাদ্য।

প্রথমে এক পোয়া বেসনে আট তোলা ঘৃত ও দুই তোলা লবণ মিশাইবে। মিশাইয়া দুই দণ্ড পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। পরে তাহাতে দধি এক পোয়া এবং দুই তোলা আদার রস মাখিবে। দধি মিশাইয়া খুব ফেটাইবে। উত্তমরূপ ফেটান হইলে, চারি দণ্ড রাখিয়া দিবে। পরে তাহাতে সামান্য দারচিনির গুঁড় মিশাইবে! অনন্তর, এই বেসনে ছোট ছোট রুটি প্রস্তুত করিয়া, চাটুতে সেকিয়া লইবে। লিখিত নিয়মে পাক করিলে, বেসনী রুটি প্রস্তুত হইবে।

ছোলা প্রভৃতির দাইল গুঁড় করিয়া লইলে, তাহাকে বেসন কহে। বেসন-প্রস্তুত খাদ্যাদি বিষ্টম্ভী, রুচিকর এবং বল-পুষ্টি-জনক।

শিশু-খাদ্য।

শিশুর দুই কিংবা তিনটী দন্ত নির্গত হইলে, কৃত্রিম খাদ্যের গুরুত্ব ও পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। এই সময় হইতে দুগ্ধে জল মিশ্রিত না করিয়া

পান করাইলে, কোন-প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। তজ্জন্য নিম্ন-লিখিত কয়েক-প্রকার খাদ্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সাগুদানা।—ছোট এক চামচ সাগুদানা, আধ সের জলে দুই ঘণ্টা ভিজাইয়া, পনর মিনিট পর্য্যন্ত আগুনের তাপে সিদ্ধ করিবে; এবং ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে। অনন্তর, তাহা তাপ হইতে নামাইয়া, পরিষ্কৃত বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। এখন তাহাতে সামান্য গো-দুগ্ধ, ঈষৎ লবণ এবং চিনি মিশাইয়া লইলে-ই, শিশুর খাদ্যের উপযোগী হইল।

এরারুট।—ছোট এক চামচ এরারুট অল্প শীতল জলে মিশাইবে। পরে তাহাতে খুব গরম জল মিশাইয়া, পাঁচ মিনিট আগুনে সিদ্ধ করিয়া লইবে। অনন্তর, তাহাতে দুধ, লবণ এবং চিনি মিশাইলে, শিশুর খাদ্যের উপযুক্ত হইবে।

সুজি।—ছোট এক চামচ সুজি আধ সের জলে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা সিদ্ধ করিবে। যতক্ষণ উহা জালে থাকিবে, ততক্ষণ বার বার নাড়িতে থাকিবে। পরে জাল হইতে নামাইয়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। এবং তাহাতে দুধ ও চিনি মিশাইয়া লইবে।

মাংসের যূষ।—যে ছাগের বয়স কম, এরূপ ছাগের মাংস আধ সের লইয়া, থুরিয়া থুরিয়া কাদার মত করিবে। এখন তাহা আধ সের পরিমিত শীতল জলে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে। অনন্তর তাহা মৃদু জালে সিদ্ধ করিবে। সুসিদ্ধ হইলে, তাহাতে লবণ দিবে। পরে সামান্য ঘৃতে একখানি তেজপাত ফোড়ন দিয়া সম্বরা দিয়া লইলে-ই, শিশু-খাদ্য যূষ প্রস্তুত হইল। শিশু ভিন্ন, রোগীর পক্ষেও এই যূষ অত্যন্ত বল-কারক এবং লঘু-পাক। শিশু ও রোগীর খাদ্যে ঘৃত মসলাদি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে, তাহা গুরু-পাক হইয়া উঠে, তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। আর যে সকল জন্তুর মাংস পাকা কিম্বা চর্ব্বি-বিশিষ্ট, তাহা শিশু অথবা রোগীর খাদ্যে এক-কালে পরিত্যাগ করিবে।

ছাগ-শিশুর মাংস শীতল, লঘু, বল-কারক, ও প্রমেহ-নাশক। বড় পাটার মাংস গুরু-পাক, রুক্ষ ও বায়ু-বর্দ্ধক। খাসির মাংস গুরু-পাক, কফ-বর্দ্ধক, বল-কারক, মাংস-বর্দ্ধক, বাত-পিত্ত-নাশক।

যবের যূষ।

এক ছটাক যব ঠাণ্ডা জলে উত্তমরূপ ধুইবে। পরে তাহা এক সের জলে সিদ্ধ করিবে। ভাল-রূপ আঁচ পাইলে, কুড়ি মিনিটের মধ্যে সিদ্ধ হইবে। যব সুসিদ্ধ হইলে, তাহা ছাঁকিয়া লইবে। এই জলকে যবের যূষ কহে। ইহা উদরাময় রোগে বড়-ই সুপথ্য; এমন কি, ঔষধের ন্যায় উপকার করিয়া থাকে। ইহা লঘু-পাক ও মল-রোধক এবং ত্রিদোষের হিত-কারক।

হজপচ।

যদিও সামান্য ব্যয়ে এবং সামান্য তরকারি দ্বারা হজপচ পাক হইয়া থাকে, কিন্তু উহা অত্যন্ত রসনা-প্রিয়-হজপচ-রন্ধনে কোন নির্দ্দিষ্ট তরকারি ব্যবহৃত হয় না। যে ঋতুতে যে সকল তরকারি পাওয়া যায়, সেই সকল দ্বারা এই ব্যঞ্জন পাক হইতে পারে; অর্থাৎ আলু, বেগুন, সিম, বিলাতি কুমড়া, কলাই শুঁটি, কাঁচকলা, মূলা এবং পুঁই, লাউ, কুমড়া, পালং প্রভৃতি শাক হজপচে ব্যবহার হইয়া থাকে। শাকের মধ্যে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট শাক ব্যবহার করিতে পারা যায়।

সামিষ হজপচ-ই যার-পর-নাই সুখাদ্য। এজন্য পাকা মাছের তেল-কাঁটা ও মুড় প্রচুর পরিমাণে হজবজে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। অন্যান্য ব্যঞ্জন অপেক্ষা এই ব্যঞ্জনে জল একটু অধিক লাগিয়া থাকে। প্রথমে একটু অধিক তৈল, লঙ্কা, তেজপাত ও পাঁচফোড়ন সম্বরা দিয়া, তরকারিগুলি কসিতে হয়। কসিতে কসিতে উহা অনেকটা নরম হইয়া আইসে। তখন তাহাতে হরিদ্রা, জিরামরীচ, লঙ্কা বাটা দিয়া নাড়িতে হয়। মসলাগুলি ভাজা ভাজা হইয়া, তরকারিতে লপেট গোছের হইলে, তখন তাহাতে পরিমিত লবণ ও জল দিতে হয়। দুই একবার ফুটিয়া আসিলে, তাহাতে মাছের তেল-কাঁটা ঢালিয়া দিতে হয়। তেল-কাঁটা যে অগ্রে ভাজিয়া রাখিতে হয়, তাহা বোধ হয়, প্রত্যেক পাচক ও পাচিকা অবগত আছেন। এইরূপ অবস্থায় জ্বালে থাকিলে, তরকারি উত্তমরূপ সিদ্ধ হইয়া, সমুদয়গুলি মিলিয়া, বেশ থক-থকে আকারে হইয়া আসিবে, অর্থাৎ উহাতে ঝোল থাকিবে না। জলের পরিমাণ অধিক হইলে, উহাতে

সামান্ত ময়দা ছড়াইয়া দিলে-ই, উহা আঁটিয়া আসিবে। কিন্তু ময়দা, চাউলের গুঁড়ি অথবা পিঠালি ব্যঞ্জনে ব্যবহার করিলে, তাহার সুতার হয় না। এজন্য ঐ সকল ব্যবহার না করা-ই ভাল। অনন্তর, পাক-পাত্র জ্বাল হইতে নামাইয়া লইলে-ই, হজপচ পাক শেষ হইল।

ডিম টাট্‌কা রাখিবার উপায়।

ভাল করিয়া রাখিতে পারিলে, ডিম অনেক দিন পর্য্যন্ত টাট্‌কা থাকে। ডিম অধিক দিন রাখিয়া ব্যবহার করিবার জন্য নানারূপ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। নিম্ন-লিখিত নিয়মে রাখিলে, অধিক দিন পর্য্যন্ত উহা ভাল অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ পচিয়া বিকৃত হয় না এবং আহার করিলে-ও কোন-প্রকার অসুখ হয় না।

প্রথমে দেড় সের পাথুরে চূণ লইবে, পরে তাহাতে ছয় সের পরিমিত ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিবে। এখন তাহা এরূপ নিয়মে আস্তে আস্তে নাড়িবে, যেন জলের সহিত চূণ উত্তমরূপ মিশিতে পারে। চূণে জলে উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে, তাহা আর না নাড়িয়া, কোন স্থানে আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে। অনন্তর, চূণের জলটুকু আস্তে আস্তে অন্য পাত্রে ঢালিয়া রাখিবে।

এ-দিকে একটী মাটির পাত্রে, যে-পরিমাণ ডিম রাখিতে পারা যায়, ততগুলি ডিম সাজাইয়া রাখিবে। এখন এই ডিমের উপর চূণের জল ঢালিয়া দিবে। যে পরিমাণ চূণের জল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে একশত ডিম রাখা যাইতে পারে। এরূপ নিয়মে জল ঢালিবে, যেন ডিমগুলি ডুবিয়া, তাহার উপর দুই ইঞ্চি জল থাকে। জল ঢালিয়া দিয়া, পাত্রের মুখ উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিবে। আর পাত্রটী এরূপ স্থানে রাখিবে, যেন ডিম খরচ করিবার পূর্ব্বে, উহা কোন প্রকারে নাড়া-চাড়া করিতে না হয়।

রোগীর জন্য ডিম-মিক্‌শ্চার।

ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে এই মিক্‌শ্চার প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুর্ব্বল ব্যক্তির

বল-বিধানের জন্য ডাক্তারেরা এগ্ বা ডিমের মিক্‌চার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যাহাদের অন্ন আহার সহ্য হয় না, তাহাদের পক্ষে এই মিক্‌চার যার-পর-নাই উপকারী। এই মিক্‌চার অত্যন্ত বলকারক ও ধারক। যাহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, অদৃঢ়-স্নায়ু এবং পেট-রোগা, তাহাদের পক্ষে ইহা ঔষধের ন্যায় কার্য্য-কারী।

একটী টাম্‌বালা গ্লাসে একটী টাট্‌কা ডিম ভাঙ্গিয়া রাখ; এবং তাহাতে এক চামচ পরিমাণ চিনি মিশাও। পরে উহাতে এক আউন্স পরিমাণ ব্রাণ্ডি কিংবা শেরি মদ এবং সম পরিমাণ দুগ্ধ অথবা জল মিশ্রিত কর। এখন এক খণ্ড নোট পেপার অর্থাৎ পার্চমেণ্ট কাগজ দ্বারা গ্লাসের মুখ এরূপ করিয়া জড়াইয়া ধর, যেন ভিতরের তরলাংশ বাহির হইয়া না পড়ে। পরে টুয়ালে কিংবা পরিষ্কৃত নেকড়া দ্বারা গ্লাসের মুখ উত্তমরূপে আঁটিয়া ধর; এখন জোর করিয়া দুই তিন মিনিট গ্লাসটী খুব ঝাঁকাইয়া লও। অনন্তর গ্লাসের মুখের আচ্ছাদন খুলিয়া ফেল; পরে তাহাতে সামান্য পরিমাণ জায়ফলের গুঁড় মিশাইয়া লইলে-ই, ডিমের মিক্‌চার প্রস্তুত হইল।

রোগীর উপযুক্ত যূষ।

নানা প্রকার নিয়মে যূষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। রন্ধনের প্রক্রিয়া অনুসারে যূষ গুরু কিংবা লঘু-পাক হইয়া থাকে। নিম্নে জেলি প্রস্তুতের

আহার করিবার সময় পরিমাণ মত লবণ মিশাইয়া লইবে। দুর্ব্বলের পক্ষে এই যূষ অত্যন্ত বল-কারক। মৃদু আঁচে যে, এই মাংস সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা যেন মনে থাকে।

এরারুটের জেলি !

এই জেলি রোগীর পথ্য, মুখ-রোচক এবং বল-কারক। দেড় পোয়া জলে এক গ্লাস সেরি মদ, অল্প পরিমাণ জায়ফলের গুঁড়, এবং পরিস্কৃত চিনি মিশাইয়া, জ্বালে চড়াইবে। যখন ফুটিয়া উঠিবে, তখন তাহাতে বড় এক চা-চামচ এরারুট অল্প পরিমাণ শীতল জলে গুলিয়া উহাতে ঢালিয়া দিবে। ঢালিয়া দিয়া তিন মিনিট সিদ্ধ করিবে। অনন্তর তাহা জ্বাল হইতে নামাইয়া, কাচ-পাত্রে ঢালিয়া রাখিবে। সুস্বাদু করিবার জন্য যে কোন ভাল ফলের রস উহাতে মিশাইয়া লইবে। পাতি, কাগজি কিংবা কমলা লেবুর রস অথবা বেদানা কিংবা আঙ্গুরের রস মিশাইলে অত্যন্ত মুখ-রোচক হইয়া থাকে।

মিটে অমলেট।

চারিটী টাট্‌কা ডিম ভাঙ্গিয়া, হরিদ্রাংশ ও শ্বেতাংশ পৃথক্‌ পৃথক্‌ পাত্রে রাখিয়া, উত্তমরূপে ফেটাইয়া লইবে। পরে হরিদ্রাংশের সহিত এরূপ পরিমিত চিনি মিশাইবে, যেন উহা বেশ মিষ্ট হয়। এখন খাঁটি দুগ্ধে অল্প পরিমাণে ময়দা গুলিয়া উহাতে মিশাইয়া দাও।

এদিকে ডিমের শ্বেতাংশ উত্তমরূপ ফেনাইয়া পূর্ব্বোক্ত হরিদ্রাংশে মিশাইবে।

একবার ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে। এখন ঐ চাকাগুলি হলুদ-জলে সিদ্ধ করিবে। বেশ সুসিদ্ধ হইলে উনান হইতে নামাইয়া জল ঝরাইবে।

এখন চাকাগুলিতে হরিদ্রা, লঙ্কা-বাটা এবং পরিমাণ মত লবণ মাখাইয়া সামান্যরূপ ভাজিয়া নামাইবে।

এ-দিকে সফেদা ও বেসন জলে গুলিয়া গোলা প্রস্তুত করিবে। পরে তাহাতে লবণ এবং কাঁচা লঙ্কার কুচি মিশাইবে। এখন জালে ঘৃত পাকাইয়া লইবে। অনন্তর গোলাতে এক একখানি ভুতির চাকা ডুবাইয়া, ঘৃতে ভাজিয়া তুলিয়া লইবে। গরম গরম এই ভাজা বেশ সুখাদ্য।

বৈদ্য-শাস্ত্রমতে পাকা কাঁটাল মধুর-রস, শীতল, পিচ্ছিল, দুর্জ্জর, রুচি-কর, মল-রোধক, বল-বীর্য্য-বর্দ্ধক, শুক্র-জনক, কফ-কারক, পুষ্টি-কর, বাত-পিত্ত-নাশক, এবং দাহ, শ্রম ও শোথ রোগের উপকারক।

ইঁচড়।—মধুর-কষায়-রস, কঠিন, রুচিকর, গুরু-পাক, শীতল, বল-কর, ও দাহ-জনক, এবং কফ, বায়ু ও মেদো-ধাতুর বৃদ্ধিকারক।

পাকা কাঁটালের বীজ।—ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর রস, গুরু-পাক, বায়ু-বর্দ্ধক, চর্ম্ম-দোষ-নাশক, মল-রোধক, মূত্র-বিরেচক ও শুক্র-বর্দ্ধক, এবং পাকা কাঁটাল ভোজন-জনিত অজীর্ণাদির নিবারক। কাঁটালের মজ্জা বা ভুতি শুক্র-বর্দ্ধক, ত্রিদোষ-নাশক ও গুল্মের অপকারক।

গোলমরীচের গুঁড়, গরম মসলার গুঁড় এবং পিয়াজ ও আদা বাটা (রুচি অনুসারে পিয়াজ ত্যাগ করিতে পার) মিশাইবে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এই সঙ্গে খোয়াক্ষীর বাদাম ও পেস্তা বাটা মিশাইয়া লইলে, উহা অপেক্ষাকৃত সুখাদ্য হইয়া থাকে।

এখন ঐ মিশ্র পদার্থে এক একটী গিলা ফলের আকারে গঠন করিবে। অনন্তর তাহা ঘৃতে বাদামী ধরণে ভাজিয়া লইলে-ই, ডুমুরের গিলা প্রস্তুত হইল। গরম গরম উহা বেশ সুখাদ্য। ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিলে, উহা মাংসের কোপ্তার ন্যায় সুখাদ্য হইয়া থাকে।

দাইলের বড়া।

নিরামিষ আহারে এই বড়া বেশ সুখাদ্য। দাইলের বড়া দ্বারা উত্তম অম্ল প্রস্তুত হইয়া থাকে। মটর ও বুটের দাইলের বড়া-ই বেশ সুখাদ্য। প্রথমে দাইল জলে ভিজাইয়া রাখিবে। নরম হইলে, তাহা জল হইতে তুলিয়া বাটিবে। বাটিবার সময় তাহার সহিত ঝুনো নারিকেল ও লঙ্কা বাটিবে। বাটা হইলে বেশ করিয়া ফেটাইবে। পরে তাহাতে নেবুর রস ও লবণ মাখিয়া লইবে।

পরে কড়া কিংবা তৈয়ে ঘৃত বা তৈল জ্বালে চড়াইবে। এবং উহা পাকিয়া আসিলে, তাহাতে চারি পাঁচটী করিয়া বড়া ছাড়িবে। এক পিঠ ভাজা হইলে, উল্টাইয়া দিবে। দুই পিঠ বেশ খড়-খড়ে গোছের ভাজা হইলে, তাহা তুলিয়া লইবে। ইচ্ছা করিলে, এই বড়া দ্বারা নিরামিষ অম্বল রাঁধিতে পারিবে।

করিতে পারা যায়। কিন্তু গোঁড়া লেবু দ্বারা প্রস্তুত করিলে, সমধিক উপকার হইয়া থাকে। কারণ অন্যান্য লেবু অপেক্ষা এই লেবুর রস অধিক এবং তীব্র অম্লরস-বিশিষ্ট; এজন্য ইহার জারকতা-শক্তি-ও অধিক।

প্রথমে ভাল ভাল তেজাল ও পরিণত লেবু বাছিয়া লইবে। পরে তাহা অধিক জলে বেশ করিয়া ধৌত করিবে। এখন এক একটি লেবুর মুখ কাটিয়া, রস বাহির করিবে। রস বাহির করিবার জন্য এক প্রকার কল আছে, সেই কলে পেষণ করিলে, সহজে-ই অল্প সময়ের মধ্যে সমুদয় রস বাহির হইয়া আইসে। কলের অভাবে, লেবুর মুখ কাটিয়া, একটা কাটি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া, টিপিয়া ঘুরাইলে, রস বাহির হইবে। সমুদয় লেবুর রস বাহির হইলে, তাহা পরিষ্কৃত কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর তাহা মাটির পাত্রে করিয়া, জ্বাল দিতে থাকিবে। জ্বালে রস ঘন অর্থাৎ গুড়ের ন্যায় হইয়া আসিলে, তাহা উনান হইতে নামাইবে। লেবুর এই অগ্নি-পক্ক রসকে চুক কহে। এই রস বা চুককে পরিষ্কৃত বোতলে পূরিয়া, ছিপি দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিলে, উহা বহুদিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। কোন প্রকার ধাতু-পাত্রে চুক রাখিলে, উহা বিকৃত হইয়া যাইতে পারে। এজন্য লৌহের কড়াতে পাক করা উচিত নহে।

মাংসের কোর্ম্মা প্রভৃতি রন্ধনে চুক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহা দ্বারা নানাবিধ চাটনি প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

কাঞ্জিক।

থাকিলে, উহা অম্ল-রসে পরিণত হইবে। তখন তাহা পরিষ্কৃত বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলে-ই কাঁজি প্রস্তুত হইল। কোন কোন অবস্থায় কাঁজি ঔষধ বা পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাঁজির ন্যায় ধানের মণ্ড-ও অত্যন্ত উপকারী। ধান সিদ্ধ করিয়া, কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে-ই মণ্ড প্রস্তুত হইল। এই মণ্ড অগ্নি-বর্দ্ধক, মল-রোধক, রক্ত-নিবারক, শ্রান্তি-নাশক, বাত-বর্দ্ধক, পিত্ত-নাশক, এবং অশ্মরী রোগ-নিবারক।

কাঁচা আমের ভাজা চচ্চড়ি।

চচ্চড়ির আনাজ যেরূপ আকারে কুটিতে হয়, সেই আকারে আলু, পটোল, এবং থোড় কুটিয়া, জলে ধুইয়া রাখিবে।

এখন তেল উনানে চড়াইয়া, তাহাতে বড়ি ভাজিয়া নামাইয়া রাখিবে। পরে জল চড়াইয়া, তাহাতে তরকারিগুলি সিদ্ধ করিবে। এই সময় একটু হিসাব করিয়া জল দিবে; অর্থাৎ এরূপ নিয়মে জলে সিদ্ধ করিবে, যেন জল শুকাইয়া যায়, অথচ তরকারিগুলি উত্তমরূপ সিদ্ধ হয়। তরকারি সুসিদ্ধ হইলে তাহা নামাইয়া রাখিবে।

অনন্তর হাঁড়িতে তেল জ্বালে চড়াইয়া, পাকাইয়া লইবে। পরে তাহাতে তেজ-পাত, লঙ্কা এবং পাঁচফোড়ন সম্বরা দিয়া, তরকারি ঢালিয়া দিবে। দুই একবার নাড়িয়া চাড়িয়া, সামান্য জলে হরিদ্রা গুলিয়া ঢালিয়া দিবে। এই সঙ্গে লবণ-ও দিবে। জল মরিয়া আসিলে, তাহাতে আম ও আদা ছেঁচিয়া দিবে, এবং একবার নাড়িয়া চাড়িয়া চচ্চড়ি নামাইয়া রাখিবে। এই চচ্চড়ি বেশ

বল-কারক, ধাতু-পোষক, বাত পিত্ত ও ক্ষয়-নাশক, আর কফ, রক্ত এবং মাংসের বৃদ্ধি-কারক।

এই খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমে ময়দায় অধিক পরিমাণে ঘৃতের ময়ান দিবে। পরে তাহা দুধে গুলিবে। এখন ঘৃত জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহা পাকিয়া আসিলে, মালপোয়া ঢালিয়া দেওয়ার নিয়মে ঐ ময়দার গোলা ঢালিয়া দিবে। সুপক্ক হইলে, ঘৃত হইতে তুলিয়া, চিনির রসে ডুবাইয়া রাখিবে। ঘৃত-পূরককে কেহ কেহ ঘিয়োড় কহিয়া থাকেন। কিন্তু ঘিয়োড়ের যে আকার এবং যেরূপ নিয়মে ভাজিতে হয়, তাহা স্বতন্ত্র। তবে বোধ হয়, পূর্ব্বকালের ঘৃত-পূরক পরিবর্ত্তিত হইয়া, বর্ত্তমান ঘিয়োড় হইয়াছে।

দেলখোস পরেটা।

প্রথমে অধিক ময়ান দিয়া, পরেটা মাখার নিয়মে ময়দা মাখিবে। ময়দা মাখা হইলে, তাহার লেচি কাটিয়া রুটির আকারে বেলিবে। এখন এই রুটির উপর পিঠে সাটা মাখিবে। খাসা ময়দা ঘৃতে গুলিবে, অর্থাৎ গাঢ় ক্ষীরের ন্যায় করিবে। এই ময়দাকে সাটা কহিয়া থাকে। সাটার সহিত বাদাম, পেস্তা বাটা ও ছোট এলাচ, জৈয়িত্রীর গুঁড় মিশাইয়া লইলে, উহা আর-ও উপাদেয় হইয়া থাকে। বেল্মা রুটির উপর সাটা মাখা হইলে, তাহা লম্বা আকারে জড়াইবে। এইরূপে রুটিখানি জড়ান হইলে, তাহা আবার গোল করিরা জড়াইবে। এখন উহা পরেটা কিংবা লুচির আকারে বেলিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। এই পরেটার

ভিজিয়াছে, তখন তাহা ভাসা জলে ধুইয়া, পাত্রান্তরে রাখিবে। এখন ঐ ডা'ল শিলে বাটিবে। কিন্তু চন্দনের মত খিচ-শূন্য করিয়া বাটিবে না, যেন খিচ থাকে। এই ডা'ল-বাটা এক একটী ছোট অথচ কিছু লম্বা আকারে তাল করিয়া, গরম জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে-ই, উহা শক্ত হইয়া উঠিবে। শক্ত হইলে, জ্বাল হইতে নামাইবে। অনন্তর তাহা ঠাণ্ডা হইলে, ছুরি দ্বারা গজার আকারে কাটিয়া রাখিবে।

এখন একখানি কড়াতে ঘৃত জ্বালে চড়াইবে। এবং উহা পাকিয়া আসিলে; তাহাতে ডা'লের খণ্ডগুলি ছাড়িতে থাকিবে। ভাজিবার সময় মধ্যে মধ্যে ঘৃতের কড়াখানি উনান হইতে মাটিতে নামাইয়া রাখিবে। এরূপ নামাইবার কারণ এই যে, উহা গরম ঘৃতের দমে বেশ সুসিদ্ধ হইবে। পুনর্ব্বার তাহা জ্বালে বসাইবে। যখন বুঝিবে, উত্তমরূপ ভাজা হইয়াছে, তখন তাহা ঘৃত হইতে তুলিয়া লইবে। এইরূপে সমুদয় খণ্ডগুলি ভাজা হইলে, পরে গজায় যেরূপ নিয়মে চিনির রস মাখাইয়া থাকে, সেই নিয়মে রস মাখাইয়া লইলে-ই, বুটের ডা'লের গজা পাক হইল।

কুমড়া বিচির পানপিঠা।

সুপক্ক মিঠে কুমড়ার বিচি লইয়া জলে ধুইয়া পরিষ্কৃত করিবে। পরে তাহা জলে ভিজাইয়া, খোসা তুলিয়া ফেলিবে। খোসা তুলিয়া বিচিগুলি বাটিবে। যে পরিমাণ বিচি, তাহার দুই ভাগ নারিকেল-কোরা বাটা, ক্ষীর দুই ভাগ, চিনি আড়াই ভাগ, এরারুট পোয়া ভাগ, সুজি ছটাক ভাগ এক সঙ্গে মিশাইয়া, জ্বালে চড়াইয়া নাড়িতে থাকিবে। জ্বালে রস মরিয়া শক্ত হইয়া আসিলে

এক ছটাক চিনি দিবে। আর দুধে জল থাকিলে আধ পোয়া হইতে তিন ছটাক চিনি দিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে, এই সময় বাদাম, পেস্তা ও কিস্‌মিস্ দুধে দিতে পার। অনন্তর তাহা জ্বাল হইতে নামাইবে। ঠাণ্ডা হইলে, তাহাতে দুই এক বিন্দু গোলাপী আতর মিশাইবে। লিখিত নিয়মে পাক করিলে তাহা রসনার অতি উপাদেয় হইবে।

যবশক্তু।

যব-শক্তুকে যবের ছাতু কহে। বৈদ্যক-মতে উহা মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, লঘু-পাক, সারক, অগ্নি-বর্দ্ধক, রুচি-কর, সন্তর্পণ, বল-কারক, পুষ্টি-জনক, শুক্র-বর্দ্ধক, শ্রান্তি-নিবারক, কফ-পিত্ত-নাশক, বায়ুর অনুলোম-কারক, আর দাহ-ঘর্ম্ম প্রভৃতির শান্তি-কারক।

যব ভাজিয়া চূর্ণ অর্থাৎ গুঁড় করিয়া লইলে-ই যবের ছাতু প্রস্তুত হয়। ছাতু জল অথবা দই কিংবা ঘোলের সহিত পাতলা করিয়া গুলিয়া, তাহাতে চিনি বা গুড় মাখিয়া খাইতে হয়। হিন্দুস্থানীরা অল্প জল মাখিয়া তেলা তেলা করিয়া আহার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে অজীর্ণাদি পেটের পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

কোন কোন রন্ধনে ছাতু ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ছাতুর ন্যায় যবের মণ্ড খাদ্যে ব্যবহার হয়। যব সিদ্ধ করিয়া, তাহা ছাঁকিয়া লইলে-ই মণ্ড পাক হইল। এই মণ্ড লঘু-পাক, মল-রোধক, আর শূলাদি রোগের

পরিমাণ ভাজা হইয়া আসিলে, তাহাতে লবণ মিশ্রিত লেবুর রস মাখাইয়া, নামাইয়া লইবে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে পটোল পাচক, হৃদ্য, পুষ্টি-কর, অগ্নির উদ্দীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, ত্রিদোষঘ্ন এবং কাস, রক্তজ-রোগ, জ্বর ও কৃমির শান্তিকারক।

কিস্‌মিসের বাটা-চাট্‌নি।

প্রথমে কিস্‌মিস্‌গুলির বোঁটা ছাড়াইয়া, জলে ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে। পরে তাহা বাটিবে। কেহ কেহ আবার কিসমিসের সহিত ছোয়ারা-ও বাটিয়া লইয়া থাকেন। এখন কিস্‌মিসের পরিমাণ বুঝিয়া, আদার খোসা ছাড়াইয়া বাটিয়া লইবে। অনন্তর আদা ও কিস্‌মিস্‌-বাটা একসঙ্গে মিশাইবে। পরে তাহাতে লেবুর রস, চিনি দিয়া, একবার চট্‌কাইয়া লইলে-ই, এই চাট্‌নি প্রস্তুত হইল।

কিস্‌মিসের বাটা-চাট্‌নি উত্তম মুখ-রোচক। কিস্‌মিসের অন্য-প্রকার চাট্‌নি রাঁধিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। লুচি কিংবা পোলাও আহার করিবার সময়, কিস্‌মিসের বাটা-চাট্‌নি মধ্যে মধ্যে খাইলে, জিহ্বার জড়তা যায়; আহারে আবার নূতন প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

তক্র।

তক্রকে ঘোল কহে। সাধারণতঃ ঘোল পাঁচ-প্রকার; অর্থাৎ যে ঘোলে জল মিশান হয় না, আর সর থাকে, তাহাকে [illegible]

জড়তা-জনক। যে ঘোলে অল্প সর থাকে, তাহা-ও গুরু-পাক, শুক্র-বর্দ্ধক, বল-কারক আর কফ-জনক। যে ঘোলের সমুদয় সর তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা লঘু-পাক ও সুপথ্য। ঘোল-মাত্রে-ই ত্রিদোষ-নাশক, রুচি-কর, অগ্নি-বর্দ্ধক ও বর্ণের উৎকর্ষ-কারক এবং শ্রান্তি, ক্লান্তি, বমি, আমাতিসার, গ্রহণী, অগ্নি-মান্দ্য, বিসূচিকা, বাত-জ্বর, পাণ্ডু রোগে উপকারক।

মোচার অম্বল।

যে নিয়মে মোচার খোলা ছাড়াইয়া কুটিতে হয়, সেই নিয়মে উহা কুটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে। এখন ভাল জল-সহ একটী হাঁড়ি জ্বালে চড়াইবে এবং তাহাতে ধৌত মোচা ঢালিয়া দিবে। সিদ্ধ হইলে, পাক-পাত্র জ্বাল হইতে নামাইয়া, হাঁড়ির জল গালিয়া ফেলিবে।

এ-দিকে একটী পাক-পাত্র জ্বালে চড়াইবে, এবং তাহাতে তৈল ঢালিয়া পাকাইয়া লইবে। পরে তাহার উপর মোচাগুলি ঢালিয়া, নাড়িতে চাড়িতে থাকিবে। অল্প ভাঁজা ভাজা হইলে, তাহাতে তেঁতুল-গোলা, হরিদ্রা-বাটা এবং লবণ দিবে। পাকা তেঁতুলের গোলা দিলে, দেখিতে ময়লা হইবে। এজন্য কাঁচা-তেঁতুল জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহার মাড়ি বাহির করিবে। ছিবড়ে ফেলিয়া দিয়া মাড়িতে পরিমিত জল মিশাইয়া লইলে-ই হইবে। জল মরিয়া সুসিদ্ধ হইলে, পাত্রটী

তালের মেওয়া।

পাকা তালের মাড়ি দ্বারা এই মেওয়া পাক করিতে হয়। তালের মেওয়া অত্যন্ত গুরু-পাক ; এজন্য রোগীর পক্ষে উহা ব্যবহার নিষিদ্ধ।

কোন কোন তালের মাড়ি আতিক্ত, এজন্য মেওয়া প্রস্তুত করিবার পক্ষে সুমিষ্ট তাল বাছিয়া লইতে হয়। প্রথমে মিষ্ট-জাতীয় সুপক্ক তালের মাড়ি ছাঁকিয়া লইবে। পরে মোটা কাপড় অথবা পাতলা কাপড় তিন চারি ভাঁজ করিয়া, তাহাতে মাড়ি দিয়া অধিক জল মিশাইয়া নাড়িতে থাকিবে। যখন দেখিবে নাড়িতে নাড়িতে জল বাহির হইয়া মাড়ি অবশিষ্ট আছে, তখন ছানা নিংড়াইবার ন্যায় নিংড়াইয়া লইবে।

এখন এই তাল দুই ভাগ, ক্ষীর তিন ভাগ, চিনি চারি ভাগ এবং নারিকেল-কোরা-বাটা দুই ভাগ এক সঙ্গে মিশাইবে। অনন্তর, এই মিশ্রিত পদার্থ জ্বালে চড়াইয়া অনবরত নাড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে শুষ্ক হইয়া আসিলে, তাহা নামাইয়া লইবে। এই পক্ক দ্রব্যকে তালের মেওয়া কহে।

পাকা-তাল মধুর-তিক্ত, কষায়-রস, দুর্জ্জর, বল-কারক, শুক্র-বর্দ্ধক এবং মূত্র-কারক।

ক্ষীর-কমলা।

ক্ষীর-কমলা পাক করিতে হইলে, খাঁটি দুধ সংগ্রহ করিবে। জলীয় দুধে উহার আস্বাদ ভাল হয় না। আর যে লেবু অম্লরস-বিশিষ্ট, তদ্দ্বারা পাক করিলে দুধ ছিঁড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। এজন্য খাঁটি দুধ ... র লইয়া

কোয়াগুলি পাতলা নেকড়ায় চিপিয়া রস বাহির করিবে। পরে সেই রস দুধে দিবে। কেহ কেহ আবার রসের সহিত লেবুর কতক কুয়া ছাড়িয়া-ও দিয়া থাকেন। দুধ মরিয়া ক্ষীর হইলে, তাহা জ্বাল হইতে নামাইবে। ক্ষীর শীতল হইলে, উহাতে দুই এক ফোটা (পরিমাণ বুঝিয়া) গোলাপী আতর দিলে, ক্ষীর-কমলা অপেক্ষাকৃত উপাদেয় হইয়া থাকে। মিষ্ট খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে ক্ষীর-কমলা যার-পর-নাই রসনা-তৃপ্তিকর।

ক্ষীরেলা।

উপকরণ ও পরিমাণ।—খোয়াক্ষীর একসের, চিনি তিন পোয়া, ঘৃত এক ছটাক, ছোট এলাচ দুই আনা, গোলাপী আতর পরিমিত, বাদাম ও পেস্তা-বাটা প্রত্যেকে আধপোয়া করিয়া।

প্রথমে খোয়া-ক্ষীর খিচ-শূন্য করিয়া বাটিবে। এখন এই বাটা-ক্ষীর ঘৃতে ভাজিতে থাকিবে। ভাজিবার সময় অনবরত নাড়িতে থাকিবে, আধ-ভাজা হইলে, বাদাম ও পেস্তা-বাটা এবং শুক্‌নো চিনি দিয়া নাড়িতে থাকিবে। সম্পূর্ণ ভাজা হইলে, জ্বাল হইতে নামাইয়া, বরফি ঢালার ন্যায়, কোন পাত্রে ঢালিবে এবং শীতল হইলে, তাহাতে আতর মিশাইবে। যখন দেখিবে, শক্ত হইয়া আসিয়াছে, তখন তাহা বরফি কাটার ন্যায় ইচ্ছামত আকারে কাটিয়া লইলে-ই, ক্ষীরেলা পাক শেষ হইল। ক্ষীরেলা যে, কি প্রকার সুখাদ্য মিষ্ট-দ্রব্য, তাহা একব রসনায় দিয়া পরীক্ষা করিলে-ই বুঝিতে পারিবে।

নিংড়াইবে, অর্থাৎ ছানা কাপড়ে বাঁধিয়া, তাহার উপর একটা ভারি দ্রব্য কিছু-ক্ষণ চাপিয়া রাখিবে, সমুদয় জল বাহির হইয়া পড়িবে। এখন এই ছানা উত্তমরূপ চট্‌কাইবে, অর্থাৎ আদৌ যেন খিচ না থাকে। পরে তাহাতে পরিমাণ মত চিনি ও ফেটান ডিম মিশাইবে।

এখন একটী কাণা-উঁচু থালায় একটু ঘৃত মাখাইয়া, তাহা গরম করিয়া লইবে। এই থালার উপর ছানা ঢালিয়া দিবে। থালায় ছানা সমান করিয়া ঢালিয়া দিয়া, তাহার উপর আস্ত কিস্‌মিস্ আর পেস্তা ও বাদামের সরু সরু কুচি ছড়াইয়া দিবে। পরে রসগোল্লা, হয় এক একটা অথবা আধখানা করিয়া কাটিয়া, ছানায় বসাইয়া দিবে। তাহাতে রসগোল্লার কতক অংশ, ছানার ভিতর প্রবিষ্ট হইবে। অনন্তর, আর একখানি কাণা-উঁচু থালা দ্বারা ছানার থালা ঢাকিয়া দিবে। এখন এই থালা কাট-কয়লার আগুনের দমে বসাইয়া দিবে। আর যে থালা ঢাকা দিয়াছ, তাহার উপরে-ও কিছু আগুন ছড়াইয়া দিবে। এইরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিলে, পুডিং জমিয়া আসিবে। পুডিং জমিলে, আর আগুনের উপর রাখিবার দরকার হইবে না। পরে তাহা বরফি কাটার ন্যায়, ছুরির দাগ দিয়া, কাটিয়া লইবে।

পুডিং উত্তম সুখাদ্য এবং পুষ্টি-কর, অথচ রসগোল্লা, পান্তোয়া প্রভৃতির ন্যায় চড়া মিষ্ট-আস্বাদের নহে।

দুগ্ধের গুণাগুণ।

দু গো, মহিষ, ছাগ, মেষ এবং গর্দ্দভ প্রভৃতি প্রাণী সকলের দুগ্ধ মনুষ্যদিগের পানীয়। প্রাণি-ভেদানুসারে বিভিন্ন দুগ্ধের বিভিন্ন ... গুণাগুণ